প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ—১৯৬০

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
২৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীনিরঞ্জনকুমার ঘোষ
রঘুনাথ প্রিণ্টার্স
১৫৩/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

নেকড়ের থাবা

লোভী এক মানুষের ধূর্ত চোখে চকচক করে পাপের টাকা, হাতে ধরা রিভলবারের ট্রিগারে মুখ রাখে স্বৈরিণী নারী।

প্রেম যেন দুঃস্বপ্ন ; সততা, দুরাশা, বিবেক নিহত লালসার বুলেটে। তার পায়ে নেমে আসে সাঁঝের আঁধার, তারই মাঝে খুনীর ভয়ঙ্কর দেহে প্রতিশোধের বিচিত্র উপায়। সমকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় রহস্য কাহিনীকার জেমস হেডলী চেজের রক্তে তুফান তোলা এক ক্রাইম থ্রিলারের সার্থক রূপান্তর 'নেকড়ের থাবা'।

সাবধান ! ভয়াল অরণ্যে উদ্দাম উত্তাল নেকড়ের বীভৎস নখরযুক্ত থাবা !

॥ এক ॥

জেনী কনরাড। পরণে তার আকাশী রঙের নতুন গাউন। ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে তাকে। পোশাক-আশাকের দিকে সে যথেষ্ট সচেতন।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল জেনী। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির মাঝপথে, মুহূর্তের মধ্যে তার সুন্দর মুখখানি রাগে ভরে গেল।

—পল, টেলিফোনে হাত দেবে না। তাঁর স্বর ঠাণ্ডা হলেও কঠিন। রেগে গেলে জেনীর গলার আওয়াজ এমনই শোনায়।

পল কনরাড—জেনীর স্বামী। দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান সুদর্শন পুরুষ। সে পরেছে টুক্সেডো, মাথার কালো টুপি রয়েছে হাতে। সিঁড়ির ওপর থেকে সে বলল—বারে জবাব দিতে হবে তো। মনে হয় আমাকেই ডাকছে।

দু'পা এগিয়ে সে যখন টেলিফোন তুলছে তখন জেনীর উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—পল!

পল মৃদু হেসে হাতের ইশারায় চুপ করতে বললো।

—হ্যালো!

—পল? আমি বার্ডিন কথা বলছি। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে পুলিশ লেফটেনান্টের ভারি গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। চট করে চলে এসো, কাণ্ডটা একবার দেখে যাও। তোমাকে আসতেই হবে। জুন আরনটের বাড়িতে বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে! জুন আরনট নিজেও শেষ। কত তাড়াতাড়ি তুমি আসতে পারবে? বল?

নিমেষের মধ্যে পল কনরাডের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। দৃষ্টি ফেলল জেনীর দিকে। জেনী সিঁড়ির ধাপ কটা পেরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকেছে।

—আমি এক্ষুণি আসছি।

—ঠিক আছে। জুন আরনটের বাড়ি থেকে বলছি। চেনো তো? "ডেভ এণ্ড"। ডেভ এণ্ডই বটে।

—যাচ্ছি। পল রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

—জাহান্নামে যাও। জেনীর কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতা।

পল নিচে নেমে এসে বসবার ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে জেনী পিছন ফিরে দাঁড়াল।

—দুঃখিত, জেনী। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই।

—তোমার যা ইচ্ছে কর, উচ্ছন্নে যাও। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকো। আমি লক্ষ্য করছি, তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে এমনই ব্যবহার করছো। যখনই কোথাও বেড়াতে যাব বলে ঠিক করি তখনই যাও, চলে যাও, তোমার জঘন্য পুলিশের চাকরি নিয়ে মশগুল থাকো।

—এরকম ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়। আমি বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ দাঁড়াল। কিন্তু আমি নিরুপায়। কাল রাত্রে আমরা যাব, কেমন ?

জেনীর রাগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। টেবিল থেকে সশব্দে ঘড়ি, ফটো এবং আরও কয়েকটি জিনিস ফেলে দেয় সে।

—জেনী ! কি হচ্ছে ?

—চুলোয় যাও। যাও না, যত পার চোর-পুলিশ খেল গিয়ে। তোমাকে আমার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। ভেবেছো, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকবো ? মোটেই না। এরপর যেখানে যাব একাই যাব, যা করবার নিজেই করবো। জেনে-রেখো, তোমাকে বাদ দিয়েও আমি আনন্দ করতে পারি, অসুবিধা কিছু হবে না।

—জুন আরনট খুন হয়েছে। আমার একটা কর্তব্য আছে তো, আমাকে যেতে হবে। ফলে তোমার অ্যামবাসাডার নিয়ে যাব, কেমন ?

—বাড়িতে যতক্ষণ টেলিফোন আছে, তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না ; তিক্ত গলায় জবাব দিল জেনী, আমার কিছু টাকা চাই।

—কিন্তু····

—কিন্তু-ফিন্তু আমি শুনবো না, এখনই দরকার।

দেরী না করে পকেট থেকে পার্স বের করে, একখানি দশ ডলারের নোট জেনীর হাতে দিল—বেশতো, কোথাও যাওতো যাও, পাশের বাড়ি থেকে বেনকে ডেকে নাও না। একা·······

আমি কি করবো না করবো, তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও, খুনের হদিশ বের কর গিয়ে। আমার কথা আমিই ভাবব।

—কোথায় নামিয়ে দেব তোমায় ?

—প্রয়োজন নেই। জাহান্নামে যাও। জেনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পল কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হলঘর পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। গাড়ীতে উঠে স্টীয়ারিং হুইলে হাত রাখল, সে অনুভব করলো, নিঃশ্বাস তার জোরে পড়ছে। একটা চাপা আবেগ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে।

মনে মনে স্বীকার করলো না সে, কিন্তু বুঝতে বাকি রইলো না যে দিনে দিনে তার আর জেনীর মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে, সেটা ভাঙা দুঃসাধ্য। কিন্তু তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন বছর। গাড়িতে স্টার্ট দিল পল। বিয়ের প্রথম বছর সুন্দর কেটেছে। তখনও সে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নীর প্রধান গোয়েন্দা হয়নি, কাজের চাপও ছিল না এত। অতএব নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী ফিরে জেনীর মুখে হাসি ফুটিয়ে দুজনে বেড়াতে যাবার কোন অসুবিধাও ছিল না।

তার পদোন্নতির কথা শুনে জেনী খুব খুশী হয়েছিল। মাইনে বেড়ে হলো দ্বিগুণ। প্রথমে তারা ছিল তিন ঘরের ফ্ল্যাটে। তারপর ওয়েন্টওয়ার্থ স্ট্রীটের এই বাংলোয় এসে উঠেছিল। এখন তার সামাজিক মর্যাদাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু কাজ বেড়েছে যথেষ্ট—দিন নেই, রাত নেই যখন তখন তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফলে জেনী ক্রমশঃ বিরক্ত হতে লাগল।

জেনী একদিন বলেছিল—তুমি তো সাধারণ পুলিশের মতই দৌড়-ঝাঁপ করে করে বেড়াচ্ছো! কে বলবে তুমি একজন ডি এ-র (ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী, অর্থাৎ আঞ্চলিক প্রশাসক) প্রধান গোয়েন্দা ?

—প্রধান গোয়েন্দা হলেও আসলে আমি একজন পুলিশ। পল উত্তর দিয়েছিল। বড় কিছু ঘটলে আমারই তো আগে ডাক পড়বে।

প্রথমে পল ভেবেছিল, জেনী মানিয়ে নেবে। কিন্তু পারেনি। শুরু হল ঝগড়া, তারপর মনোমালিন্য, এখন জেনী জিনিসপত্র ভাঙচোর করে। জেনীকে নিয়ে পল আর পারছে না। সে ক্লান্ত। এমনভাবে সে কোনদিন ঠকতে চায়নি।

জেনী সুন্দরী, যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার চেহারা। তার চরিত্রে যে একটা উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি লুকোনো আছে, সেটা পলের অজানা নেই। বিয়ের আগে তার জীবনের কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খলতার গল্প জেনী নিজেই তাকে বলেছে। কিন্তু বিয়ের আগে সে যাই করুক, তার সঙ্গে পলের কোন সম্পর্ক

নেই, সেটা তার স্বতন্ত্র জীবন। এখন জেনী চল্লিশের তরুণী, সে কি আজ আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পা বাড়াবে ?

—যা পারে করুক গে! পলের গলা থেকে অস্পষ্ট শব্দ কটা বেরিয়ে এল। সে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

* * *

জুন আরনট হলিউডের অন্যতমা ধনী নায়িকা। কয়েক বছর ধরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্যাসিফিক সিটি আর হলিউডের মাঝ বরাবর তার নিজের বিরাট বাড়ি। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারিণী সে। অভাব নেই আরাম ও স্বাচ্ছন্দের।

গার্ডরুমটি লতাপাতা দিয়ে ঘেরা। ভেতরে প্রবেশ করার আগে প্রত্যেকটি লোককে আসতে হবে গার্ডরুমে। গার্ডের কাছে নোট বইতে নিজের নাম ও সময় লেখাতে হবে, জানাতে হবে নিজের দরকার, আসবার সময় আগে নির্দিষ্ট ছিল কিনা তাও জানাতে হবে। বাড়ির নাম 'ডেভ এণ্ড'।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে পল কনরাড নেমে পড়লো।

তার সামনে এসে দাঁড়ালো লেফটেনান্ট বার্ডিন। অন্ধকারে হঠাৎ কোথা থেকে তার আবির্ভাব হল তা পল বুঝতে পারলো না।

—আরে এসো, এসো। এমন পোশাকে ?

—স্ত্রীকে নিয়ে বেরোচ্ছিলাম। পল বললো। ঠিক ঐ সময়ে তোমার টেলিফোন পেলাম। সে হাসলো। ম্যাকক্যান এসেছে ?

—ক্যাপ্টেন কাজের জন্য সানফ্রান্সিস্‌কো গেছেন। কাল ফিরবেন কি সাংঘাতিক কাণ্ড। কি বলবো। তুমি আসাতে খুব খুশী হয়েছি।

—ব্যাপারটা কি বল তো শুনি।

বার্ডিন তার রুমালে একবার বিরাট মুখটা মুছে নিল। লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ; পলের চেয়ে দশ বছরের বড়, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

—সাড়ে আটটার সময় জুন আরনটের পাবলিসিটি ম্যানেজার হ্যারিসন ফেডোর আমাদের কাছে টেলিফোন করলো। ওর এখানে আসবার কথা ছিল। এসে দেখে দরজা খোলা। ব্যাপারটা তার কেমন যেন ঠেকে, কারণ, দরজায় সর্বদা চাবি আটকানো থাকে।

.. গার্ডরুমে ঢুকলো সে, দেখতে পেলো কে যেন গার্ডকে গুলি করেছে মাথায়। সর্বাঙ্গে রক্ত, মরে পড়ে আছে লোকটা। ফেডোর গার্ডরুম থেকেই

জন আয়রনটকে ফোন করেছিল। কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। তাই সে পুলিশ-স্টেশনে ফোন করে। আমি-ই টেলিফোন ধরেছিলাম।

—এখন লোকটা কোথায় আছে?

—ভেতরে। কোত্থেকে হুইস্কী যোগাড় করেছে, মনে শক্তি সাহস যুগোচ্ছে! ভাল করে কথা বলবার সময় পাইনি। তাই ছাড়িনি। পাঁচটি চাকর মারা গেছে। সবাই গুলিবিদ্ধ। সাঁতারের পুকুরে জন আরনটের মৃতদেহ পাওয়া গেল। কেউ ছুরি দিয়ে তার পেটটা চিরে দিয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডু কেটে দিয়েছে।

পল কনরাড স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলো। প্রায় এক মিনিট কাটার পর সে কথা বললো. হয়তো কোন পাগলের কাজ!

—আমি ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। জানালো বার্ডিন। পুলিশ তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে. চল দেখি।

প্রথমে ওরা গার্ড রুমে ঢুকলো। লোকটি একইভাবে পড়ে আছে। তার রক্তাক্ত মাথাটা টেবিলের উপর রয়েছে। —ডাক্তার কি সময়টা বলতে পারবে? পল প্রশ্ন করলো।

—ভেতরে আছে. দেখছে।

টেবিলের একপাশে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে নাম লেখার খাতাটা।

—খুনী নিশ্চয়ই নিজের নাম লেখেনি। বার্ডিনের কণ্ঠস্বর শুকনো শোনালো, আর গার্ড নিশ্চয় তাকে দেখেছিল। অতএব সাক্ষীকে সরিয়ে দেওয়াই সে নিরাপদ মনে করেছে।

পল খাতার খোলা পাতায় চোখ রাখলো।

সময়ঃ ৩টা, মিঃ জ্যাক বেলিং, ৭ লেনস্ক স্ট্রীট, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে।

৫টা, মিস রিটা স্ট্রেঞ্জ, ১৪ ক্রাউন স্ট্রীট; পূর্ব নির্ধারিত সময়ে।

৭টা, মিস ফ্রানসেস কোলম্যান, ১৪৫ গ্নমডেল এ্যাভিন্যু।

—খাতায় লেখা সময় দেখে মোটামুটি জানা যাচ্ছে মিস কোলম্যান খুনের সময়ে এখানে ছিল। বলল পল।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর সঙ্গে পরে দেখা করে জেনে নিতে হবে। চল, ভেতরে যাই।

সারিবদ্ধভাবে রাস্তার দুদিকে তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক পা এগোতেই একটা গাড়ি ওদের নজরে পড়লো। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে চারিদিক।

গাড়ির পাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন ডক্টর জেমস, তার পরণে সাদা কোট। দুজন হাসপাতালের আর্দালী আর দুজন পুলিশ। গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে।

পল আর বার্ডিন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একজন বয়স্ক চীনা। ক্ষত হয়েছে বুকে, সাদা জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে।

—হ্যালো, কনরাড। ডাক্তার বললো।

—বলতে পারেন, লোকটা কখন মারা গেছে? পল জানতে চাইল।

—মনে হয় সাতটার কিছু পরে।

—একই রিভলবারের গুলি?

—খুব সম্ভব তাই। সবাইকে খুন করা হয়েছে '৪৫ রিভলবার দিয়ে। এ নিশ্চয় পেশাদার খুনীর কাজ। এক এক গুলিতে শেষ করেছে এক একজনকে।

—লেফটেনাণ্ট, পল বললো, চল বাড়ীর ভিতরে যাই।

—চল।

আর কিছুটা দূরে বিরাট বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। দরজায় পুলিশ পাহারা।

তাদেরকে আসতে দেখে বারান্দা থেকে এগিয়ে এল সার্জেন্ট ও'ব্রায়াম। লম্বা রোগা চেহারা, কঠিন দৃষ্টি দুটি চোখে, মাথা ভর্তি চুল। পল কনরাডকে দেখে সে একটু মাথা দোলালো।

সামনের বসবার ঘরে এসে ওরা ঢুকলো।

—কিছু পাওয়া গেল?

গোটাকতক গুলি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। উত্তর দিল ও'ব্রায়াম। কোথাও আঙ্গুলের দাগ নেই। খুব সম্ভব খুনী সোজা ঢুকে পড়েছে, সামনে বাধা হয়ে যে দাঁড়িয়েছে তাকেই সাবাড় করেছে। তারপর বেরিয়ে গেছে। কিছু ধরেনি।

একটি চীনা মেয়ে পড়ে আছে ভেতরের ঘরে ঢুকবার দরজার কাছে। কাঁধের কাছে ক্ষত, হলদে জামাটা রক্তে ভিজে গেছে।

—চার নম্বর পড়ে আছে লাউঞ্জে। বার্ডিন বললো চল, দেখবে।

বড় ঘরের চারিদিকে চামড়ার কেদারা, চেয়ার টেবিল, বুক কেস, আলমারী —সব ঝকঝক-তকতক করছে। জন আরনটের বাটলারের মাথায় গুলি লেগেছে, পড়ে আছে জানালার নীচে।

—রান্নাঘরে পড়ে আছে আরো তুটো মৃতদেহ। দেখবে? খুব সম্ভব, ওরা তুজনেই পালাবার চেষ্টা করেছিল।

—খুব হয়েছে, আর নয়। বললো পল।

—ছাড়ো ওসব তুঃখ। এবার যেতে হবে স্নানের পুকুরে।

পাশের দরজা খুলেই চওড়া টেরাসে পা রাখলো বার্ডিন; পল তাকে অনুসরণ করছে। চাঁদ উঠেছে, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দূরে সমুদ্র চিক্‌চিক্ করছে।

ওরা তুজনে বাগানে এলো। চারিদিকে ফুলের গন্ধে মউ মউ করছে। কয়েক গজ দূরে ফোয়ারা, জোরালো লাল নীল বাতির আলোয় জল নাচানাচি করছে আনন্দে।

বার্ডিন বলল, দেখা যাচ্ছে, বিচিত্র আলোর প্রতি জন আরনটের প্রবল আসক্তি ছিল, তাই না পল? কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। কি নৃশংসভাবেই না ওর জীবনটা শেষ হয়ে গেল। ঐশ্বর্যের কি তুঃখজনক পরিণাম।

* * *

ডক্টর জেমস, ফোটোগ্রাফার আর চারজন পুলিশ পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। জলের দিকে তারা তাকিয়ে আছে। পল ওদের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মেলালো। দেখলো এখনও জলের লালচে ভাব রয়েছে। সার্চলাইটের আলোয় চারপাশের নীল জল নজরে পড়ে।

ওরা তুজন জলের ধারে এসে দাঁড়ালো।

—আমি একবার দেখেছি, বার্ডিন বললো। দ্বিতীয়বার আর দেখা যায় না। ঐ যে! দেখতে পেয়েছো? আঙ্গুল তুলে দেখালো বার্ডিন।

পল দেখলো জলের ধারে মাটিতে মুণ্ডহীন উলঙ্গ দেহটার দিকে।

—মাথাটা কোথায়। জানতে চাইল পল। পল ডাক্তারের দিকে তাকাল।

—যেখানে দেখেছিলাম সেইখানেই। কাপড় ছাড়বার একটা ঘরের টেবিলে। দেখতে যাবে?

—না, ধন্যবাদ। যা দেখবার সবই আমি দেখেছি। আপনার রিপোর্টের একটা নকল অনুগ্রহ করে আমায় দেবেন।

জেমস রাজী হলেন, মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—চল, ফেডোরের সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। পল বলল, ওকে ঘরে আসতে বল।

বার্ডিন একজন পুলিশকে নির্দেশ দিল।

ওরা ঘরে এসে সোফায় বসলো। তোমার কি ধারণা? পল জানতে চাইল।

—খুব সম্ভব, যে এটা করেছে, তার এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল। বাড়ীর সবাই ঐ লোকটিকে চিনতো তাই খুনী প্রত্যেককে খুন করেছে।

—কোন পাগলের কাজও হতে পারে, তাই না?

—তাহলে গার্ড প্রথমেই তাকে বাধা দিত!

—এ ব্যাপারে ফেডোর জড়িত নয় তো?

—না না, ওর অত ক্ষমতা নেই, ওকে আমি চিনি। জুন ওর একমাত্র মক্কেল, পয়সা আয়ের একমাত্র-রাস্তা, এছাড়া ওর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

—যতদূর সম্ভব, জুনের অনেক শত্রু ছিল। তার মত মেয়েদের জীবনে শত্রুর অভাব হয় না—পল বলল। তার লম্বা পা দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করলো, তবে যে লোকই হোক না কেন, সে জুনকে ভীষণ ঘৃণা করতো।

—জানি অনেক লোকের সঙ্গে জুনের মেলামেশা ছিল। ভাবতে পার কি, জ্যাক মরার-এর মত লোকের সঙ্গেও তার বিশেষ দহরম-মহরম ছিল?

পল কনরাডের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

—বিশেষ দহরম-মহরম মানে? সে পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

বার্ডিনের ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল।—আমি জানি, তুমি সোজা হয়ে বসবে। আমি জোরপূর্বক কিছু বলতে পারছি না। তবে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু আমি শুনেছি। জুন সর্বদা এটাকে চাপা রাখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লোকমুখে শোনা যায়, ওরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত ছিল।

—যদি সত্যিই তাই হয়, তবে মরারের পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব নয়। লোকটা অতি নিষ্ঠুর। দু'বছর আগে মেসিনগানের গুলিতে সে সাতটি লোককে হত্যা করেছিল, মনে পড়ে?

—জোর করে বলা যায় না, কাজটা মরারই করেছে। কারণ কোন প্রমাণ মেলেনি।

—তবে কে করেছে? এই শহরে ও আসার আগে একটাও খুন হয়নি, তাই না? মনে পড়েছে? ভেবে দেখ, প্রত্যেকটি খুনের পেছনে মরারের একটা না একটা স্বার্থ ছিল।

—ঐ সাতটা খুনের ব্যাপারে আমাদের ক্যাপটেন কিন্তু মরারকে সন্দেহ

করতে চান না। ম্যাক মনে করেন, ওটা জ্যাকবীর কাজ, মরারের ঘাড়ে ওরা দোষ চাপাবার চেষ্টা করছিল।

—ক্যাপ্টেনের এই সন্দেহের পেছনে কোন যুক্তি নেই। ভদ্রলোক তা জানেন। খুব সম্ভব জুনকে হত্যার পেছনেও মরারের হাত আছে।

—তুমি ওকে জেলে পুরতে চাও, তাই না ?

—জেলে ? অতি কঠিন গলায় বললো পল। আমার ইচ্ছা, ও ফাঁসীতে ঝুলুক। এতদিন ও জেলের বাইরে বাস করেছে এটাই বেশী।

দরজার কাছ থেকে একজন পুলিশের গলার স্বর শোনা গেল—মিঃ ফেডোর।

ঘরে ঢুকলো পাতলা ছোটখাটো চেহারার একজন লোক, মুখটাও ছোট, দুটি চোখে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। কনরাড দাঁড়াতে হ্যারিসন ফেডোর হাত বাড়িয়ে দিল। বলল—আপনাকে দেখে খুশী হলাম। কিন্তু আপনি এখানে কেন ? জুন ভাল আছে তো ?

—না, জুন আরনট খুন হয়েছে। বাড়ির সব লোক মৃত।

হ্যারিসন ফেডোরের ঠোঁট সামনের দিকে ঝুলে পড়লো। সে বোকার মত তাকিয়ে রইলো কনরাডের দিকে, তারপর দুম্ করে বসে পড়লো সোফায়।

—তার মানে সে মারা গেছে ? তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

—হ্যাঁ।

—হায় ঈশ্বর ! ফেডোর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল। হায় ভগবান ! সে একবার পলকে আবার বাডিনকে কেন্দ্র করছে।

—জুন ? বুঝতে পারছি না কাঁদব কি হাসব।

বাডিন গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলো—তার মানেটা কি ?

—আপনার বোঝবার ক্ষমতা কোথায় ? যদি জুন আরনটের সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করতেন তবে বুঝতেন। ওর মারা যাওয়ার অর্থটা আপনি কেমন করে জানবেন ? কাঁদব না, ঠিক। আমার আয় কমে গেল, সেটাও বেঠিক নয়। তবে সবচেয়ে বড় শান্তি, আমার ঘাড় থেকে একটা আপদ বিদেয় হল। ওঃ বাপরে ! আমাকে ওর পেছন পেছন সর্বদা ঘুরঘুর করতে হতো। আমার পেটে আলসার হয়েছে, তার মুলে ও।

—ওর মুণ্ডুটা কে যেন কেটে দেহ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে। কনরাড নরম স্বরে বলল। তাতেও তার রাগ মেটেনি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেটটা চিরে দিয়েছে। কে এই কাজটা করতে পারে, এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—কি আবোল-তাবোল বলছেন মশাই ? গলা কেটে ফেলেছে ? ও ভগবান ! এমন কাজ করার তার দরকার কি ?

অনুমান করা যাচ্ছে, যে একাজ করেছে সে জুন আরনটকে আদৌ পছন্দ করতো না। কে সেই লোক আন্দাজ করতে পারেন ?

ফেডোর নীরব, কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলো। তারপর বললো—না, কাউকে আমি সন্দেহ করতে পারছি না !

আর একটু ভেবে দেখুন তো ? বার্ডিন বললো।

—কিছুদিন ধরে রালফ জোরডানের সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এ বাড়িতে সে এবং রালফ জোরডান রাত কাটিয়েছে, তাও আমি জানি। তবে যতদুর আমার মনে হয়, ওর পক্ষে এমন নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানো অসম্ভব। সম্প্রতি ও নেশা করতে আরম্ভ করেছে কোকেন। এই নিয়ে জুনের সঙ্গে তার মাঝে মাঝেই মনোমালিন্য হতো।

—রালফকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বার্ডিন বললো। দেখা যাক, ওর কাছ থেকে কথা বার করা যায় কিনা।

—আমার কাছ থেকে যে কিছু শুনেছেন, অনুগ্রহ করে সেটা প্রকাশ করবেন না। তাহলে মনে করবে আমি ওর পেছনে পুলিশ ফেউ লাগিয়ে দিয়েছি। লোকটা গোলমেলে, কখন কি ঘটিয়ে বসে তার ঠিক নেই।

—শুনেছি, জ্যাক মরার-এর সঙ্গে ওর ভালবাসা ছিল, এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন ?

ফেডোর চোখ নামিয়ে নিল, নিজের হাত লক্ষ্য করতে লাগলো।

—না, এ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই।

—মরার সম্বন্ধে আপনার কাছে জুন কিছু বলেনি ?

—না, সে কোনদিন কিছু বলেনি।

—এদের দুজনের নাম একসঙ্গে কোথাও কোন প্রসঙ্গে উঠেছে বলতে পারেন ?

—না।

—দুজনকে একসঙ্গে কখনও দেখেছেন ?

—না।

—আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এই শহরে মরার নামে যে একটা লোক আছে, সেটা আপনি জানেন না। পল বললো।

—না না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। ফেডোর তাড়াতাড়ি বলল। আমার কিছু জানা থাকলে বলতাম। ওর সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি খবরের কাগজ থেকে।

দরজার কাছে সার্জেণ্ট ও'ব্রায়ানকে দেখা গেল।

—কি খবর? বার্ডিন প্রশ্ন করল।

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বার্ডিন।

এক মিনিট পরেই হাতে একটা ·৪৫ অটোম্যাটিক রিভলবার নিয়ে সে আবার ঘরে ঢুকলো।

—দেখ।

রিভলবারটি কনরাড হাতে নিল। হাতলের ওপর আর জে. অক্ষর দুটি খোদাই করা রয়েছে।

—কোথায় পাওয়া গেল?

—বাগানের ধারে। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে। শুঁকলে এখনও গন্ধ পাওয়া যাবে।

বার্ডিন রিভলবার আবার ফেরত দিল ও'ব্রায়ানকে। —আর. জে.। রালফ জোরডানের সঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। চল যাবে?

*　　　*　　　*

অনেকগুলি গাড়ি সারিবদ্ধ দাঁড়ানো। একপাশে গ্যারেজের সারি, সামনে কম্পাউণ্ড। হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল, একটা বড় কালো ক্যাডিলাক গাড়ি কে যেন দরজার কাছে ফেলে রেখে গেছে।

গাড়ি থামাল, নেমে এল পল ও বার্ডিন।

পল হাঁটতে লাগলো, তাকে অনুসরণ করলো বার্ডিন।

দরজায় ধাক্কা লেগে গাড়িটা একপাশে দুমড়ে গেছে! দরজা থেকে কাঠের কয়েকটা টুকরো বেরিয়ে গেছে এদিক-ওদিক।

—সম্ভবতঃ, ধাক্কাটা জোরেই লেগেছে। পল বলল।

বার্ডিন নীচু হয়ে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন আর মালিকের নামটা লিখে নিল।

—যা আন্দাজ করেছিলাম ঠিক তাই। সে বলল, জোরডানের গাড়ি।

—তাহলে ওকে বাড়ীতেই পাওয়া যাবে।

ঘুরানো দরজা পার হয়ে দুজনে বাড়ীতে ঢুকল। তারা কার খোঁজ করছে,

রিসেপসন ক্লার্ক জানতে চাইলো। বাডিন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। বের করে নিয়ে এলো তার পরিচয় পত্র। তারপর ওর হাতে দিল।

লোকটির দাঁতে দাঁত পড়লো—লেফটেনাণ্ট বাডিন, সিটি পুলিশ। তারপর কার্ডটা ফেরত দিয়ে বলল, আপনারা কার কাছে যাবেন ?

—মিঃ রালফ জোরডান কি আছেন ?

—হ্যাঁ।

—কখন ফিরেছে ?

—আটটার পর।

—মদ খেয়েছিল ? বেসামাল মনে হচ্ছিল ?

—আমি নজর দিইনি।

—কখন বেরিয়েছিল ?

—ছটার পর।

—ওপর তলায় থাকে ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। টেলিফোনে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে। আমরা ওকে একটু অবাক করে দিতে চাই। ওর সঙ্গে কেউ আছে ?

—খুব সম্ভব, কেউ নেই।

দুজনে লিফটে উঠলো।

—ভদ্রলোক বেরিয়েছেন ছটার পর, আবার ফিরে এসেছেন আটটার পর। ডেভ, এ তো' কাজ গুছিয়ে ফিরে আসার পক্ষে যথেষ্ট সময়।

বোতাম টেপার অপেক্ষায়, লিফট ওপরে উঠে এল। লিফট থেকে বেরিয়েই সামনে রালফের ফ্ল্যাট।

বাইরের দরজার সামনে এসে বাডিন দাঁড়ালো—কি গো, দরজা যে হাঁ করা। বেল টিপল সে।

ভেতরে কোথায় বেলটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলো।

কোন আওয়াজ নেই।

পায়ের আলগা লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললো বাডিন! তারপর বাডিনকে লক্ষ্য করে পল এগোল।

বসবার ঘর। ভেতরে ঢুকবার দরজাটা ভেজানো। ওরা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে

ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বলছে। একটা আরাম কেদারা, জানালায় পর্দা, দেওয়ালের পাশে রেডিওগ্রাম আর টেলিভিশন।

—এসব বাথে লোকগুলো কিভাবে বাস করে দেখ। বাডিনের মন্তব্য শোনা গেল।

—কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না তো।

বাডিন কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় তুলে চেঁচালো—এ ঘরে কেউ আছে ?

কিন্তু কোন সাড়া মিললো না। কেবল জানালার পর্দাগুলো একটু দুলে উঠলো যেন।

আবার মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো চরম নিস্তব্ধতা।

—কি করবে ? বাডিন জানতে চাইল।

—মনে হয় আবার বেরিয়ে গেছে, দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

বাঁদিকে ঘরের দরজা বন্ধ। বাডিন জোরে জোরে কয়েকটি ঘা মারলো। কিন্তু কোন শব্দ নেই।

অপেক্ষা না করে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেললো সে। শোবার ঘর। ঘরের মেঝের পুরু গালিচা আর বারো ফুট লম্বা খাটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা।

—কেউ নেই। বলল পল।

—দেখি একবার বাথরুমটা। বাডিনের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনালো।

কয়েক পা হেঁটে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা মারলো পল।

রালফ জোরডান জলশূন্য বাথটবে পড়ে আছে। গাঢ় লাল ড্রেসিং গাউন এবং হালকা নীল রঙের পাজামা তার পরণে। ড্রেসিং গাউনটা রক্তে লাল, টবের গায়ে রক্ত ছিটিকে লেগেছে। ডান হাতে রয়েছে একটা খোলা ক্ষুর, যেন ক্ষুরের ফলায় লাল রঙ কে মাখিয়ে দিয়েছে।

বাডিন নীচু হয়ে ওর হাতটা স্পর্শ করলো।

—উঃ, অনেকক্ষণ মরেছে, ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে।

রালফ্ জোরডানের গলাকাটা, কণ্ঠনালী পর্যন্ত আলাদা হয়ে গেছে।

বাডিন সোজা হয়ে দাঁড়াল—মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। ওখানে গিয়ে সবকটাকে একধারসে কুপিয়ে মক্কেল বাথরুমে ঢুকে এই আপদকেও নির্মূল করেছে। ভালোই হল, আমাদের আর হাংগামা করতে হবে না। পকেট থেকে সিগারেট বের করলো সে। তারপর সুখটান দিয়ে মৃত লোকটার মুখ লক্ষ্য করে ধোঁয়া ছাড়লো।

কনরাড তীক্ষ্ণ নজর ফেলে বাথরুমের চারদিক দেখতে লাগল। দেওয়াল-তাকে রাখা দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

—এটা কি আশ্চর্য হবার নয় ? দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকতে একটা গলাকাটা ক্ষুর কেন জোরডান ব্যবহার করে। আজকাল কাউকে ক্ষুর ব্যবহার করতে তুমি দেখেছো ? আমার তো নজরে পড়ে না।

—মনে হয় আঁচিল কাটবার জন্য ওটা এনেছে। আঁচিল অনেকেই ক্ষুর দিয়ে কাটে।

বাথরুমের পাশের ঘরে বার্ডিন চোখ রাখল। ড্রেসিং রুম। বিলাস-সামগ্রী চারদিকে সাজানো। একটা চেয়ারের ওপর পড়ে আছে স্যুট, সার্ট আর সিল্কের আনডার ওয়ার। মাটিতে জুতো আর মোজা দেখতে পেল।

শোবার ঘরে পা রাখলে কনরাড। হঠাৎ দেওয়ালের কোণায় দৃষ্টি চলে যেতেই সে কঠিন হয়ে গেল।

কয়েক পা এগিয়ে গেল সেদিকে। একটা বড় ছোরা।

—লেফটেনান্ট, এদিকে আসবে ?

—কি ব্যাপার ? বার্ডিন তার কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো। আমি হলপ করে বলতে পারি এই ছোরা দিয়ে জুন আরনটের গলা কাটা হয়েছে, তার পেট চেরা হয়েছে।

এসব ছুরি তো এখানে দেখা যায় না, দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে ব্যবহার করা হয়। জোরডান এটা কেমন করে পেল ?

—হয়তো কখনও গিয়েছিল, সখ করে নিয়ে এসেছে। এতে আবার অবাক হবার কি আছে ? এতে রক্ত লেগে আছে। পরীক্ষা করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে জুন আরনটের রক্ত। এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ আছে ?

—হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু জোরডান এ ছোরা ব্যবহার করেছে তার প্রমাণ কি পেলে ? এমন নিখুঁত সব ব্যাপার, কেমন যেন—

—নিকুচি করেছে তোমার গোয়েন্দাগিরি। বাহাদুরী নেবার ছল-ফাঁক খুঁজছো তুমি। ওসব ছাড়। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ক্যাপটেনেরও তাই। আমি জানি, তুমি কেবল রাতদিন মরারকে ভাবছো। ওকে তুমি ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছো, কি ঠিক তো ?

—কি জানি। সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চল, যাই। হেড কোয়ার্টারে তোমাকে নামিয়ে দেব।

—না, তুমি চলে যাও। আমার এখানে অনেক কাজ আছে, খবর পাঠাতে হবে। ডাক্তার—ফটোগ্রাফার—অনেক কিছু। তুমি কি বাড়ী যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালই আছ ভায়া। বাড়ী গিয়ে শ্রীমতীর নরম হাতের ছোঁয়া। কেমন আছেন মিসেস কনরাড ?

—ভালই আছেন।

পল বিরক্ত বোধ করলো, কথাগুলোতে এতটুকু উৎসাহের স্পর্শ নেই।

* * *

পল ধীরে ধীরে গাড়ী চালাচ্ছিল।

তার মনে এসে ভিড় করলো জেনীর কথা। ও যা বলেছে তাই কি করবে ? ফূর্তি করতে একাই যাবে ? নাকি বাড়ী ফিরে এসেছে ?

গাড়ীর স্পীড কমাল, সিগারেট বের করে আগুন ধরাল। হঠাৎ বাইরে গ্লেনডেন এ্যাভিন্যু সাইনবোর্ডটা সে দেখতে পেল।

রাস্তাটা পেরিয়ে সে চলে এসেছিল। আচমকা মনে পড়ল ঐ নামটা—ফ্রানসেস কোলম্যান। এই রাস্তাতেই তো থাকে মেয়েটা! মনে পড়ল, সন্ধ্যা সাতটার সময় সে জুন আরনল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তার নজরে কি কিছুই পড়েনি ?

এই ভেবে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো পল। রাস্তা জনমানব শূন্য। ১৪৫নং গ্লেনডেন এ্যাভিন্যু কোন্ দিকে হবে ? ১২৩ নম্বর বাড়ীটা সামনেই। খানিকটা হাঁটল সে এবং পেয়ে গেল ১৪৫নং বাড়ী।

পুরোনো পাঁচতলা লম্বা বাড়ি। হল পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে গেল পল। অন্ধকার। অনেকগুলি চিঠির বাক্স সিঁড়ির পাশেই আটকানো।

প্রথম দুটির পর তৃতীয়টিতে পেয়ে গেল। মিস ফ্রানসেস কোলম্যানের ঘরের হদিস, চারতলা।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হতে লাগলো সে। পুরনো বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কানে ভেসে এল রেডিওর বাজনা। চারতলায় উঠে সামনের দরজায় নজর আটকে গেল—মিস কোলম্যান।

দরজায় টোকা মারার জন্য হাত বাড়াতেই লক্ষ্য করলো, দরজাটা ভেজানো। তবু কয়েকটা জোরে জোরে টোকা মারল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না। কি রে বাবা, আরেকটা গলা-কাটা মড়া কি ভেতরে দেখতে পাবো ?

পলের গা শিরশিরিয়ে ওঠে।

আলগা একটা ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। পল ভেতরে উঁকি দিলো। অন্ধকার।

—কেউ আছ ?

কোন সাড়া মিললো না।

আলো জ্বালার জন্য দেয়ালের দিকে হাত বাড়ালো, সুইচ খুঁজতে লাগলো। অবশেষে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। না, যা ভয় করেছিল সেরকম কিছু ঘটেনি, মরা বা রক্তের দাগ কোথাও নেই। ছুরি ছোরারও হদিশ মিললো না। ছোট ঘরটায় একটা লোহার খাট, যেমন তেমন একটা বিছানা, চেস্ট অফ ড্রয়ারস আর একটি চেয়ার।

পলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘরের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরে গেল। তারপর চেস্ট অব ড্রয়ারের প্রথম দরজাটা টান দিয়ে বার করলো। খালি। একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে দেখলো। না, কিছুই নেই। কয়েকখানা বাজে কাগজ আর কয়েক-খানা বোর্ডের বাক্স ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। সে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

বাথরুমের দরজাটাও খুলে ফেললো, খালি। তারপর ছোট রান্নার জায়গাটারও একই পরিণতি। বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে এলো সে, দরজাটা যেমন ভেজানো ছিল তেমনি করে টেনে দিল। তারপর সোজা নিচে নেমে এল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দরজার পাশে লেখা অক্ষরগুলো তার নজরে পড়লো—ম্যানেজার : পেছনে।

সিঁড়ির পাশ দিয়ে সে পেছন দিকে এল। ছোট অফিস। একজন মোটা লোক টেবিলে পা তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। পল দরজার কাছে দাঁড়াতেই সে বলল—ঘেয়ো কুকুরের গায়ে যেমন মাছি বিড়বিড় করে তেমনি বাড়ি ভর্তি লোক। ঘর খালি নেই, বন্ধু।

—খুব সম্ভব, চারতলায় একটা ঘর খালি আছে। পল বলল, মিস কোলম্যান ওঘর ছেড়ে দিয়েছে।

—আপনি এ খবরটা জানলেন কি করে মশাই ?

—এখুনি দেখে এলাম। ঘর জনশূন্য। মায় জামা-কাপড় কিছু নেই।

—আপনার পরিচয় ?

—সিটি পুলিশ।

এবার মোটা লোকটার যেন চেতন ফিরলো, ধীরে ধীরে সে টেবিল থেকে পা নামালো।

—মিস্ কোলম্যান কি করেছে ?

পল দরজায় হেলান দিয়ে ভাল করে দাঁড়াল—ও কখন ঘর ছেড়েছে ?

—আরে, আমি তো জানিই না সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এই তো সকালেও দেখেছি। যাক বাবা, বাঁচালো। নাহলে কালকেই ওকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য বলতে হতো।

—কারণ ?

—সেই পুরোনো ব্যাপার। তিন হপ্তার ভাড়া বাকি।

—ওর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? এ বাড়িতে কখন এসেছিল ?

—প্রায় একমাস আগে। ফিল্মে কাজ করে নাকি। ছোটখাট পার্ট। ধরুন জনতার দৃশ্যে ভিড় বাড়ানো বা ঐ ধরণের কিছু। তবে মেয়েটির চেহারাও যেমন সুন্দর তেমনি তার স্বভাব। লেগে থাকলে একদিন দাঁড়াতে পারবে। যদি ওর মতো আমার একটা মেয়ে থাকতো। লোকটা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

…কথাবার্তা খুবই সভ্য, নম্র, বিনয়ী। কিন্তু তার টাকার অভাব। আর এ ধরণের মেয়ের তো টাকা থাকবার কথা নয়। যতসব নোংরা খারাপ মেয়েদের টাকা থাকবে। ওর বাবা-মার কাছে ওকে আমি ফিরে যেতে বলেছিলাম। আমার কথা শোনে নি। বলেছিল, কালই বাড়িভাড়া মিটিয়ে দেবে। খুব সম্ভব টাকা জোগাড় করতে পারেনি, তাই পালিয়ে বেঁচেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ পল ভীষণ ক্লান্ত, শ্রান্ত বলে অনুভব করল। এমন একটি অনামী মেয়ে কেন যে আরনল্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, ভেবে পেল না। হয়তো অবশেষে দেখা না পেয়ে গার্ড-রুম থেকে ফিরে এসেছে। আর তার সঙ্গে দেখা করার জুন আরনল্টের কি দরকার ?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো, বারোটা বেজে গেছে।

—ধন্যবাদ। এবার চলি। যতটুকু জানার জেনে গেলাম।

—মেয়েটা কোন বিপদে পড়েছে কি ?

—না, কোন বিপদে পড়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

কনরাড বাইরে বেরিয়ে এলো, গাড়ীতে উঠে বসলো। এবার সে বাড়ি যাবে, তাই ঐ দিক লক্ষ্য করে গাড়ী চালিয়ে দিল।

বাডিন সন্দেহ করছে, জোরডানই কাণ্ডটা করেছে। যদি তাই হয়, তাহলে সে কেন শুধু শুধু মাথাব্যথা করছে? কাল সকালেই যাবে ডি. এ-র কাছে। তবু তার মনে হয়, সে যদি জুন আর মরারের সম্পর্কটা সঠিক জানতে পারত! যদি সত্যিই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকে, তাহলে তার পক্ষে এমন হত্যাকাণ্ড একেবারেই অসম্ভব নয়। হয় নিজে, না হয় অন্য কারুকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে পল বাড়ীতে প্রবেশ করলো। পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ঐ ঘটনাগুলি। জাহান্নামে যাক—অস্ফুটে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। কেবল অন্ধকার। ছোট হলঘর পেরিয়ে শোবার ঘরে এসে পাখা খোলে পল, সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। না, ঘরে কেউ নেই।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনেই আবার সে বলে উঠলো—জাহান্নামে যাক।

॥ দুই ॥

ডিসট্রিক্‌ট্‌ এ্যাটর্নী চার্লস ফরেস্টের গম্ভীর মুখ, বড় টেবিলের উপর প্রসারিত তার দুটি মোটা হাত, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

লোকটির শক্ত, তাগড়াই চেহারা, কিন্তু সেই অনুযায়ী লম্বা নয়। মাথায় একরাশ ঘন সাদা চুল।

—তাহলে পল, তোমার বক্তব্য, ম্যাককানের ধারণা এটা জোরডানের কাজ। আমি বার্ডিনের রিপোর্ট পড়লাম। ওদের সিদ্ধান্ত জোরডানই অপরাধী। তাহলে এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কি প্রয়োজন?

পল চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলো—ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে অতটা সোজা মনে হচ্ছে না, স্যার। ডক্টর হোমস-এর অনুমান, কোন পেশাদার খুনী একাজ করেছে। আমারও ধারণা তাই। ছ-গুলিতে ছ-জনকে খুন করা কোন নতুন হাতের কাজ নয়, এটা অসম্ভব বলে মনে হয়। তাও আবার '৪৫ রিভলবার দিয়ে, এগুলি পেছনদিকে ভীষণ ধাক্কা দেয়। অথচ প্রত্যেকটি গুলির নিখুঁত লক্ষ্য। ওস্তাদ খুনী না হলে এমন পাকা কাজ করা অসম্ভব।

—বুঝলাম, তোমার কথাগুলোও শোনবার মত আছে।

—বৈদ্যুতিক সেফ্‌টি রেজার দিয়ে রালফ জোরডান দাড়ি কামায়। কিন্তু ওর কাছে গলা-কাটা ক্ষুর পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারটা আপনাকে অবাক করছে না?

—তা অবশ্য ঠিক, তবে অনেকেই পায়ের আঁচিল কাটবার জন্য ক্ষুর ব্যবহার করে।

—বার্ডিনও এই কথা বলছিল। কিন্তু ডঃ হোমস্‌কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ওর শরীরে কোন জায়গায় আঁচিল নেই। আর একটা কথা. ওর পোশাকে রক্তের কোন দাগ নেই।

ফরেস্ট ঘাড় নাড়লেন।

—বার্ডিনের ধারণা, জুন আরনটের সঙ্গে মরারের অবৈধ-প্রণয় ছিল। জোরডানের সঙ্গেও জুন ভালবাসা স্থাপন করেছিল। এটা যদি মরার জানতে

পারে তাহলে সে কি করবে ? নিশ্চয় জনকে আদর করবে না। আমি মরারের ব্যবহার সম্বন্ধে যতটুকু জানি, সে সোজা গিয়ে জনের পেটটা চিরবে, তারপর গলাটা কেটে দেহ থেকে আলাদা করে দেবে। এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

··তার সঙ্গে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তেমনি তার শাস্তিও সে দিয়ে দেবে। এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তারপর বাকি ঘটনাগুলি সাজানো হতে পারে, এমন কি জোরডানের আত্মহত্যা পর্যন্ত।

—আচ্ছা, মরারের সঙ্গে জন আরনধের যে প্রণয়-সম্পর্ক ছিল সেরকম কোন প্রমাণ কি আমাদের ফাইলে আছে ?

—এখনকার মত নেই। তবে ঠিকমত খুঁজলে খুব সম্ভব প্রমাণ মিলবে।

—যদি তেমন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে মনে হচ্ছে, তোমার ধারণার ভিত্তিই দৃঢ় থাকবে। ছাইদানিতে সিগারেটটা ফেলে দিল ফরেস্ট। তারপর তিনি কনরাডকে লক্ষ্য করলেন, বুঝতে চেষ্টা করলেন তার মনের বক্তব্য।

তারপর তিনি বললেন—পল, আমার ইচ্ছে, মরার ধরা পড়ুক। আমি জানি তুমিও একই তালে আছো। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে খাড়া করবার মত কোন প্রমাণ-পত্র নেই। ভারী চালাক লোক, সর্বদা নিয়ম মেনে চলে, সর্বদা আইনের আওতার মধ্যে থাকে। দু-বছরে ওর চারজন অনুচরকে আমরা জেলে পুরেছি। অনেক বাধাবিপত্তি ডিঙোতে হয়েছে। তবেই আমরা প্রশংসা অর্জন করেছি।

·· এই ব্যাপারের পেছনে মরারের হাত রয়েছে—এটাই তোমার অনুমান। হতে পারে, খুবই সম্ভব। বেশ, কি করতে পার দেখ। তবে তুমি কি করছো কাউকে জানাবে না। মরারকে হঠাৎ ফাঁদে ফেলতে হবে। ওর সাকরেদেরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পুলিশের কাজকর্মের খবরও তাদের জানা হয়ে যায়। কাগজে-কলমে কিছু লিখতে হবে না, কোন রিপোর্টের প্রয়োজন নেই। কেবল আমি জানতে পারলেই হলো। পুলিশ হেড কোয়ার্টারেও জানানো ঠিক নয়, কারণ আমার ধারণা, পুলিশের কারুর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে।

পল কনরাড খুশী হল। ও জানতো, ফরেস্ট তার বক্তব্যে সাড়া দেবে।

—খুব আনন্দিত হলাম স্যার। আমি এখুনি কাজ শুরু করে দিচ্ছি। ভ্যান রোশ আর মিস ফিলডিং খুব চালাক। আমাকে সাহায্য করার জন্য ওরা সর্বদা সতর্ক হয়ে আছে। প্রথমে খোঁজ নিতে হবে জন আরনটের সম্পর্কে, দেখি

সূত্র মেলে কি না। মরারের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা আসলে কি রকম ছিল, সেটা জানতে পারলেই, আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে।

—বেশ তো, তুমি যেমন মনে করো তেমনি করো পল। কোন রিপোর্ট পেলেই আমাকে জানাবে। এবার ঘড়ির দিকে তাকালো যরেস্ট। আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে কোর্টে যেতে হবে।

—আচ্ছা। কনরাড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—পল, তোমাকে আর একটা কথা বলবো, অবশ্য এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমাকে নিজের মনে করি তাই তোমাকে বলছি। যদি তোমার এটা অপছন্দ হয়, কোন দ্বিধা না করে আমাকে বলবে। আমি কিছু মনে করবো না। তবে তোমাকে জানানো আমি কর্তব্য মনে করি।

—একশোবার। আমি জানি, আপনি আমার শুভাকাঙ্খী। বলুন, কি বলবেন?

—এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। যরেস্ট হাসলেন। তুমি তোমার স্ত্রীর দিকে একটু নজর দিচ্ছো তো?

নিমেষের মধ্যেই পলের মুখের ওপর নেমে আসে কঠিন ছায়া। এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

—স্যার, আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

—আমি একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম, তোমার স্ত্রী নাকি কাল রাত্রে একা প্যারাডাইস ক্লাবে গিছেনিল। তাছাড়া সে নিজেও সুস্থ ছিল না। তোমার নিশ্চয় অজানা নয়, মরার হচ্ছে ঐ ক্লাবের মালিক। তার গুণ্ডার দল চারিদিকে ছড়ানো। যরেস্ট উঠে দাঁড়ালেন।

এই, আর কিছু বলার নেই। তুমি জান কিনা জানি না। যদি তুমি না জেনে থাক, তাই ভাবলাম, তোমায় জানিয়ে দিই। ওর সঙ্গে কথা বলে একটা কিছু ব্যবস্থা করে নাও। এটা আমাদের কাছে বদনাম তো বটেই, তোমার স্ত্রীর পক্ষেও ভাল হবে না।

তিনি একটু হাসলেন। পলের কাঁধে হাত রাখলেন—কি হল, এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন? তোমার স্ত্রীর বয়স কম, তায় আবার সুন্দরী। এ ধরণের মেয়েরা মাঝে মাঝে উত্তেজনার জন্য হাঁপিয়ে ওঠে। তোমায় তো আর সর্বদা কাছে পায় না। তাই নিয়ে এত উতলা হলে চলবে কি করে? যাই হোক,

বাড়ী যাও, ওর সঙ্গে কথা বলো, বুঝিয়ে বলবে। ঝগড়া করো না। দেখো তোমার কথা ও নিশ্চয়ই শুনবে।

তারপর পলের কাঁধে কয়েকটা আল্‌তো চাপড় মেরে বললেন—চলি আমি। ব্রীফ-কেসটা হাতে তুলে নিলেন। পরে দেখা হবে।

—হ্যাঁ স্যার। পলের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

* * *

কনরাডের দুজন কর্মচারা। তার সেক্রেটারী ম্যাজ ফিলডিং আর বাইরের কাজ করবার জন্য ভ্যান রোশ। দুজনেই কাজে পাগল। কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না তারা।

পল কনরাড অফিসে ঢুকলো, দেখলো তারা ওর জন্যই অপেক্ষা করছে। একটা চেয়ারে বসলো সে।

—পুলিশের কি বক্তব্য? ভ্যান রোশ জানতে চাইলো।

—পুলিশ যা-ই বলুক, আমরা মরারকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছি। পুলিশ যা রিপোর্ট দিয়েছে, সেটা ডি. এ.-র মনমত হয়নি। তাই মরারই হবে আমাদের লক্ষ্য।

পাতলা ছিপছিপে চেহারা রোশের, পরিচ্ছন্ন চেহারা, সরু গোঁফওলা মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

—চমৎকার, পল! বল কি করণীয়?

কনরাড তার সেক্রেটারী মিস্ ফিলডিংয়ের দিকে তাকাল। সে একটা পেনসিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বড় চোখ দুটি দেখে মনে হয় কি যেন ভাবছে।

ছাব্বিশ কি সাতাশ বছরের তরুণী ম্যাজের ছোটখাটো সাধারণ গড়ন। সুন্দরী নয়, তবে একটা আলাদা আকর্ষণ আছে ওর চেহারায়, একটা সহজ আভিজাত্যও লক্ষ্য করা যায়।

—কি ম্যাজ, পল হাসিমুখে প্রশ্ন করলো, তুমি চুপ কেন? কিছু বলছো না।

—বললেন তো মরারের পেছনে লাগবেন। দু'জনে দুটো বুলেট প্রুফ জামা পরে নেবেন। ভাববেন না বিদ্রূপ করছি।

—ও ঠিকই বলেছে, ভ্যান বললো, আমার শেষকৃত্যের খরচ কে দেবে? একটা জীবন-বীমা করে নেব। আমি চাই আমাকে বেশ জাঁক-জমক করে কবর দেওয়া হবে।

পল কনরাড মাথা নেড়ে বললো—গুলি এখন চলবে না, এটা তোমরা ধরে নিতে পারো। দশ বছর আগে হলে সে আমাদের তোয়াক্কা করতো না, এখন আর সেদিন নেই। আপাততঃ পুলিশের লোককে মরার চটাবে না।

—মরার এখন প্রচুর পয়সার মালিক, বড় ব্যবসায়ী। সে কখনই চাইবে না, তার সব কিছু নষ্ট হয়ে যাক। আমার মনে হয়, ওদিক থেকে আশংকা করার মত বিশেষ কিছু নেই। তবে যে কোন ভাবে সাক্ষীদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী আমরা পাই।

—যাক তোমার আশ্বাস-বাণী শুনে শান্ত হলাম। বলল রোশ, এখন বল কিভাবে কাজে নামবে। আমাদের প্রথম করণীয় কি ?

রোশ একটা সিগারেট ধরালো।

—আমাদের কি কি কাজ বাকি পড়ে আছে, এই নিয়ে প্রথমেই একটা তালিকা তৈরী করতে হবে। যেগুলি জরুরী কাজ, সেগুলি আগে শেষ করতে হবে। এর পেছনে আমরা ঘণ্টা দুয়েক সময় ব্যয় করবো। তারপর মরারকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে। ম্যাজ, যে কাজগুলি তাড়াতাড়ি করা যাবে না, সেগুলি নিয়ে তুমি একটা তালিকা তৈরী করে ফেলো। সেগুলি নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।

দুজনে যে যার কাজে লেগে গেল।

মোটামুটি একটা ছকে আসতে দুঘণ্টারও বেশী সময় লাগলো। কম করেও পনেরোটা টেলিফোন করলো ওরা বিভিন্ন জায়গায়।

কাজ সম্পূর্ণ করে দুজনে পলের টেবিলে এল।

—আমাদের প্রথম কাজ হবে, পল বলল, মরারের সঙ্গে জন আরনটের কি রকম সম্পর্ক ছিল, এটা প্রমাণ করা। জনের দিক থেকেই কাজটা শুরু করা ভাল। রোশ, তুমি কাল 'ডেভ এণ্ডে' যাও। ওখানে আশেপাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে জন সম্পর্কে কিছু বার করতে হবে। দেখো চেষ্টা করে পারো কিনা। শুরু করবে জোরডানের প্রসঙ্গ দিয়ে, যেন তার খোঁজে গেছো। এছাড়া এমন কোন লোকের বিবরণ পাও কিনা, যারা জনের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। হয়তো কথায় কথায় মরারের খোঁজ পেয়ে যেতে পার। তবে যাই কর না কেন, মরারের নাম উল্লেখ করবে না।

বিকেলের দিকে অফিস বন্ধ করে দিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো।

পল তার গাড়ীতে উঠলো। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েই তার মনে পড়লো

জেনীকে। সারাদিন আর ওর কথা মনে আসে নি। যদিও বা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে, তাও মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

জেনী কি আর জায়গা পেলো না? কেন সে প্যারাডাইস ক্লাবে গিয়েছিল? গাড়ি চালিয়ে দিল পল। তার রাগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। জেনী ভাল করেই জানে, জ্যাক-মরার এই ক্লাবের মালিক। তাকে রাগাবার জন্য সে ইচ্ছে করেই ওখানে গেছে?

আর ঐ লোকটিই বা কে, যে ফরেস্টকে জানিয়েছে? নিশ্চয়ই সে তার হিতৈষী। :নে পড়ে গেল—"তাকে একটু বেসামাল অবস্থায় দেখা গেছে।" নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে অন্যের মুখে এমন ধরণের মন্তব্য শুনলে কোন লোকটা খুশী হবে শুনি। "কথা বল ওর সঙ্গে, নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনবে।"

বাড়ী এসে পৌছলো পল। ভেতরে ঢুকে দেখলো বসবার ঘরে জেনী বসে আছে, একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে।

ওকে দেখে পল অস্বস্তি বোধ করলো, নিজে স্বাভাবিক হতে পারলো না, হাসতেও সে বাধা পেল। জেনীও যেন কঠিন হয়ে বসে আছে।

যদিও পলের হালকা ঘুম, তবু জেনী কত রাত্রে বাড়ী ফিরেছে সে জানে না। সকালবেলা উঠে দেখে জেনী ঘুমুচ্ছে। এমনই কায়দায় শুয়ে আছে মনে হল ঘুমোইনি, ঘুমোনোর ভান করছে।

পল তাড়াতাড়ি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো, প্রসঙ্গটা এখুনি তুলবে। চেঁচামেচি যে হবে, সেদিকে সে নিশ্চিত। তা হোক।

—জেনী?

—কি? জেনী মুখ না তুলেই ঠাণ্ডা গলায় সাড়া দিল।

—প্যারাডাইস ক্লাবে তুমি কাল রাতে গিয়েছিলে?

তার মুখটা নিমেষে শক্ত হয়ে গেল। সে তাকাল পলের দিকে, দুটি চোখে রাগ স্পষ্ট।

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তাতে হয়েছে কি। তোমার ভাগ্য ভাল এ্যামব্যাসাডার যাইনি। প্যারাডাইস তো অনেক সস্তা।

—সস্তা-দামীর কথা হচ্ছে না। তুমি জান, প্যারাডাইস ক্লাব মরারের।

—থামাও তোমার বক্তৃতা, অনেক জ্ঞান দিয়েছো। দোহাই. দেখ পল, তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি। জেনীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা। সময় নেই অসময় নেই তুমি আজকাল খুব বকবক করতে শুরু করে দাও। আমি

কখনও প্রতিবাদ করিনি। অফিসে তোমার কি হয়। ফিলডিং স্ত্রীলোকটি দেখতে তেমন কিছু নয়, কিন্তু একটি যৌনতায় ভরা মেয়েমানুষ। তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

—বাজে কথা বলো না জেনী। এ কথার মধ্যে ওকে টেনে আনবার কি হল। আমি জানি এসব ফালতু কথা টেনে আসল প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইছো। বলো, কেন তুমি প্যারাডাইস ক্লাবে গিয়েছিলে ?

—যাই না যাই, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার জেরা আমি গ্রাহ্য করি না।

—না, তুমি ওখানে যাবে না। পল আরও ক্ষেপে গেল। ওটা মরারের আস্তানা। তোমার মাথায় এটা আসছে না, তোমাকে দেখে সবাই হাসির খোরাক পাচ্ছে।

—কে হাসলো, কে কাঁদলো, সেটা আমার দেখার প্রয়োজন নেই। তোমার অফিসের লোকদের আমি তোয়াক্কা করি না। আমার যদি প্যারাডাইস ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করে, একশোবার যাবো।

—তুমি যে ওখানে গিয়েছিলে, সেটা ফরেস্টের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি। আমাদেরই পরিচিত কোন বন্ধু ওকে বলেছে। তুমি যদি এমন উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করো, তাহলে আমার চাকরী ক'দিন টিকবে ?

জেনীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

—ওঃ, তোমার ঐ নোংরা পুলিশের দল আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছে। এটা অবশ্য আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। যাক, তোমার ঐ নীল চোখো বোকা মনিবটিকে বলে দিল, সে যেন নিজের কাজে মন দেয়। তুমি-ই হও, আর তোমার ফরেস্টই হোক অথবা অন্য কেউ, আমার কি করা উচিত কি অনুচিত শেখাতে হবে না। যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি জাহান্নামে যেতে পার।

*　　　*　　　*

সিটি হল হল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজলো।

পল ক্ষিপ্তপদে তার অফিসে ঢুকলো।

ভ্যান রোশ আর ম্যাজ আগেই এসেছে। তারা যে যার টেবিলে বসে আছে। ভ্যানের ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট, একটা কাগজে কি লিখছে।

—পল, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়। সে বলল, পাশের ঘরে বসে আছে। তুমি ধারণাই করতে পারবে না কে।

টেবিলের ওপর ব্রীফকেসটা রাখলো পল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো—কারোর সঙ্গে দেখা করবার সময় আমার হাতে নেই। লোকটি কে?

—ফ্লো প্রেসার।

—তামাশা করছো নাকি?

—আরে না না, গিয়ে দেখ না।

—ফ্লো প্রেসার? সকাল ন'টায়? কি চায় ও?

—ওর বয়ফ্রেণ্ড বেপাত্তা হয়ে গেছে। তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে।

—কি জ্বালাতন! বলতে পারলে না, আমি এখন ব্যস্ত আছি? যাও ভান ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে হটিয়ে দাও। আমার অনেক কাজ, ওকে বল, পুলিশকে জানাতে।

—তুমি কি জান, ওর বয়ফ্রেণ্ডটি কে? রোশ প্রশ্ন করলো। তার মুখটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

—না, জানি না। কে?

—টোনি প্যারেটি।

পল কপাল কুঁচলে মনে করবার চেষ্টা করলো।

—কি নাম বললে? টোনি প্যারেটি?

—মরারের সোফার আর বডিগার্ড। এবার নিশ্চয়ই তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।

পল চুপ করে রইলো। কয়েক মিনিট সিগারেট টানার পর বললো—হ্যাঁ বলবো। ওর কাছ থেকে কিছু জানলে? সে উঠে দাঁড়াল।

—পরশু দিন সন্ধ্যার পর টোনির ওর সঙ্গে দেখা করার কথা। বিকেল পাঁচটায় টোনি এসে জানাল, সন্ধ্যার পর সে আসতে পারবো না, হঠাৎ কি কাজ পড়ে গেছে, এগারোটার সময় আসবে। ফ্লো যেন লিমবও স্ট্রীটে স্থামস বার-এ তার জন্য অপেক্ষা করে। সেখানেই দেখা হবে।

টোনির জন্য ফ্লো প্রেসার বারে দুটো পর্যন্ত বসেছিল। কিন্তু টোনি আসেনি। তারপর ফ্লো বাড়ী ফিরে গেছে। গতকাল সকাল থেকে টোনি ঘরে সে বার-বার টেলিফোন করেছে, সাড়া পায়নি। বিকেলে স্বয়ং গিয়ে হাজির হয়েছিল

পেনির বাড়ি। কিন্তু টোনি বাড়ীতে নেই! আশেপাশে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে।

…কিন্তু কেউ টোনিকে দেখেনি। ফ্লো আবার সন্ধ্যেবেলা প্যামস বার-এ গিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা বসে থেকেও টোনির দেখা পায়নি। তাই সে সকালে ঘুম থেকে উঠেই সোজা এখানে চলে এসেছে। টোনি কোন বিপদে পড়েছে, এটাই তার ধারণা।

—আমরা কি করবো?

—ওর বিশ্বাস, আমরা টোনিকে খুঁজে বার করবো।

—টোনি তো স্ব-ইচ্ছায়ও কেটে পড়তে পারে। হয়তো অন্য কোন মেয়েকে সে ভালবেসেছে।

—তা সে ভাবছে না। আর আমারও মনে এই ভাবনা আসছে না। কারণ প্যারেটির মতো একটা ইঁদুর ওকে ছেড়ে যাবে কোথায়? ফ্লোর অনেক টাকা আছে।

—বাদ দাও ওসব কথা, কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। ও কেন আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে? কেন সে পুলিশের কাছে যাবে না?

—পুলিশের কাছে না যাওয়ার কারণটা আমিও জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে বলল, তোমাকে সে বিশ্বাস করে।

এক পাল্লার দরজা। পল একটু ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো।

ফ্লো প্রেসার ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে হাঁটছে। সেন্টের গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে। লাল দুটি ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট। মেয়েটি দেখতে সুন্দর, বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। শরীরের গড়নটি যে কোন লোকের চোখকে আকর্ষণ করে, লাল চুল আর চোখে কামনার লিপ্সা।

—হ্যালো ফ্লো! পল মেয়েটিকে ভাল করেই চেনে। আদালতেও বেশ আসা-যাওয়া আছে। কি ভেবে বল—

—এই যে মিঃ কনরাড। এমন ভাবে হঠাৎ এসে পড়ায় আপনি কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়। আপনাকে বিরক্ত করা আমার উচিত নয় আমি জানি। দুদিন ধরে টোনি নিখোঁজ। আমার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম।

—তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। তবে এসে যখন পড়েছো তখন আর কি করবে? সংক্ষেপে ব্যাপারটা বল। এ-ও তো হতে পারে টোনি তোমায় ছেড়ে চলে গেছে, তাই, না?

চোখ দুটি বড় বড় করে ফ্লো প্রেণার তাকালো পলের দিকে—ওকে আমি জানি ও আমায় ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া আমি হলপ করে বলতে পারি ও অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়েনি।

—তুমি কি করে বুঝলে ?

ফ্লো প্রথমে একটু দ্বিধা করতে লাগলো তারপর বললো, মিঃ কনরাড, আপনি কাউকে জানাবেন না। আমি আপনার কাছে এসেছি, একবার যদি টোনির কাছে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে আমায় আস্ত রাখবে না।

—টোনি তোমাকে ছেড়ে চলে যায়নি, তুমি কি করে জানলে ?

—পাঁচ হাজার ডলার ও আমার কাছে জমা রেখেছে। এত টাকা ফেলে কেটে পড়বার লোক সে নয়।

হ্যাঁ, ফ্লো ঠিকই বলেছে। পল ভাবলো, প্যারেটি সম্বন্ধে তা'ও কিছু কিছু জানা আছে। টাকা ফেলে রেখে চলে যাওয়ার লোক সে নয়।

—তাহলে কি তোমার ধারণা, ও কোন বিপদে পড়েছে ?

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

—তোমার সঙ্গে পরশুদিন রাত্রে দেখা করার কথা ছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ। পাঁচটার সময় এসে বললো, পারবে না দেখা করতে। কাজ পড়ে গেছে।

—কাজ ? কি কাজ ? তুমি কিছু জান ?

ফ্লো মাথা নাড়ল। না, কিছু বলেনি।

—শুধু বলে গেল কাজ আছে ? এইগুলিই কি বলেছিল, ঠিক মনে করে দেখতো ?

—বলেছে, কি একটা কাজে সন্ধ্যেবেলা বেরোতে হবে, কর্তার আদেশ। আমি এগারোটার সময় শ্যামস বার-এ দেখা করবো, অপেক্ষা করো।

পল একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, আমার কাছে কি দরকার।

—যাওয়ার মত আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। জানি, পুলিশের কাছ থেকে কোন উপকার পাবো না। টোনিকে ওরা সবাই অপছন্দ করে। আপনার কাছ থেকে সর্বদা ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তাই—

—টোনি মরারের কাছে কাজ করে, তাই না ?

ফ্লো এদিক-ওদিক তাকালো, সিগারেট ঝাড়বার জন্য অ্যাসট্রে খুঁজতে লাগল।

—আমি জানি না, টোনি কার কাছে কাজ করে। আমাকে কোনদিন সে বলেনি।

—ওসব হালকা কথা বাদ দাও। মরার!

ওর চোখের চাউনিটা একটু শক্ত হয়ে উঠল।

—জানি না তো বললাম। আপনিও পুলিশের মত ব্যবহার করা শুরু করলেন। আপনাকে আমি সর্বদা বন্ধু ভেবে এসেছি।

—আচ্ছা, ফ্লো। দেখি, কি করা যায়। কিন্তু তোমায় সঠিক কথা দিতে পারছি না। তুমি কোথায় থাকবে?

ফ্লোর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

—আপনি আমায় বিমুখ করবেন না, জানি। আমি ভাবছিলাম—

—তোমায় কোথায় খবর দেব?

—২৩সি, ১৪১ স্ট্রীট। আসুন না, সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে। সময় ভাল কাটবে হলফ করে বলতে পারি, সত্যি বলছি। এর জন্যে আপনাকে কিছু খরচ করতে হবে না।

হেসে উঠল পল কনরাড।

—ফ্লো, একজন বিবাহিত ভদ্রলোককে এসব কথা বলা শোভনীয় নয়। দরজার দিকে পা বাড়াল সে। তবু ধন্যবাদ।

—বিবাহিত পুরুষরা ভদ্রলোক হয়, এই প্রথম শুনলাম। মনে করেছেন আমি কিছু জানি না? দরজায় একটুক্ষণ থেমে সে বলল, তাহলে ওর খবর পেলেই জানাবেন?

—নিশ্চয়। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

পল দরজাটা খুলে ধরা মাত্র ফ্লো প্রেসার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

—পাগল করে তুলেছে তো? অফিস ঘরে পা দিতেই ড্যানের গলা শোনা গেল।

—সেরকমই। ম্যাজ, প্যারেটি সম্বন্ধে আমাদের কোন ফাইল আছে কি?

—আছে। ম্যাজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর নির্দিষ্ট ফাইলটা বের করে পলকে দিল।

—ধন্যবাদ।

ফাইলে চোখ রাখলো পল। একটু পরেই বললো—সেরকম কিছু নেই, জান ড্যান! জেল খেটেছে মাত্র দু'বার। তবে ধরা পড়েছে সাতাশ বার।

খুনের অপরাধে দু-বার, বারো বার মারপিট আর ডাকাতি, চারবার নেশা ফিরি করবার অপরাধে। এরপর রয়েছে কুখ্যাত গুণ্ডাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, অন্তের পেছনে লাগা।

…অল্প বয়স থেকেই ছেলে পাকা হয়ে গিয়েছিল। মরারের সঙ্গে কাজ করার আগে দুবার শাস্তি হয়েছে। নিচে একটা নোট আছে, ·৪৫ রিভলবারে গুলি ছুঁড়তে ওস্তাদ, কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কি, কিছু অনুমান করতে পারছো ?

—তুমি কি জানতে চাইছো 'ডেভ এণ্ড' হত্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা ? ভ্যান জানতে চাইল ।

—চিন্তা কর। ফ্লোর সঙ্গে ওর দেখা করবার কথা পরশুদিন সাতটার সময়। হঠাৎ সে আসতে পারল না। কিসের জন্য ? না, কর্তার আদেশ তাকে মানতে হবে। কে সেই কর্তা ? এটা তো জানই। সাতটার সময় আটজন লোক শেষ হলো। এর মধ্যে ছ'জন ·৪৫ রিভলবারের গুলিতে মারা গেছে।

—কিন্তু জুন আরনটের মাথা কেটে নেবে সে, এটা তো আমি ভাবতে পারছি না।

—আমি বলছি না যে প্যারেটি জুনকে হত্যা করেছে। খুব সম্ভব জুন ওখানে মরারকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর জু্‌কে খতম করেছে মরার, বাকি সবাইকে সাবড়েছে প্যারেটি ।

—মরারের নিজের হাতে খুন করার কি দরকার ? তার কি লোকজন কিছু নেই ? তার হয়ে একাজ যে কেউ করতে পারে ।

—আমার স্থির বিশ্বাস, এটা স্বয়ং মরারের কাজ। সম্ভবতঃ মরার জানতে পেরেছিল, জুন তাকে ঠকাচ্ছে। তাতেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্যারেটিকে সঙ্গে করেই সে গিয়েছিল। মরার জানে, এটা ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ পর্যন্ত যতগুলো কাজ করেছে, ঠিকমত চাল দিয়েছে। আমাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

……খুনীর সঙ্গে তার দেখা হয় না। খুনী সরাসরি কাজ পায় না। এক-জনের কাছ থেকে সে কাজের ভার পায়। কিন্তু এ ব্যাপারটা একটু আলাদা। সে নিজের হাতেই বেইমানির উপযুক্ত শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু মরার ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। সবাই তাকে চেনে। তাই সে সাক্ষী রাখতে চায় না। তাই যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই মেরেছে।

…কিন্তু এ ব্যাপারটা অন্যরকম। মরার তার নিজের হাতেই প্রতিশোধ নিতে চায়। জুনের সঙ্গে তার ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। ঠকানোর শাস্তি সে নিজের হাতেই দেবে। ঐ বাড়িতে মরারের আসা-যাওয়া ছিল। তাই সাক্ষী বিলোপ করার জন্য একটার পর একটা শেষ করেছে। তারপর ?

…এতগুলি লোককে মারার পরও একজন সাক্ষী কিন্তু জীবিত থাকছে। সে কে ? প্যারেটি। মরার কাউকে বিশ্বাস করে না। তাকে কেন বিনা কারণে বাঁচিয়ে রাখবে ? প্যারেটি যদিও তার কাছে দীর্ঘ পনেরো বছর চাকরি করছে তবুও কি বিশ্বাস করা যায় ? মরারের মত বিপদপূর্ণ লোক কাঁধে বিপদ ঝুলিয়ে রাখতে পারে না। তাই পৃথিবী থেকে লোপ পেল প্যারেটির অস্তিত্ব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফ্লো জানে। তাই ছুটে এসেছে আমার কাছে। মরারের নাম উচ্চারণ করতে সে পারছে না। কিন্তু মেয়েটা চালাক—সে জানে আমি অবশেষে মরারের খোঁজই করবো।

ভ্যান আর ম্যাক্স খুব মন দিয়ে তার কথা শুনছিল। ভ্যান টেবিলে চাপড় মেরে বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা মরারেরই কীর্তি। ফ্লো কেন এখানে এসেছে সেটাও এবারে বোঝা যাচ্ছে। সেও অনুমান করতে পেরেছে টোনি প্যারেটি মারা গেছে। আমাদের সাহায্য নিয়ে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে হবে।

—সেটাই শক্ত কাজ। প্যারেটি যেখানে থাকতো, সেখানে যাও ভ্যান। ওর ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজ, যেন কোন দামী জিনিস খুঁজছো। খুব সম্ভব কিছু পাবে না, আবার পেতেও পার।

একটা ছোট কাগজে সে প্যারেটির ঠিকানা লিখলো, তারপর সেটা ভ্যানের হাতে তুলে দিয়ে বললো—খুব সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। সঙ্গে একটা রিভলবার নিয়ে যাও। যদি দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে হয়, ইতস্তত: করো না। জুনের সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য আমি প্যাসিফিক স্টুডিওতে যাচ্ছি। একটার সময় অফিসে আসবো।

ভ্যান দেরাজ খুললো। একটা '৩৮ রিভলবার বের করে শূন্যে ছুঁড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে লুফে নিয়ে সেটা ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিল।

—চললাম। ভ্যান রোশ চলে গেল।

কমলা রঙের চুলওলা একটি মেয়েকে অনুসরণ করে পল এগোতে লাগলো। করিডোর দিয়ে তারা হাঁটতে লাগলো। দু'পাশের বন্ধ দরজার ওপরে পরিচালক,

প্রযোজক আর অসংখ্য চিত্রতারকাদের নাম লেখা। হ্যারিসন ফেডোরের মত একজন তৃতীয় শ্রেণীর লোকের কাছে কনরাডকে নিয়ে যেতে তার সম্মানে ঘা লাগছে।

করিডোরের শেষপ্রান্তে একটি দরজার কাছে মেয়েটি থামলো। ওদিকে দৃষ্টি না দিয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাতের ইঙ্গিতে সে বলল—ভেতরে চলে যান।

দরজায় আলতো টোকা মারতেই শোনা গেল ফেডোর কণ্ঠস্বর—আসুন।

বড় টেবিল, ওপাশে বসেছিল হ্যারিসন ফেডোর। ঠোঁটে জ্বলন্ত চুরুট। মুখে কোন চিন্তা বা উদ্বিগ্নতার ছাপ নেই।

—কি ব্যাপার? পল প্রশ্ন করলো।

চুরুটটা দাঁতে কামড়ে ধরে সে হাত কচলাতে লাগলো। তারপর মুখে হাসি টেনে এনে বললো, লেয়ার্ড আমাকে তার পাবলিসিটি ম্যানেজার করে নিয়েছে। মাইনে শুনলে আপনি জ্ঞান হারাবেন মশাই। তবে কিছুটা তেল মাখাতে হয়েছে। তাতে আর কি এমন অসুবিধা বলুন? নতুন অফিসে কাল থেকে যোগ দিচ্ছি। সে অফিস দেখলে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও হিংসেয় জ্বলে যাবেন।

—বাঃ দারুণ, খুব আনন্দিত হলাম।

—তারপর—কি ভেবে?

—মিস আরনটের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করতে এসেছি। এমন কেউ কি তার আছে, খুবই অন্তরঙ্গ, যাকে সে সবকিছু বিশ্বাস করে বলতে পারে? ওর কি কোন সেক্রেটারী বা এমন কেউ যার কাছে তার আসা-যাওয়া ছিল?

—আপনি কি জানতে চাইছেন?

—আমার একজন সাথী দরকার। কাল তদন্ত শুরু হবে। এমন একজন সাথী দরকার, যে প্রমাণ করে দেবে জুন আর জোরডানের সম্পর্ক ছিল প্রেমিক-প্রেমিকার। আপনাকে এ কাজের জন্য বিরক্ত করতে চাই না।

—হ্যাঁ, আমার কাল কাজ আছে। মভিস পাওয়েলের সঙ্গে দেখা করলে খুব ভাল হয়। ও কিছুদিনের জন্য জুনের সেক্রেটারী ছিল। ও কিছু জানলে নিশ্চয়ই বলবে।

—মভিস পাওয়েলের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

—দোতলায়, পুবদিকে ওর একটা অফিস আছে। আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি যাচ্ছেন।

—খুব ভাল। আর একটা কথা। জোরডান সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন ছিল।

ফেডোর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, চুরুটে কয়েকটা টান দিল। নিভে গেছে। আবার দেশলাই জেলে সেটা ধরিয়ে নিল।

—আমার মনে হয়েছিল, কেসটা সরল, আপনারা দেখছি এটাকে নিয়ে খুব পাকাচ্ছেন।

—দেখুন, আমরা সোজা পথেই সারতে চাই। তবে বলতে পারি না, করোনার কি রকমের প্রশ্ন করবে। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার কোন জানাশুনা লোক আছে কি সে জোরডান সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে?

—ওর বেয়ারা আছে, ক্যাম্পবেল। নিচে অন্য একটা অফিসে কাজ নিয়েছে। থাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে।

—ধন্যবাদ। যাওয়ার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে যাব। আপনি কি মিস পাওয়েলকে ফোন করবেন?

—নিশ্চয়। ফেডোর রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর চাইল। খানিক পরে বললো, মভিস? আমি ফেডোর। ডি.এ.-র কাছ থেকে মিঃ পল এসেছেন আমার অফিসে। জুনের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। তুমি যা জান, বলতে দ্বিধা করো না, বুঝেছ?

লাইনের অন্য প্রান্ত থেকে কথা শোনা গেল।

আবার সে বললো—খুব ভাল মেয়ে। উনি তাহলে যাচ্ছেন। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কনরাডের দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বছর বয়স হবে মভিস পাওয়েলের, লম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা, তেমনি সীমায়িত পোশাক। কনরাড ঘরে ঢুকতেই তার ঠোঁটে দেখা দিল একটুকরো নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ হাসি।

—বসুন, মিঃ কনরাড, বলুন আমায় কি করতে হবে।

সামনে টেবিলের ওপর পড়ে আছে এক গোছা চিঠি, খাম খোলা হয়নি, একপাশে জুন আরনটের কয়েকটি চকচকে ছবি।

পল কনরাড চেয়ারে বসল। তারপর সে বলতে শুরু করলো—মিস পাওয়েল আপনি কি জানেন, জুন আরনট আর জোরডানের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ছিল? তদন্তে আমাদের এক সাক্ষীর প্রয়োজন হতে পারে তাই আপনাকে প্রশ্ন করছি।

—আমি বাজী লড়ে বলতে চাই না। তার মুখে এবার ফুটে উঠলো অবজ্ঞার হাসি। জোরডান সম্পর্কে অনেক কথাই মিস জুন আমাকে জানিয়েছে। তবে

সে তো মিথ্যাও বলতে পারে, তাই না ? দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত আমার কোনদিন চোখে পড়েনি।

—বুঝলাম। কিন্তু তার কথা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় ওদের মধ্যে প্রেম ছিল।

—তা মনে হয়।

—আচ্ছা, মিঃ জোরডান ছাড়া তার কোন প্রেমিক ছিল ?

—আপনারা কি চান তার অবশিষ্ট মান-সম্মানটুকু ধুলোয় মিশে যাক ? মিস পাওয়েলের কণ্ঠস্বর শক্ত হয়ে উঠল।

—না, তা আমরা চাই না। কিন্তু এটা আমার জানা প্রয়োজন।

—মনে হয় ছিল। তবে মিস জুনের একটা নিজস্ব নীতি ছিল যা চট করে অন্য কারোর সঙ্গে মিলবে না।

—আপনি আমায় বিশ্বাস করে কি বলবেন ? কেউ জানবে না।

—দেখুন, সত্যি কথা বলছি, এই অপ্রিয় ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে চাই না। এর চেয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। অনেক কাজ আমার বাকি আছে। মাপ করবেন।

—বুঝলাম, আপনার কাছে অপ্রিয় ঠেকছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমি খুনের কিনারা করতে চাইছি, এর বেশী কিছু নয়। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি জোরডান মিস আরনটকে খুন করেনি।

—তাহলে খবরের কাগজে আমি ভুল খবর পড়েছি।

—বহিঃদৃষ্টিতে খুনি মনে হয় রালফ জোরডানকে। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য। এটা কি বলতে পারেন, জুন আরনটের সঙ্গে জ্যাক মরারের প্রেম ছিল ?

মিস পাওয়েল মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হয়ে উঠল। মুখের নরম রেখাগুলি কোথায় হারিয়ে গেল।

—আমি জানি না।

তার গলার শব্দে আলোচনা সমাপ্তির ইংগিত। কনরাড বুঝল, আর জিজ্ঞেস করা মানেই সময় নষ্ট।

—বেশ, না জানলে আর কি করা যাবে ? কিন্তু আবার বলছি, অন্য কোন লোকের জানবার উপায় নেই। আদালতেও আপনার কোন স্বীকারোক্তি করার দরকার নেই।

—মিঃ কনরাড, আমি তো বলছি, কিছু জানি না।

—আচ্ছা, মিস পাওয়েল, ফ্রানসেস কোলম্যানকে চেনেন ?

মভিসের চোখে বিস্ময় জেগে উঠল।

—চিনি। জুন আরনটের একটা ছবিতে ছোট একটা পার্ট করেছিল।

—খুনের দিন সে জুন আরনটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল বলতে পারেন ?

—আমি জানি-ই না যে সে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। এই জানলাম।

—ভিজিটরস্ বইতে ওর নাম পাওয়া যায়।

—ওর কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বলে আমার জানা নেই। হঠাৎ হয়তো গিয়ে পড়েছিল।

—ওর সঙ্গে কি জুন আরনট দেখা করতো ?

—সেটা তার মর্জির ওপর নির্ভর করতো। আজে-বাজে লোককে সে একদম কাছে ঘেঁষতে দিতো না।

—কিন্তু জোরডান তো যেতো।

—তা যেতো।

—জ্যাক মরারও তো যেতো, তাই না ?

—আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি, ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

—না জানলেও শুনেছেন নিশ্চয়।

—কে না শুনেছে বলুন ? এবার মিস পাওয়েল চিঠিগুলির দিকে হাত বাড়াল।

—আর একটা কথা। মিস কোলম্যান তার ঐ ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বলতে পারেন, কোথায় গেলে তার হদিস মিলতে পারে ?

—সেন্ট্রাল কাষ্টিং এজেন্সীতে খোঁজ না করলে ওখানে দেখতে পারেন। তাছাড়া ইউনিয়ন অফিসে।

—বেশ, ওখানেই খোঁজ করে দেখি। আপনার কাছে ওর কোন ফোটো পাওয়া যাবে ?

—দাঁড়ান, দেখছি।

মিস পাওয়েল দেরাজ খুলে ফেলল। একটা খাম বের করে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর মিস কোলম্যানের ছবিটা তুলে দিল।

—এই নিন।

কনরাড ওর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখতে লাগল। মেয়েটির বড় বড় দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে, তেইশ বছর হবে। ছবিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা উত্তেজনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার অন্তরে, পিঠ বেয়ে নেমে গেল হিমশীতল স্রোত।

—বাঃ, ভারী সুন্দর মুখ। হাজারবার দেখলেও আশা মেটে না। কখনও ভোলা যায় না, স্বপ্নেও দেখা যায় সে মুখ। মাথার মাঝখানে সিঁথি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে গেছে চুলের গোছা।

—দেখতে ভাল, মভিস বললো, বারবার দেখলেও পুরোনো হবে না।

মভিসের গলার আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেল পল কনরাড।—হ্যাঁ, ঠিক তাই, অসাধারণ দেখতে।

—কিন্তু এক পয়সাও অভিনয় করবার ক্ষমতা নেই। তবে সময় নষ্ট না করে অন্য কিছু চেষ্টা করলে পারতো।

—ছবিটা কি আমি নিতে পারি?

—বেশ, রাখুন।

—এখন চলি, অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার।

—না না, এমন কিছু নয়।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল পল কনরাড। করিডোরে আসতেই ছবিটা পকেট থেকে বার করল। চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে ওর মুখটা। এ আবার কি? এমন এক অচেনা মেয়ের প্রতি তার এমন গভীর আকর্ষণের কারণটা কি? পল কিছুতেই ভেবে পেলো না।

ছবিটা আবার পকেটে রেখে দিল সে।

* * *

একটা দোকানের বিপরীতে গাড়ী দাঁড় করালো সে। তারপর গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। একটা বেজে পাঁচ মিনিট। দোকানে ঢুকে সে সোজা টেলিফোনের জায়গায় গেল।

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এলো ম্যাক্সের কণ্ঠস্বর।

—ওখানে ভ্যান আছে? কনরাড জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, এক সেকেণ্ড হল এসেছে। ঐ তো আসছে। ওকে টেলিফোন দিচ্ছি।

—হ্যালো, আমি ভ্যান।

—হদিস পেলে কিছু ?

—হ্যাঁ, কিছু পেয়েছি। ভ্যানের গলায় উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। প্যারেটির ঘরে ময়লা কাগজের ঝুড়িতে একটা খাম পেয়েছি। খামের পেছনে রয়েছে জোরডানের ফ্ল্যাটের একটা নক্সা, পেনসিল দিয়ে আঁকা। এ বিষয়ে তোমার অনুমান কি ?

—জোরডানের ফ্ল্যাট। তুমি নিঃসন্দেহে বলছো তো ?

—হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। ভাল করে মিলিয়ে দেখেছি।

—আর কিছু ?

—বাথরুমের দেওয়ালে ঝুলছে ক্ষুর ধার দেবার চামড়া, কিন্তু ক্ষুর নিখোঁজ। খুব সম্ভব প্যারেটির ক্ষুরটাই জোরডানের ঘরে পাওয়া গেছে। ভাল করে খোঁজ নিতে হবে। আর পেলাম ষোল'শ ডলার, বিছানার নীচে ছিল।

—বাঃ, দারুণ কাজ করেছো ভ্যান। তার মানে, আমার অনুমান ঠিক, মরার প্যারেটিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। অত টাকা ফেলে কেটে পড়বার লোক প্যারেটি নয়। তাছাড়া, ফ্লোর কাছেও ওর মোটা অঙ্কের টাকা জমা আছে।

—আমারও একই ধারণা। তোমার খবর কি ?

—ক্যাম্পবেল জোরডানের কাজ করতো। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, জুন আর মরারের মধ্যে মেলামেশা ছিল যথেষ্ট। জুন আর জোরডানের সম্পর্কটার কথা যদি মরার জানতে পেরে যায়, তাই সে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকত। মাতাল অবস্থায় জোরডান এই ভয়ের কথা ক্যাম্পবেলকে কয়েকবার বলেছে। এখন আমি ছাড়ছি। আর ফ্লো প্রেসারকে অফিসে নিয়ে যাচ্ছি। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে।

—প্যারেটি যে মরারের কাছে কাজ করতো সেটা ফ্লো জানে। তাই ওকে দিয়ে এক স্বীকারোক্তি আদায় করতে হবে। যদি ভাল কথায় রাজী না হয়, ঘা কতক লাগাতে হবে। তাছাড়া আমার মনে হয়, পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ম্যাকক্যানকেও নিতে হবে। খোঁজ নাও, কখন ডি. এ. সবাইকে একসঙ্গে ডাকছেন। তারপর ম্যাকক্যানকে খবর দাও। টেলিফোনে ওকে কিছু জানিও না। সাবধান, কোন খবর যেন প্রকাশ না হয়। মরারকে অবাক করে দিতে হবে। বুঝেছ ?

—চিন্তা নেই কোন।

—আড়াইটা নাগাদ দেখা হবে।

টেলিফোন নামিয়ে রাখল কনরাড। কাছেই একটা লাঞ্চ বারে ঢুকলো। কোনরকমে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ আর এক পেয়ালা চা গলাধঃরণ করে দৌড়ল তার গাড়ি লক্ষ্য করে।

১৪৪নং রাস্তায় এসে পৌঁছতে কনরাডের কয়েক মিনিট সময় লাগলো। একটা বাড়ির একেবারে ওপর তলায় ২৩ সি। গাড়ি রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকল, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল সে।

পাঁচতলায় উঠে সে থমকে দাঁড়াল। এক ঘরের দরজায় লেখা—মিস ফ্লোরেন্স প্রেসার।

—না, খবরদার, আমার কাছে আসবে না।

বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ভেসে এলো কথাগুলো। ফ্লোর গলার শব্দটা পল চিনতে পারল।

তারপর একটা বীভৎস ভয়ঙ্কর চীৎকার হঠাৎ গলার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো।

পল দরজায় জোরে ধাক্কা মারলো। দরজা খুলে গেল। গেরিলার মত দেখতে একটা জোয়ান লোক বেরিয়ে আসছিল।

দরজার কাছে কনরাডকে লক্ষ্য করে সে চট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

এক লাফ মেরে কনরাড তাকে আক্রমণ করলো। লোকটি পড়বার আগেই কনরাড তাকে জড়িয়ে ধরলো।

লোকটা কোনরকমে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে। হাত তুলে পিস্তল দিয়ে কনরাডের মুখ লক্ষ্য করে গুলি করল। পল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিয়ে কাঁধটা উঁচু করলো। গুলিটা এসে লাগল কাঁধে। কাঁধের সমস্ত শক্তি যেন লোপ পেল।

বাঁ হাতে ওর কব্জি ধরে, ডান হাতে ওর মুখ লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারলে কনরাড। ঘুষিটা গিয়ে পড়লো ওর ঠোঁট আর নাকে। লোকটা মুহূর্তের জন্য আঁৎকে উঠলো। লোকটার হাত থেকে যাতে পিস্তলটা পড়ে যায় তাই সে ওর পিস্তলশুদ্ধ হাতটা দারুন জোরে মারল দেওয়ালে।

লোকটা তার হাত থেকে ফসকে গিয়ে কনরাডের বুকে এক লাথি মারল। সে বিদ্যুৎগতিতে দাঁড়িয়ে পিস্তল তোলার উপক্রম করতেই কনরাড ওর পা ধরে জোরে টান দিল। লোকটা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পিস্তল থেকে গুলি ছিটকে লাগল দেওয়ালে। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়লো মাটিতে।

কনরাড ওঠবার আগেই লোকটা দাঁড়াল, গুলি ছুঁড়লো। কিন্তু নিশানা সঠিক না হওয়ায় গুলিটা তার গালের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। তাপ লাগল তার গালে। চোখের নিমেষে কনরাড উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতে ওর চিবুকে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারল।

লোকটার মাথা বন্‌বন্‌ করে ঘুরে গেল। তার হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়লো। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আবার সমান বেগে ওর মুখ লক্ষ্য করে বাঁ হাতে ঘুঁষি মারলো। চৌকাঠ পেরিয়ে লোকটা বাইরে বারান্দায় রেলিংয়ের উপর গিয়ে পড়ল। তারপর রেলিং ভেঙে সশব্দে একতলায় এসে পড়লো।

ভয়াবহ শব্দে সারা বাড়ি একবার কেঁপে উঠলো। কনরাড এগিয়ে এসে নীচের দিকে তাকালো। জোয়ান লোকটা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকবার সময়ে তার কানে ভেসে এল পুলিশ ভ্যানের সাইরেন।

বাইরের ঘরটি বসবার, বেশ সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। ফ্রোর মৃতদেহ পড়ে আছে ডিভানের পাশে। বরফ ভাঙ্গার গাঁইতি দিয়ে তাকে মারা হয়েছে। অস্ত্রের সুঁচালো প্রান্ত প্রায় অর্ধেকটা তার ঘাড়ের নীচে ঢুকানো। পাকা হাতের সুনিপুণ কাজ।

পল গালে হাত ঘষতে ঘষতে পকেটে সিগারেটের খোঁজ করতে লাগলো।

॥ তিন ॥

ক্যাপ্টেন হারলাম ম্যাকক্যান দেখতে ঠিক ষাঁড়ের মত, ইয়া চেহারা। বনেটের মত মাথায় ছোট করে চুল ছাঁটা। লাল মুখো, চোখ দুটি সর্বদা এদিক-ওদিক ঘুরছে। তাকে প্রায় বেশীর ভাগ লোকেই ভয় পায়।

সে পরেছে সাদা পোষাক, লিংকন গাড়ীতে বসেছে। বড় বড় লোমওলা হাতে স্টীয়ারিং হুইল চেপে ধরেছে, মনে হয় যেন এক্ষুণি কার গলা টিপে মেরে ফেলবে। গাড়ি এসে হাজির হলো প্যাসেফিক বুলেভার্ডে। তারপর এ্যামবাসা-ডারস্ ক্লাবকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। সমুদ্রের ধারে এদিক-ওদিকে চোখে পড়ে সৌখীন বার, হোটেল আর নাইট ক্লাব।

গাড়ী দাঁড় করালো প্যারাডাইস ক্লাবের সামনে। পনেরো ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে চারদিক ঢাকা। একটু এগিয়ে গেলেই সমুদ্র দেখা যায়, চাঁদের আলোয় জল চিক্ চিক্ করছে। লোহার গেট হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে। সে আলোটা চারবার জ্বালল আর নেভালো।

গেট খুলে যেতেই গাড়ী ভেতরে প্রবেশ করালো সে। গার্ডরুম থেকে একজন গার্ড বেরিয়ে এলো, গাড়ীর জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো। তারপর নিতান্তই অনিচ্ছাসত্বে কপালে একবার হাতটা ছোঁয়ালো। ক্যাপ্টেন ম্যাকক্যানকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলো।

ম্যাকক্যান গাড়ী চালিয়ে দিল। বিশাল বাড়ি। একপাশে গাড়ী থামিয়ে সে নেমে পড়লো। বড় দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালো, দু'বার জোরে আর দু'বার আস্তে টোকা মারার অপেক্ষাতেই ছিল। দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল।

আবছা অন্ধকার। কে একজন ওখান থেকে বললো—গুড ইভনিং স্যার।

ম্যাকক্যান সাড়া না দিয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে লাগল। পেছনে দরজা বন্ধ হবার মৃদু শব্দ তার কানে এসে পৌছলো।

লম্বা করিডোর। শেষ প্রান্তে একটি বন্ধ দরজার কাছে সে হাজির হল। আবার দু'বার জোরে, দু'বার আস্তে টোকা মারল।

মরারের বডিগার্ড প্যারাডাইস ক্লাবের ম্যানেজার লুই সাইগেল দরজা খুলে দিল।

দীর্ঘ চেহারা সাইগেলের, দেখতে অতি চমৎকার। ঐ চেহারার জন্য সে বিখ্যাত। দশ বছর আগে পুলিশ আর গুণ্ডার দলে ওকে 'সুন্দর লুই' বলে ডাকতো। সে অনেক দিনের কথা, বেশীর ভাগ লোক এখন সে নাম ভুলে গেছে। সাইগেলের বয়স কত হবে—উনত্রিশ কি ত্রিশ। ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসিটা তাকে অনেক কায়দা করে বাগে আনতে হয়েছে। দুপাটি দাঁত ঝক্‌-ঝক্ করছে। মেয়েদের ওপর তার বেশী নজর। যত কিছু আনন্দ আর উৎসাহ তাদের নিয়ে।

—আসুন, ক্যাপ্টেন সাহেব। লুই তার ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল। মালিক এক্ষুণি আসবেন। পান করবেন কিছু।

ম্যাকক্যান বাঁকা চোখে একবার ওকে লক্ষ্য করলো।

—মনে হয় স্কচই ভাল হবে।

এই সুদর্শন, সুন্দর-মুখ গুণ্ডাটিকে তার একেবারে অসহ্য। ঘরের চারদিকে বিলাস আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। বড় ঘরের এক প্রান্তে বার। সাইগেল সেদিকে এগিয়ে গেল। স্কচের সঙ্গে সে সোডা মেশাল।

—আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে কর্তা একটু অবাক হয়েছেন। তাঁর আজ থিয়েটার দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু গেলেন না। আশা করি, খবর সব ভাল। সে এগিয়ে এসে গ্লাসটা ম্যাকক্যানের হাতে দিল।

—ভাল? ভাল বলতে কি বোঝায়? ম্যাকক্যান তার হেঁড়ে গলায় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমাদের উপর, যদি ঠিকমত চালাতে পারে, তাহলে ভাল। নয়তো সব ভেস্তে যাবে। খুব খারাপ, খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার।

সাইগেল ভুরু কুঁচকে ম্যাকক্যানকে লক্ষ্য করে। এই ষাঁড়ের মত দেখতে লোকটাকে সে পছন্দ করে না। ম্যাকক্যানও তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

—তাহলে দেখছি ব্যাপারটা ঠিক রাখতেই হবে, তাই না? সে আবার বারে ফিরে গেল, নিজের জন্য বোতল থেকে মদ ঢালল, সোডা মেশাল। নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বললো, ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদের ব্যাপার ঠিকই থাকে।

—থাকে, তাই না? সময়ে সময়ে মানুষ পা পিছলোয়, জান তো। ম্যাকক্যান বিরক্ত হল, তাকে কিনা লুই সাইগেল অগ্রাহ্য করছে।

বারের পাশে দরজা, কপাট খুলে ঘরে ঢুকলো জ্যাক মরার। তাকে অনুসরণ করে আসছে এ্যাটর্নী এ্যাবী গলোউইজ।

মরারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। বেশ চওড়া কিন্তু খুব লম্বা নয়। গত তিন-চার বছরে শরীরে কিছু মেদ জমেছে। মাথায় ঘন চুলে পাক ধরেছে। এক নজরেই দেখলে বোঝা যায়, সে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবসায়ী, সাধারণ ধনী লোক।

কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে ধরা পড়ে যায়। তার চোখের হিংস্রতা, পলকহীন চোখের দুটি তারা সর্বদা পাথরের মত জলজল করছে।

প্যাসিফিক সিটির একজন নামকরা এ্যাটর্নী হলো গলোউইজ। অনেকটা দেখতে মরারের মতই, তবে তার চেয়ে অনেক মোটা। বয়স্ক, মাথায় টাক পড়েছে। লোভনীয় পসার ছেড়ে মরারের ব্যবসা আর আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশুনা করে। এক কথায় বলা যায়, তাকে ছাড়া মরারের এক মুহূর্ত চলে না। তার প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার দিক থেকে এখন গলোউইজ দ্বিতীয় ব্যক্তি।

—ক্যাপ্টেন, আপনাকে দেখে খুব আনন্দিত হলাম। মরার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। কোন অসুবিধা হয়নি তো? একটা চুরুট?

—ভালই হতো। বলল ম্যাকক্যান। না বলতে সে কখনই পারে না।

চুরুটের বাক্স সাইগেল হাতের কাছে এগিয়ে দিল। ম্যাকক্যান একটা মোটা চুরুট তুলে নিল, নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রান নিল। চুরুটের একদিক দাঁতে কামড়ে ফেলে দিল। সাইগেল লাইটার জ্বালিয়ে তার চুরুট ধরিয়ে দিল।

চুরুটে লম্বা টান দিয়ে সে বলল—বাঃ, ভারী চমৎকার চুরুট, মিঃ মরার।

—হ্যাঁ, অর্ডার দিয়ে করানো। লুই, ক্যাপ্টেন সাহেবের বাড়ি এক হাজার সিগার পাঠিয়ে দেো!

—না না, এরকমভাবে উপহার আমি নিতে পারি না। ম্যাকক্যানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। তবু ধন্যবাদ।

—আপনাকে আমি জোরাজুরি করবো না। মন যদি না চায় রাখতে, তবে যাকে ইচ্ছে দিয়ে দেবেন।

এইসব কথাবার্তা গলোউইজের ভাল লাগছিল না। সে বিরক্ত হয়ে স্কচের বোতলটা তুলে গেলাস মদ ঢালল, সোডা মেশাল।

আরাম কেদারায় সবাই গা এলিয়ে দিল।

—গোলমাল কিসের? গলোউইজ আচমকা প্রশ্ন করলো।

ম্যাকক্যান তাকে লক্ষ্য করলো। এই লোকটাকেও সে একদম অপছন্দ করে। গলোউইজ বিপজ্জনক লোক, আইনের মারপ্যাঁচে ওস্তাদ।

—বলছি, শুনুন ভাল করে। তাহলে বুঝতে পারবেন অবস্থা কত গুরুতর। তিনদিন আগে জুন আরনট আর বাড়ির ছ'জন লোক খুন হয়েছে। জুন আরনটের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। রালফ জোরডানের প্রথম অক্ষর নামাঙ্কিত একটি রিভলবার বাগানে পাওয়া গেছে।

···হত্যার তদন্ত করতে বার্ভিন আর কনরাড জোরডানের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। জোরডান গলা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, তার হাতে একটা ক্ষুর। আর যে ছুরিটা দিয়ে জুন আরনটের পেট চিরে দেওয়া হয়েছে, সেটাও পাওয়া গেছে।

—এত গুছিয়ে গুছিয়ে বলবার কোন মানে হয় না। গলোউইজ বিরক্ত হয়ে বলল, ঐ একই খবর আমরা কাগজে পড়েছি। এর জন্য আমরা কি করতে পারি? আমাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ রয়েছে? জোরডান জুনকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। ব্যস, ঝামেলা চুকে গেল, নয় কি?

—কিন্তু ওপর ওপর সেইরকম মনে হচ্ছে। ম্যাকক্যানের দাঁতও দেখা গেল, কিন্তু ঠিক হাসি নয়। বার্ভিন খুশী, কিন্তু কনরাড সন্তুষ্ট নয়। সে লক্ষ্য করলো মরারকে, মরার নিজের মনে চুরুট টানছিল, ভাবলেশহীন মুখ তার।

—কনরাড কি ভাবছে না ভাবছে তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নেই। নাকি আছে? প্রশ্ন করলো গলোউইজ।

—খেয়াল রাখতে হবে, কনরাড খুব চালাক, প্যাঁচালো লোক। ও আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে মিঃ মরার।

মরার তাচ্ছিল্য ভরে হেসে উঠলো। হ্যাঁ, জানি কনরাড খুব সেয়ানা। কিন্তু আমাদের দুজনের থাকবার মত জায়গা এ শহরে আছে।

—জায়গা না-ও থাকতে পারে। তাঁর ধারণা, জোরডান খুন হয়েছে।

মরারের মুখে আবার হাসির ঝিলিক খেলে গেল। আর সে মনে করেছে, এই খুন আমিই করেছি। ও ভাবে রাস্তায় বেড়াল চাপা পড়লেও আমার কাজ। আমার কি কিছু করার আছে? বেড়াল যখন চাপা পড়বার তখন পড়বেই।

ম্যাকক্যান চুরুট টানছে। তার চোখ বৃত্তাকারে গলোউইজ থেকে মরার এবং লুই সাইগেলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এলো।

—এর মধ্যেও তফাত আছে। সে বললো। সে জানতে পেরেছে আপনার সঙ্গে জুন আরনটের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তার বিশ্বাস, মিস আরনট আর জোরডানের মধ্যে গোপন প্রণয় বাসা বেঁধেছিল। আপনি প্যারেটিকে সঙ্গে জুন আরনটের বাড়ী গিয়েছিলেন। জুনকে খুন করেছেন আপনি, আর তার

লোকজনকে মেরেছে প্যারেটি। তারপর জোরডানের ফ্ল্যাটে গিয়ে তার গলা কাটে সে এবং ওর হাতে রক্তমাখা ক্ষুর ধরিয়ে দেয়। গ্যারেজ থেকে জোরডানের গাড়ি বার করে ইচ্ছে করে দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।

...এমনভাবে কাজটা করা, যেন জোরডানই কাজটা করেছে। প্রমাণ করতে চায় সে খুব ভয় পেয়েছে। তারপর প্যারেটি কাজ সেরে ফিরে আসার অপেক্ষায় আপনি ছিলেন। যেন সে কোথাও কোন কথা ফাঁস না করতে পারে তাই তাকেও সাবাড় করে দিয়েছেন।

মরার অট্টহাসি হেসে উঠলো, হাঁটুতে থাপ্পড় মারল।

—এ্যাবি, কি বুঝছো? এমন গল্প কস্মিন্‌কালে শুনেছ?

এ্যাবি গলোউইজের মুখে কৌতুকের হাসি।

—ওর কেসটা কি? সে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—এ্যাবি, ছেলেমানুষের মত কথা বলো না। বলল মরার, ওর কোন কেস নেই। সেটা ওর অজানা নয়।

গলোউইজ ওর কথা শুনেও শুনলো না। আবার একই প্রশ্ন করল—ওর কেসটা কি?

ম্যাককান উত্তর দিল—ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, জুন আরনটের সঙ্গে মরারের গভীর হৃদ্যতা ছিল। জোরডান মরারকে সম্পূর্ণভাবে ভয় করত। কনরাড একটা স্বীকারোক্তিও পেয়েছে।

—স্বীকারোক্তি? কার?

—ক্যাম্পবেল, জোরডানের কাছে সে কাজ করতো।

—তাতে হয়েছে কি? মরার এবার প্রশ্ন করলো—এ ছাড়া আর কিছু খবর আছে?

—ঐ একটাই স্বীকারোক্তি।

গলোউইজ বলল—বাদ দাও। ও কিছু নয়।

—ফ্লো প্রেসার আজ কনরাডের কাছে গিয়েছিল। বলতে থাকে ম্যাককান। সে জানিয়েছে, প্যারেটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে বলেছে, মিঃ মরার কোন বিশেষ কাজে প্যারেটিকে পাঠিয়েছিল ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় অর্থাৎ যে সময়ে জুন আরনট খুন হয়েছিল।

—দেহ বিক্রী করে যারা পয়সা রোজগার করে, তাদের আবার কথার দাম আছে নাকি? গলোউইজ উত্তর দিল।

—দু'ঘণ্টা আগে ফ্রো'কে খতম করা হয়েছে।

—কে খুন করল?

—ব্রুকলিনের গুণ্ডা টেভ্ প্যাসকেল। মরার কাঁধ ঝাঁকাল।

—চিনি না তো। এত হৈ-চৈ করার কি আছে? একটা বেশ্যার মৃত্যুতে কি আমাদের করণীয় কিছু আছে?

ম্যাকক্যান ওদের কথাবার্তা শুনে ক্রমশঃ রেগে যাচ্ছে। ডি.এ.-র অফিসে কনরাডের রিপোর্ট সে শুনেছে। আর এখানে বসে বসে কেবল মরারের উদাসীনতা আর অগ্রাহ্য দেখছে। এসব অসহ্য। রাগে তার রক্ত গরম হয়ে উঠলো।

—প্যারেটি কোথায়, মিঃ মরার?

—নিউইয়র্কে। ওখানে কিছু টাকা পাওনা আছে, আনতে পাঠিয়েছি। সাতটার প্লেন সে ধরেছে।

—বেশ। ওকে যত শীগ্গির পারেন আনবার ব্যবস্থা করুন। ম্যাকক্যানের কণ্ঠস্বর কঠিন। কনরাড ওকে দেখতে চায়। জোরডানের ফ্ল্যাটের একটা নক্সা ওর ঘরে পাওয়া গেছে।

আচম্বিতে গলোউইজের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য মরারকে একবার লক্ষ্য করলো।

—এ কথা অবিশ্বাস্য। কে পেয়েছে? সে বলল।

—ভ্যান রোশ?

কোন প্রমাণ আছে?

—না।

—এ যে বানানো ব্যাপার, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মরার ধীরে ধীরে বললো। এ্যাবি পারবে এর ব্যবস্থা করতে। কি পারবে না?

গলোউইজ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠলো দুশ্চিন্তা।

—যদি আজ অথবা কাল টোনি ফিরে আসে, ম্যাকক্যান বলতে থাকে, তাহলে কনরাডের কেসের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপনি বরং ওকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।

—যদি সে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ে, যদি আর ফিরে না আসে, তাহলে

আমার কি করার আছে? কুড়ি হাজার……কম তো নয়! লোভ না-ও সামলাতে পারে। মনে করুন, যদি তাই হয়।

ক্ষণেকের মধ্যে ম্যাকক্যানের মুখটা রাঙা হয়ে গেল। লোমশ, মোটা হাতে মুঠো পাকাল।

—না, কেটে পড়লে হবে না। ওকে আসতে হবে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ম্যাকক্যান।

—ক্যাপ্টেন, অত মাথা ঘামাবার কিছু নেই। মরায়ের মুখে হাসি, সম্ভবতঃ পালাবার সাহস টোনির হবে না। আর যদি না আসে, তাহলে মনে করছেন, কনরাডের বানানো বক্তব্য আদালতে টিকবে? কেন শুধু শুধু ভাবছেন? আমি একটুও ভাবছি না।

—আর কিছু নয় তো? গলোউইজ জানতে চাইল।

—যারা মিস আরনটের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তাদের গেলে গার্ডের কাছে খাতায় নাম লেখাতে হয়। ঐদিন সাতটার সময় ফ্রানসেস কোলম্যান নামে একটি মেয়ে দেখা করতে গিয়েছিল। গেটের খাতায় তার নাম পাওয়া যায়। …আমরা ওর সন্ধান করছি। দেখা পেলেই ধরে নিয়ে জেলে পুরে রাখবো সাক্ষী দেবার জন্য। কনরাডের ধারণা, খুনীকে সে দেখে থাকতে পারে।

মরায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট, একভাবে সেদিকে সে তাকিয়ে রইল মুখের একটা ছোট্ট পেশী একনাগাড়ে কাঁপতে লাগল। তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন তার মুখে দেখা যায় না।

ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে একটা চাপা উত্তেজনা, সবাই নির্বাক।

সাইগেল অনুভব করলো, হঠাৎ তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে, একটা সিগারেট ধরাল।

গলোউইজ কুঞ্চিত কপালে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের গালিচার দিকে।

ম্যাকক্যান তার কঠোর, চঞ্চল চোখ দুটি মেলে দিল প্রত্যেকটি নীরব দেহের উপর। ধীরে ধীরে তার মনে একটা দুরন্ত রাগের আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হচ্ছে। নিজেকে সংযত করতে পারছে না, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

—কি হল, কারোর মুখে কথা নেই কেন? সে হিংস্র পশুর মত গর্জন করে উঠল। তাহলে গলোউইজ সব ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

মরার তার দিকে তাকাল। সাপের চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি যেন জলজল করে নিমেষে।

—আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

গলোউইজ চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল। সাইগেলও তার পিছু পিছু চলে গেল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

পায়ের ওপর পা তুলে মরার ঠিক হয়ে বসলো। হাত বাড়িয়ে কাঁচের ছাইদানিতে চুরুটের ছাই ঝাড়ল। ম্যাকক্যানের দিকে তাকাল না।

ম্যাকক্যান চুপ করে বসে আছে। তখনও তার হাত মুঠো পাকানো, মুখের থেকে লালের আভা তখনও কাটেনি, ঘামে তেল চিটচিটে হয়ে উঠেছে।

—কি নাম বললেন, ফ্রানসেস কোলম্যান? মরার হঠাৎ জানতে চাইল।

—হ্যাঁ।

—মেয়েটা কে?

—দেখুন, আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই—

—মেয়েটা কে? তাকে থামিয়ে আবার একইভাবে মরার প্রশ্ন করল।

—একজন বেকার অভিনেত্রী। দু'একটা ছোটখাটো পার্ট করেছে। গ্রেমভেন এ্যাভিনুর একটি ফ্ল্যাটে থাকতো। খুনের দিন রাত্রে সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

—মিস আরনট কি তাকে চিনতো?

—মিস আরনটের শেষ ছবিতে সে একটা ছোট ভূমিকা নিয়েছিল।

—তার খোঁজ করছেন?

—হ্যাঁ, সম্ভবতঃ কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে।

—ওর কোন ছবি দেখাতে পারবেন? আছে?

ম্যাকক্যান তার ভিতরের পকেটের হাত ঢুকিয়ে দিল। একটা ছবি বের করে মরারের হাতে দিল।

ছবিটা দেখে মরার চেয়ারের হাতলের উপর উল্টে রাখলো।

—ক্যাপ্টেন, আর একটা স্কচ লাগবে? মরার হেসে উঠলো।

—না। ধন্যবাদ।

ম্যাকক্যানকে মরারের হাসিও বশীভূত করতে পারলে না। ঘরের আবহাওয়াটা হয়ে উঠেছে গরম, তিক্ত।

মরার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর দরজা খুলে অন্য ঘরে চলে গেল। ওটা সাইগেলের অফিস, ম্যাকক্যান জানে।

ম্যাকক্যান একভাবে চুপ করে বসে আছে। চুরুটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে। সে অনুভব করতে পারল, মুখ তার শুকিয়ে গেছে। বুকের হৃৎস্পন্দন ক্রমশঃ বাড়ছে।

একটু পরেই একটা লম্বা সাদা খাম নিয়ে মরার বেরিয়ে এল।

—এটা আপনার জন্য ক্যাপ্টেন। আপনার নামে কিছু পাঠিয়েছিলাম। উপকারীর উপকারের মর্যাদা দিতে আমি জানি।

খামটা নিল ম্যাকক্যান।

—পনেরো হাজার আছে। মরার খুব নীচু স্বরে বললো।

ম্যাকক্যানের নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে।

—দেখি, আপনার জন্য কি করা যায়। তার গলার স্বর অস্পষ্ট।

—যায় বৈকি। আগে আমার জানা প্রয়োজন মিস কোলম্যানকে কোথায় পাওয়া যাবে। কি খবরটা পাব ?

ম্যাকক্যানের কানের পাশ দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল।

—আমার বিশ্বাস, সে কিছু দেখেনি। হেঁড়ে গলায় সে বলল। তাছাড়া, মিস আরনট ওর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। গেটে নাম লিখেই ফিরে আসতে হয়েছে।

—সে সব আমি বুঝবো। আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন ?

—মনে হয় পারবো। আমার লোকজনদের বলে দিয়েছি, তারা যেন আমাকেই আগে খবর দেয়। আমার অর্ডার না পেলে কেউ কিছু করতে পারবে না।

—ফ্রানসেস কোলম্যানকে আমি আগে দেখতে চাই। ওর ঠিকানা পেলেই দেরী না করে আমাকে টেলিফোন করবেন, লুই অপেক্ষা করবে।

—আমাকে খুবই সাবধান হতে হবে, মিঃ মরার, ডি. এ. ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। আধ ঘণ্টার বেশী সময় আমি আপনাকে দিতে পারবো না। হাতে খুব অল্প সময় পাওয়া যাবে।

মরার হেসে মৃদু চাপড় মারলো ম্যাকক্যানের কাঁধে।

—আধ ঘণ্টাতেই কাজ হবে।

—কিন্তু কনরাডের বিশ্বাস—আপনি ?

মরার তার হাত ধরে ধীরে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

—আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন ক্যাপ্টেন। কনরাড আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মরার এক হাতে দরজাটা খুলে ফেললো।

—আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আপনার টেলিফোনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবো। গুড বাই।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লে ক্যাপ্টেন একটা সরু রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল সে। তার রাগ আর সে সংযত করতে পারলো না। নিজের মনেই অত্যন্ত খারাপ ভাষায় গালাগালি করতে লাগল।

গলোউইজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মরার আবার তার চেয়ারে এসে বসেছে, গলোউইজ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দু'জনেই নীরব।

দীর্ঘ সময় কেটে গেল অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে। মরার একমনে চুরুট টানছে, যেন তার মনে এসে ভীড় করেছে চিন্তা।

গলোউইজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পেছনে হাত রেখে আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়াচ্ছিল।

—ভেবে দেখলাম, কাজটা ঠিক করা হয়নি। মরার নীরবতা ভঙ্গ করলো? প্যারেটিকে সঙ্গে নেওয়া ভুল হয়েছে। মনে করেছিলাম, আমাদের দলের ওই সবচেয়ে চালাক। চিন্তা করে দেখো একবার, উল্লুকের মত ওর ঘরে নক্সাটা কেউ ফেলে রাখে।

মুহূর্তের জন্য গলোউইজ চোখ দুটো বন্ধ করলো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে জোরে নিঃশ্বাস নিল।

—জুন আরনটকে তুমিই হত্যা করেছো নিজের হাতে?

মরার তাকাল গলোউইজের দিকে, মোটা ভুরু লাফিয়ে উঠলো কপালে।

—যা আনন্দ এতে পেয়েছি, তুমি তা বুঝবে না এ্যাবি। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, জোরডানের সঙ্গে যেন মেলামেশা না করে, ওর কাছে যেন না ঘেঁষে। আমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমার চোখকে ধুলো দিয়ে সে জোরডানের সঙ্গে কথা বলতো, একটা নোংরা, বদ্ধ মাতাল লোক।

—তাজ্জব ব্যাপার। তুমি নিজে এসব করতে গেলে কেন? গলোউইজ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো! ওরা তোমার এমন একটা ভুলের জন্য অপেক্ষা করেছিল,

তুমি জান না। অনেকদিন বেশ ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলে, শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলে। এবারে ভাবছো, এরকম সুযোগ ও হাত ছাড়া করবে? তোমার যদি ইচ্ছে ছিল ওকে সাবাড় করার তো লুইকে হুকুম করলেই হতো।

মরার হেসে উঠল।

—*এ্যাবি, তুমি বুঝবে না। এটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার।* আমি সুখ পেয়েছি, যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছি। জান, আমাকে দেখে ওর মুখের চেহারা যা হয়েছিল, তুমি যদি একবার দেখতে। জুন রীতিমত ভীতু। নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে গেল ওর চেহারার প্রসিদ্ধি, চালচলনের গর্ব। বাপরে, একবার যদি দেখতে।

আবার হেসে উঠল মরার। গলোউইজের শিড়দাঁড়া বেয়ে যেন নেমে গেল হিমশীতল প্রস্রবন। বলতে থাকে মরার, যদি একবার শুনতে ওর মরণ-চীৎকার! বুঝলে? এটা আমার······আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর ভার অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারি না।

গলোউইজের মুখে ঘাম জমেছে, হাত ঘষতে লাগল।

—এর ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিপদ হতে পারে। সিন্‌ডিকেট এসব কাজকে প্রশ্রয় দেবে না।

সিনডিকেট, মরারের গলায় স্বর কর্কশ, রুক্ষ। সিন্‌ডিকেট অনেক দেখেছি, আর নয়। আমি কি করবো না সেটা কি সিণ্ডিকেট বাতলে দেবে?

গলোউইজ সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলো। তার মুখে জমে উঠেছে ভয়। ঐ মুখ মরারকে সে দেখাতে নারাজ তাই মাথাটা ঘুরিয়ে নিল।

—যদি ঐ কোলম্যান মেয়েটার নজরে তুমি পড়ে থাকো······

—সেজন্য তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। অবজ্ঞা ভরে বললো মরার। আমি যা করবার করবো, ওকে না পেলে ফরেস্ট কেন কারুরই ক্ষমতা নেই কিছু করার। হৈ-চৈ সার হবে, কাজ কিন্তু এগোবে না। তারপর বাকি যা করবার তুমিই পারবে।

—বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন, বলা তো যায় না, কিছু যদি দেখে—

—ভেবো না, সরিয়ে ফেলা হবে। ঠিক সময়ে ম্যাকক্যান খবর পাঠাবে। আধঘণ্টা সময়? চিন্তা করার কি আছে?

গলোউইজ কি যেন ভাবলো।

—না জ্যাক, তবু আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না। ইয়াট প্রস্তুত রাখতে হবে। মেয়েটা খুন হবার পর চারিদিকে সোরগোল পড়ে যাবে। তোমাকে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিতে হবে, বাইরে থাকতে হবে। মাছ ধরতে গেছো কোথায় বলে যাওনি, এমনই আর কি, তারপর আবহাওয়া বুঝে ফিরে আসবে।

মরার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

—কোলম্যানকে খুন করার দায়িত্ব থাকবে লুই-র ওপর। ইয়াট রেডি থাকবে। ম্যাকক্যান ফোন করলেই আমি কেটে পড়বো।

—তাহলে লুইকে ঠিক করা হলো ?

—হ্যাঁ। ওকে একটু খবর পাঠাবে ?

গলোউইজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দরজা খুলে চলে গেল।

মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকলো সাইগেল। অতি সাবধানে এগিয়ে গেল মরারের সামনে। সাইগেল যতটুকু শুনেছে, তার ধারণা মরার নিজের হাতে জুন আরনটকে খুন করেছে। শোনা অব্দি তার মনে অশান্তি দেখা দিয়েছে। তার এই দীর্ঘ দশ বছরের আরাম, ঐশ্বর্য, বিলাস সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মানুষ দুটো জিনিস চায়—স্ত্রীলোক আর ঐশ্বর্য। এছাড়া আর কি আশা করতে পারে ? কিন্তু তার সেই সুখের নীড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমন ঐশ্বর্য আর আরাম তাকে হারাতে হবে ?

রাগে লুইয়ের সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল।

—লুই, এই মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে, ম্যাকক্যান টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে। আধঘণ্টা সময় পাবে। এর মধ্যে চটপট কাজ সারতে হবে। তারপরেই পুলিশ এসে যা করবার করবে।

সাইগেল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—মিঃ মরার কাজটা একটু বিপদের আছে ? কোথায় ওকে পাওয়া যাবে, বাড়িটা কিরকম, এগুলো আগে থেকে জানা না থাকলে—

—জানি, অসুবিধা হবে। কাজটাই মুশকিলের তাতে কি আছে, কাজ হলেই হলো। কে করবে ?

সাইগেল একটুক্ষণ চিন্তা করলো।

—মো আর পিটি করবে।

—পিটি ? কে সে ?

—পিটি ওয়াইনার। ও কাজ হাসিল করতে পারবে। অবশ্য এই প্রথম তার হাতে খড়ি হবে। কাজ না করলেও একদিন তো করতেই হবে।

—যে ছেলেটার গালে একটা জড়ুল আছে, সে কি?

—হ্যাঁ। বেশ কথা বলতে অভ্যস্ত। ওর বাবা একসময়ে মন্ত্রি ছিল। ও পারবে। ওকে দেখলে কেউ চট করে সন্দেহ করতে পারবে না। তাছাড়া যদি ওকে দিয়ে না হয়, তাহলে তো মো আছে। মো কোন কিছুকে ভয় পয়ে না, সাহস আছে।

—কিন্তু ওকে আমার ঠিক মনোমত হচ্ছে না, মুখে অতবড় একটা দাগ। সহজেই লোকের ওকে চিনে ফেলার সম্ভাবনা।

—আপাততঃ অন্য কেউ নেই। একটু সময় পেলে কাউকে খোঁজ করা যেতো। কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেব। তাহলে কোন অসুবিধা রইলো না।

—দেখো, যেন কোন ঝামেলা না হয়, লক্ষ্য রেখো।

দরজায় আলগা টোকা পড়ল, ঘরে ঢুকলো সাইগেলের সহকর্মি ডাচ ফাইনার। লম্বা চওড়া চেহারা, লাল চুল, তার ধূসর দুটি চোখে যেন ঠাণ্ডা বরফের ভাঁটা পড়েছে।

—কি ব্যাপার? মরার একটু বিরক্ত হল।

—এইমাত্র একজন মহিলা এলেন। সম্ভবতঃ মিঃ কনরাডের স্ত্রী। আর একদিনও এসেছিলেন, আমার ভুলও হতে পারে। তাই ভাবলাম আপনাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

—কি বললে? পল কনরাডের স্ত্রী?

—সে রকমই তো মনে হচ্ছে।

—কনরাডও আছে না কি?

—না, একাই এসেছেন।

—লুই তুমি একবার দেখ। মরার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সাইগেল সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেল।

মিনিট দুই কেটে গেল। সাইগেল রেস্তোঁরা ঘুরে আবার ফিরে এল।

—হ্যাঁ, কনরাডের স্ত্রী। বার-এ বসেছে। মরারের হাতের ইশারায় ফাইনার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যাবার পর মরার দৃষ্টি ফেললো গলোউইজকে লক্ষ্য করে।

—কি ব্যাপার, এ্যাবি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কনরাড ওকে গোয়েন্দা-গিরি করতে পাঠিয়েছে, তাই কি ?

—না না, এটা অবিশ্বাস্য।

—যাও লুই, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। মরার বলল। সতর্ক হয়ে কথা বলবে। দেখো, ও যেন টের পেয়ে না যায়, তুমি ওকে চেনো। নিজের থেকে কিছু বলে কিনা। এখানে কি কারণে এসেছে সেটা বের করবার চেষ্টা করো।

সাইগেল রাজী হয়ে মাথা নাড়ল, তারপর চলে গেল ঘর থেকে।

—এ্যাবি, তুমি ওর সম্বন্ধে কিছু জান ?

গলোউইজ আবার আরাম-কেদারায় বসেছে।

—না, বিশেষ কিছু নয়। দেখতে সুশ্রী। বিয়ের আগে গান করতো নাকি, গান গেয়ে কিছু আয়ও করতো। বিয়ে হয়েছে তিন বছর।

—এখানে মরতে এসেছে ? ধান্দা কি ওর ?

গলোউইজ কাঁধ ঝাকুনি দিল। জেনী কনরাডের ওপর তার কোন মোহ নেই। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্যাক তার ইয়াট নিয়ে ভেসে পড়বে সমুদ্রে। তখন এই সাম্রাজ্যের আপাততঃ অধীশ্বর হবে সে। গত তিন বছর ধরে সে এই স্বপ্ন রেখেছে। হয়তো আজ তার মনের বাসনা পূর্ণ হবে। উপদেশ শোনবার জন্য কাউকে তেল মাখাতে হবে না। তখন এই বিশাল প্রতিষ্ঠান চলবে তারই আদেশে।

এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য সে মনে মনে পোষণ করে রেখেছিল। যেদিন সে প্রথম তাকে দেখে সেদিন থেকে তার বুকে জ্বলছে আসক্তির যন্ত্রণা। এবারে সেই যন্ত্রণা নিরাময় হবার সময় আসবে—মরারের স্ত্রী ডলোরেস।

দীর্ঘাঙ্গী, লাল চুল, তার সবুজ দুটি চোখের তারা চক্‌চক্ করছে। যৌবন যেন উথলে পড়ছে ডলোরেসের। তাকে দেখলেই গলোউইজের নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে। ডলোরেসের মত এমন পরম কাম্য স্ত্রীলোক দ্বিতীয়টি নজরে পড়েনি তার। এমন নারীর ওপর মরারের একটুও আগ্রহ নেই, গলোউইজের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এমন স্ত্রী যার ঘরে সে কিনা জুন আরনটের মত অভিনেত্রীর দিকে ঝোঁকে। কি জানি কি করে এটা হয়।

—ভাবছ কি ? মরার জানতে চাইল।

—অনেক কিছু। তোমার হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমার ঠিক মনের মত

হচ্ছে না। ভাবছি, তোমার অনুপস্থিতিতে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আমাকেই সামলাতে হবে, তাই দুশ্চিন্তা জেগেছে মনে।

—আরে, তুমি কি ভাবছ আমি বেশীদিন থাকবো? আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না?

—তা পারব না কেন?

* * *

জেনী কনরাড ব্যগ্র হয়ে বার-এর চারদিকে তাকালো। লোক থৈ-থৈ করছে চারপাশে।

প্যারাডাইস ক্লাবের নিয়ম আছে, মেয়েরা একা আসবে না। দরজায় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে—সে কি একা? জেনী উত্তর দিয়েছে, কয়েকজন বন্ধু সে আশা করছে।

গতবার যখন সে এসেছিল, তখন একটা মোটা বয়স্ক লোক তাকে সঙ্গ দিয়েছিল। লোকটি বলল, বসতে পারি? বলেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছিল তার টেবিলে। কতকগুলো বাজে গল্প করে তার সন্ধ্যেটা মাটি করে দিয়েছে।

আবার সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। ভাবলো, আজকের সন্ধ্যাটাও কি বরবাদ হয়ে যাবে? প্রত্যেকটি টেবিলে জোড়া জোড়া বসেছে। সেদিকে তাকিয়ে জেনী ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ সে একা বসে থাকবে। এর মধ্যেই বারটেণ্ডার তার দিকে তাকাতে শুরু করে দিয়েছে।

ড্রিঙ্ক শেষ করে জেনী গেলাস নামিয়ে রাখলো। ভীষণ খারাপ লাগছে তার। যদি এখন তাকে বাড়ী চলে যেতে হয়, ভাবতেই পারে না সে। আর যাবেই বা কোথায়? শুধু সাজতে তার প্রচুর সময় লেগেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে, প্রশংসা না করে পারে নি। এখানে পলের উজবুক বন্ধুদের কারুর আসবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অন্য কোথাও যেতে তার একেবারেই ইচ্ছা করছে না।

না, বড্ড একঘেয়ে লাগছে, আর বসে থাকা যায় না। প্রায় উঠবে উঠবে ভাবছে, এমন সময় লম্বা লোকটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। তার পরণে আর্ট টোক্সাডো। জেনীর বুকটা উত্তেজনায় দুলে উঠলো। যেমন সুপুরুষ তেমনি বলিষ্ঠ গড়ন। বাঁ চোখের কোণ থেকে নাক পর্যন্ত সরু দাগটা লোকটার চেহারায় যেন অভিনব বৈশিষ্ট্য।

লোকটা তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো, মুখে তার ফুটে উঠলো অন্তরঙ্গতার হাসি।

জেনীর মুখেও একটুকরো অস্বস্তির হাসি দেখা দিল। কিন্তু তার আগ্রহ চাপা রাখার কোন চেষ্টা সে করলো না।

—আপনাকে কেউ যে বসিয়ে রেখেছে, সাইগেল বলল, সেটা অবিশ্বাস্য।

লোকটা ততক্ষণে তার নীচু গলার জামার ভেতরে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে।

জেনী একটু ব্যস্ত হয়ে চেয়ারে ঠেস দিল। কিন্তু লোকটার তাকানোটা তার পছন্দ হলো না।

—আপনাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম, সাইগেল বলল, আপনি বেশ কিছু সময় হল এসেছেন, তাই না ?

—হ্যাঁ। তা কিছুক্ষণ হল। জেনী তার ঘড়ি দেখলো। দেরী হচ্ছে আসতে। দেরী করা ওর স্বভাব।

—সময় এবং নারীর কোন পুরুষের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমি কি সেই ভদ্রলোকের পরিবর্তে বসতে পারি ?

জেনী এরকম চায় না, ভান করলো।

—দেখুন, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তাছাড়া, আমরা তো এখানে অপরিচিত।

সাইগেল চেয়ারে বসে পড়ল।

—পরিচয় হতে সময় লাগে নাকি ? আমি হলাম লুই সাইগেল। আপনার নাম ?

—জেনী···কনরাড।

—তবে দেখুন, আলাপ হতে এক মিনিটও সময় লাগলো না। আসুন, ড্রিঙ্ক করা যাক।

সাইগেল হাতের ইশারায় বারটেণ্ডারকে ডাকলো। জেনী দেখলো, অর্ডার নিতে কি তাড়াতাড়ি ছুটে এল বারটেণ্ডার। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের টেবিলে ড্রিঙ্ক এসে গেল, তা বিশ্বাস করা যায় না।

—আমি যদি পুরুষ হতাম জেনী বললো, তাহলে আমারও বলা মাত্র এত তাড়াতাড়ি কাজ হত, তাই না ?

—আপনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে আমি যথেষ্ট দুঃখ বোধ করতাম।

সাইগেল তার সেই বিখ্যাত দুঃসাহসিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো জেনীর দিকে। সে ভাবল, কনরাড কি ভাগ্য নিয়ে এমন স্ত্রী পেয়েছে? খুব সম্ভব আপনি কয়েকদিন আগে এখানে এসেছিলেন তাই না?

—হ্যাঁ। জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন?

—তা আসি। সাইগেল হাসল। আমার মনে হয় না, শহরে এমন জায়গা দ্বিতীয়টি আছে। সে গেলাস তুলল। স্থায়ী এবং আন্তরিক বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে। জেনীও গেলাস তুলে নিয়ে হাসলো—

একসঙ্গে চুমুক দিল। দুজনে মুহূর্তের মধ্যে খালি হয়ে গেল সাইগেলের গ্লাস।

—আর একটা আনতে বলি। আপনি ওটা খেয়ে নিন।

জেনী রাজী। বারটেণ্ডার আরও দুটো মার্টিনি নিয়ে এল। সাইগেলের চোখে বিস্ময় ও প্রশংসা সমানভাবে ফুটে উঠেছে, সে বার বার জেনীকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা বর্ধিত হল এ পর্যন্তই।

জেনী বুঝতে পারলো, লোকটা সুপুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিপজ্জনক। শুধু সে বসে বসে গল্প করবে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তা একবারও মনে হল না জেনীর। ড্রিঙ্কের পরেই নিশ্চয়ই কোথাও যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

নিমেষের মধ্যে উত্তেজনায় জেনীর হৃৎপিণ্ড নেচে উঠল। সে কতদূর তাকে এগোতে দেবে? কিন্তু তার মনে হল না একবারও, সেই মুহূর্তটা যখন আসবে, তখন সে কিছুই বলতে পারবে না, বলার তার কিছুই থাকবে না। তার আত্মবিশ্বাস ভীষণ, কিন্তু সাইগেল তার সম্পূর্ণ অচেনা লোক, একবার ধরলে তাকে ছাড়ানো জেনীর পক্ষে অসম্ভব।

এমন লোকের সঙ্গে কথা বলা, আর সে যেভাবে তাকে লক্ষ্য করছে, তার ওপর মার্টিনির নেশা, নাচের বাজনা বাজছে—জেনীর মনে পড়ে গেল বিয়ের আগের দিনগুলের কথা। কি আমোদ আর উত্তেজনা ছিল। আর বেশীদিন আগের কথা নয়, মাত্র তিন বছর।

—মনে কিছু বাজে চিন্তা করছেন তো? সাইগেল জানতে চাইল। মেয়েদের মনের কথা জানতে সে পারে। তাই ঠিক সময়ে এগিয়ে যাবার কায়দাটাও সে চমৎকার আয়ত্ত করে ফেলেছে। তাই বন্ধুমহলে তার বেশ নাম আছে।

জেনীর মুখ লাল হয়ে উঠলো।

—না, বাজে চিন্তা কেন? গেলাসের বাকি মদটা শেষ করে সে এগিয়ে রাখলো?

—নিশ্চয় ভাবছেন। আপনি ভাবছেন এরপর আমি কি বলব, কি করব। মনে করছেন, আপনাকে আমার বাড়ী যেতে বলব। চমৎকার ছবি আছে আমার কাছে, দেখে আনন্দ পাবেন।

জেনী কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে উঠলো।

—না না, আমি ওসব কিছু ভাবিনি।

সাইগেল তার দিকে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো। কি একটা জান্তব আকর্ষণ রয়েছে ওর মধ্যে। জেনীর রক্ত চলকে উঠলো। জেনী একমুহূর্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল।

—ছবি আপনার ভাল লাগে? সাইগেল প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, যদি উঁচুদরের ছবি হয়।

—আমার মোটামুটি লাগে। তবে আজকাল বাড়ীতে কিছু ভাল ছবি রাখার রেওয়াজ হয়েছে। ভাল খাবার, একটু নাচ, নরম আলো আর নরম বাজনা আমার প্রিয়। আপনার খিদে পায়নি?

জেনী তার দিকে তাকালো, ইতস্ততঃ করল। জোয়ান সুপুরুষ লোকটি ভেবেছে, ওকে যা বলবে তাই সে মেনে নেবে। আর যতই বাড়বে ততই হয়তো ওকে বাগে আনা কষ্ট হবে। আবার ভাবল, যদি সে লোকটার প্রস্তাবে রাজী না হয়, তাহলে সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপর সে আর কি করবে? আবার সেই বন্ধ বিরক্তিকর আবহাওয়ায় তাকে ফিরে যেতে হবে। সেই একঘেয়ে ঘর, টেলিভিসন সেট।

—হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে।

—বেশ। আমি একটা টেলিফোন কল সেরে আসি। ততক্ষণ আপনি আপনার সুন্দর নাকে পাউডার লাগান।

—আচ্ছা।

কাউন্টারের পাশ কাটিয়ে সাইগেল অদৃশ্য হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট নম্বরে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে সাইগেল দাঁড়িয়ে রইলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

জেনী তাকে দোটানার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যদি সে তার পরিচয় না জানতো, কনরাড তার স্বামী, তাহলে নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারতো, ফুসলানোর

খেলায় সে মেতে উঠেছে এ কি কোন খেলা? না কি সত্যি-ই এসব ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ? নাকি যখন সে কোলম্যান মেয়েটাকে সরাবার ব্যবস্থা করবে, তখন কনরাড এসে হাজির হবে? ওর মনের ভাবটা কি তাই? কনরাড কেনই বা তার স্ত্রীকে এমন জায়গায় আসতে দেবে? তবুও, ব্যাপার যাই হোক না কেন, প্রথম থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে মো গ্রেব-র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

—কি খবর?

—কাজ আছে। তুমি আর পিট, তোমরা দুজনে একাজ করবে। পিট কাজ করবে, তুমি গাড়ী দেখবে। পিটকে খবর পাঠাও। দু'জনে প্রস্তুত থাক। আবার সময় মতো টেলিফোন করবো। দেখো যেন কথার নড়চড় না হয়, তাহলে তোমাকেই আমি ধরবো।

—ঠিক আছে।

—কাজ হওয়া চাই নিখুঁত, নিঃশব্দে এবং খুব তাড়াতাড়ি। যে কোন মুহূর্তে আমি আবার ফোন করবো। ফোন ধরার জন্য তৈরী থাক। সাইগেল টেলিফোন নামিয়ে রেখে অফিসে এলো।

তখনও মরার আর গলোউইজ বসে আছে। তারা কথা বলছে। ডলোরেসও কখন সোফায় এসে বসেছে।

সাইগেলের দৃষ্টি আবদ্ধ হলো ডলোরেসের দিকে। তার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। তার রক্ত গরম করে তোলার ক্ষমতা একমাত্র ডলোরেসের আছে, এছাড়া অন্য কেউ পারে না। অবশ্য তার এটা অজানা নয়, ডলোরাসকে সে কোনদিন পাবে না। তার হাতের মুঠোর বাইরে, ঠিক বরফে আবৃত এভারেষ্ট চূড়ার মতো। কিন্তু মনে মনে তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ চিন্তা করতে কেউ তাকে কি বারণ করেছে? নিবেশ করে তাকে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে অথবা ঘুমের আগে তার মুখখানা চোখের আয়নায় তুলে ধরতে?

ডলোরেস মরারকে বিয়ে করেছে একমাত্র টাকা আর ক্ষমতার লোভে, এটা সাইগেল জানে। এটাও তার অজানা নেই, ডলোরেসকে এর জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হয়।

আসক্তির শেষ পর্যায়ে এসে হাজির হয়েছে মরার। তার কেবল একটু আঙুল বা চোখের ইশারার অপেক্ষায়, অনেক সুন্দরী তাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে, বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। সিনেমা জগতে

আর ক্যালিফোর্নিয়ার নাইট ক্লাবগুলিতে তার অসাধারণ আধিপত্য, থিয়েটারেও তার প্রভাব কম নয়। তার আকর্ষণে চুম্বকের মত এগিয়ে এসেছে জুন আরনটের মত খ্যাতনামা অভিনেত্রী। তার কাছে ডলোরাসের মত সুন্দরীর কোন দাম নেই। বহু নারীর মধ্যে একজন, এর থেকে বেশী কিছু নয়।

ডলোরাস বারে বসেছিল, হাতে তার মদের গেলাস। আবার সাইগেল তার দিকে তাকালো। ডলোরাস পরেছে এমারেল্ড সবুজ সান্ধ্য পোশাক। এমন খুঁতহীন চামড়ার তৈরী শরীর খুব কমই চোখে পড়ে। পুরনো হাতির দাঁতে যেন ক্রীম লাগানো। মাথা ভর্তি লাল চুল আর বাদামাকৃতি সবুজ দুটি চোখ। শরীরে কোন জায়গায় এতটুকু ত্রুটি নেই। যেমন দীর্ঘ, ভরাট তেমনি আকর্ষণীয় লোভনীয়। সাইগেল নিরাশ হয়ে শুকনো গলায় ঢোক গিললো।

ডলোরাস তাকে দেখে হাসলো, তার ঐ হাসির মধ্যে যেন বিদ্রূপ জড়ানো। ভাষাটা এমনই যে, তুমি যা ভাবছ, আমি তা জানি। কিন্তু কিছুই তো করার নেই বল?

—হ্যালো লুই। ডলোরাস বলল, তোমার রোমান্স কেমন চলছে? মেয়েটার সঙ্গে গল্প করতে দেখলাম। তোমার পছন্দ?

সাইগেলের মুখে যেন রক্ত উপছে উঠলো। সে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মরারের দিকে তাকাল। তারপর গলোউইজকে লক্ষ্য করলো। গলোউইজও যে ডলোরাসকে কাছে পাবার জন্য উতলা হয়ে আছে, সেটা সে জানে। এদিক থেকে গলোউইজের একটা সুযোগও রয়েছে।

যদি একটু এদিক-ওদিক হয়, তাহলে কেবল যে গলোউইজ এই প্রতিষ্ঠানের মালিক হবে তা নয়, ডলোরাসও তার দখলে আসবে। এটাও সাইগেল জানে, ঐ এ্যাটর্নীকে ডলোরাস দু'চোখে দেখতে পারে না, মরারকেও নয়। দু'জনকেই ঘৃণা করে সে। সে কেবল ভালোবাসে টাকা আর ক্ষমতাকে!

কখন কোন সুযোগ নিতে হবে, কোন মানুষটিকে পাকড়াও করতে হবে, সেই কায়দাটা সে ভালমতই রপ্ত করেছে।

—সব ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এসো না। মরার বললো। যদি কথা সংযত করতে না পারো তাহলে অন্য কোথাও যাও।

—না, জ্যাক আমি আর কথা বলবো না। তুমি আমায় এ দৃশ্যের একটি অংশ ভাবতে পারো। ডলোরাসের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলে গেল।

মরার সাইগেলকে লক্ষ্য করলো।

—ও কি করতে এখানে এসেছে, জানতে পারলে ?

—না। ওকে নিয়ে ডিনার খেতে যাচ্চি। ও নিজেই ওর পরিচয় দিয়েছে। কথাবার্তা শুনে মনে হয় এসব ব্যাপারে চোস্ত মেয়ে। আবার ভুলও হতে পারে, হয় তো অভিনয় মাত্র।

—না, লুই। অভিনয় নয়। তোমাকে বোকা বানানো সোজা নয়। খুব সম্ভব, ও তোমাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে। নিজেকে তোমার ঐ শক্ত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে অস্থির হয়ে উঠেছে। এমন মেয়ে কোথায় আছে যে তার গালে তোমার ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতে চায় না।

মরার তাকে যে ঠাট্টা করছে, সাইগেল বুঝতে পারলো। আর সুযোগ পেলেই সে তাকে এমনি ঠাট্টা করে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কি একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল।

—ডলি, তুমি এখন যাও। মরার বলল। আমাদের প্রয়োজনীয় কথা আছে।

ডলোরাস সঙ্গে সঙ্গে তার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ব্যাগটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। লাল ঠোঁটে জ্বলজ্বল করছে সেই ভুবন ভোলানো হাসি। আর সেই বিখ্যাত নিতম্ব ঘূর্ণন—যা বিশেষ ভাবেই গলোউইজ আর সাইগেলের জন্য। পাশ দিয়ে যাবার সময় সে যে একটুখানি নাক কুঁচকে গেল, সেও তার নজরে পড়েছে।

—গুড নাইট, এ্যাবি। সে বলল।

—গুড নাইট, গলোউইজ তার দিকে না তাকিয়েই বললো। সে চটে গেছে।

—গুড নাইট, লুই। তার গলায় ঠাট্টা।

—ওঃ, যাও না, মরার বিরক্ত হয়ে বললো, আমাদেব বিশেষ কাজ আছে বলছি না ?

—গুড নাইট, ডারলিং।

সে দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল।

মরার হাতের মুঠো পাকিয়ে বললো—মেয়েগুলো কেন যে জাহান্নামে যায় না……

—মিসেস কনরাডকে বসিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। গলোউইজ বললে।

—হ্যাঁ, তাই তো। মরার শিরদাঁড়া সোজা করে বসলো। লুই, ওকে দিয়ে

কাজ হতে পারে। তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলো। কিন্তু সাবধান, দেখো কোন খবর যেন ফাঁস না হয়ে যায়।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সাইগেল উত্তর দিল।

—বেশ যাও। আমার ধারণা, তোমায় বেশী কথা খরচ করতে হবে না।

সাইগেল জেনীর উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

ককটেল বার-এ জেনী বসেছিল। ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে গভীর উৎকণ্ঠা, তাই লক্ষ্য করে সাইগেল একরকমের নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করলো। উদ্বেগ পরিষ্কার, মনে হয় জেনী মনে করছে, সাইগেল তাকে ফেলে চলে গেছে।

—কি আশ্চর্য, এই আপনার কয়েক মিনিট?

সাইগেলের মুখে হাসি!

—ডায়াল করে করে লাইন পাইন পাওয়া যায় না, এনগেজড। কি করবো বলুন? সাইগেল তার প্রখরদৃষ্টি একবার জেনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘুরে এল। না, ডলোরাসের কাছে মেয়েটির কোন দাম নেই। ডলোরাসের যৌবন, রূপ যেমন পাগল করে তোলে তেমনটি নেই। অগত্যা কি আর করা যাবে। এখনকার মত একে দিয়েই কাজ সারতে হবে। অন্ধকারে কোথাও নিয়ে গিয়ে ভাববে ডলোরাস। আজকের রাত্রি জেনীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডলোরাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওর মনে আঁচড় কেটে দেবে।

—চলুন, যাওয়া যাক। সাইগেল তার হাতে হাত রাখল।

॥ চার ॥

হ্যামটা আগেই তৈরী ছিল। ডিমটা স্টোভে ভেজে নিল মো গ্রেব।

টেবিলে খেতে বসলো। শক্ত লোহার মত গড়ন লোকটার, বেঁটে। ছোট মুখটি ভেড়ার চর্বির মত সাদা। ছোট কুতকুতে চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে নির্মম নিষ্ঠুরতা। কঠোর মুখটা ঠিক বেড়ালেদের মত হিংস্র। টাকা হলে সে সবকিছু করতে পারে।

হিংস্র জন্তুর মত মাংসে কামড় বসালো, পেয়ালায় কফি ঢালল।

পিটার ওয়াইনার জানালায় বসে বসে মো-র খাওয়া লক্ষ্য করছিল।

—কি ব্যাপার! অমন হাঁ করে দেখার কি আছে? মো হিংস্র বাঘের মত গর্জন করে উঠলো। কাউকে কি খেতে দেখনি?

—মনে মনে তোমার ক্ষুধার প্রশংসা করছিলাম। কাল রাত ন'টা থেকে এ পর্যন্ত হিসেব করে দেখলাম, তুমি দু'পাউণ্ড হ্যাম আর বারোটা ডিম উদরে পুরেছো।

—এতে অবাক হবার কি আছে? কাজ তো একটা কিছু করতে হবে। চুপ করে বোকার মত হাত-পা গুটিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? তুমিও খাও না, কেউ তো নিষেধ করেনি?

—আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

মো পিটারকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। লোকটা দেখতে অদ্ভুত, সে ভাবল অবশ্য, এমন কিছু দোষ আছে তা মনে হয় না। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, পিটারের মত তার গালেও যদি ওরকম বিশ্রী একটা লম্বা দাগ থাকতো তাহলে তাকেও অমন অদ্ভুত দেখাত বৈকি! অদ্ভুত; ও বেচারীই বা কি করবে।

—কি বলছিলে? কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? কি জানি বাবা, বাবুর কখন টেলিফোন করার সময় হবে?

মুখে বড় একটা মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ ধরে চিবোলো। তারপর কফির পেয়ালায় লম্বা টান দিল।

—আমি ভাবছি, লুই তোমাকেই বা মারতে বলছে কেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আর মেয়েটাই বা কে? আমি থাকতে, তুমি কেন? এই হাতে কত লোককে খুন করলাম। তোমার তো সবে হাতে খড়ি, হাতই দাওনি।

—দিইনি ঠিক, কিন্তু একদিন তো দিতে হবে। ফ্রানসেস কোলম্যানের ছবিটা তুলে নিলো ওয়াইনার, দেখতে লাগল। ইস্! এই মেয়েটাকে মারতে হবে!

—খাশাস্! এমন মেয়েকে, খাসা কথা বলেছো? কিন্তু তার আগে ওকে অনেক কিছু করা যেতো।

পিট আবার ছবির উপর চোখদুটো রাখলো। চোখদুটো আর সরাতে পারে না, ছবিটার যেন কি এক আকর্ষণ শক্তি আছে। গভীরভাবে তার মনকে নাড়া দিল। সুন্দরী তো ঠিকই, এছাড়া এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা প্যাসিফিক সিটির এত মেয়ের মধ্যেই কারুরই মুখে সে দেখতে পায়নি। তেমনি সাড়া-জাগানো তার চোখ, গভীর আগ্রহ, গভীর আনন্দের চোখ, যেন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তার অসীম আনন্দ।

মো পিটারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর পরণে পরিষ্কার ঝকঝকে ধূসর রঙের ফ্ল্যানেল স্যুট, বাদামী সু, সাদা শার্ট আর নীল ডোরা কাটা টাই, হঠাৎ ওকে দেখলে মনে হয় কোন সৌখীন কলেজের ছাত্র ;কথাবার্তাও সেই গোছের। ওর বয়স তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে। তার চেয়ে দু-এক বছরের বড়। গালের দাগ না থাকলে সিনেমায় ঢুকতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু অমন একটা বিশ্রী দাগ নিয়ে ছবিতে যোগ দিয়ে ছবি চলবে না। মো-র মুখে হাসি ফুটে উঠল।

—কেন এ কাজ করতে হবে, সে সম্বন্ধে সাইগেল কি তোমায় কিছু বলেছে মো?

—আমি জানতে চাইনি। একদম বাজে লোক! প্রয়োজনে দু'একটা কথা ছাড়া আমার থাকতে ইচ্ছা করে না। আরও কফি পেয়ালায় ঢেলে নিল সে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক কাজের, বুঝেছো। কাজ হয়ে গেল তো সব ঝামেলা চুকে গেল। তুমি জানো তো কিভাবে কাজটা করতে হবে?

—জানি। ওর মুখের শিরাগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। সে আবার জানালার বাইরে চোখ ফিরিয়ে নিল। মো কেমন যেন বিরক্ত বোধ করতে লাগলো। লোকটা চেষ্টা করলে শক্ত হতে পারে। তবু কেমন যেন একটু পাগলাটে

ধরণের! মাঝে মাঝে যখন তার মুখে এমনি ভাব ফুটে ওঠে তখন মো তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

এমন সময় টেলিফোন সশব্দে বেজে উঠলো।

—আমি ধরছি। মো তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পিট আবার চোখের সামনে ছবিটা তুলে ধরল। সে চিন্তা করতে লাগল, মেয়েটি যখন প্রথম তাকে দেখবে, কি ভাববে সে? হয়তো এক ফুৎকারে উড়ে যাবে পারিপার্শ্বিক আনন্দ। তার পরিবর্তে সৃষ্টি হবে বিরক্তি। অথবা অন্য মেয়েদের মত মুখ ঘুরিয়ে নেবে। আর তখুনি তার পেটের নিচে পাকিয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে দেখা যায় একটা অসুস্থ রাগ।

সে সহজেই ধরে নেয়, এবারেও তাই হবে। তবে তার অন্যান্য ক্ষেত্রে মুখে দাগি পাশটা লুকোবার চেষ্টা করে, প্রথম ধাপে কয়েকটা মিষ্টি কথা বলা শুরু করে। কিন্তু এখানে সে সব কিছুই করবে না। ফল পায় না কিছুই। বিনিময়ে কেবল বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি।

কিন্তু আসলে সে কি কুৎসিত দেখতে? তার চেহারা কি এতই বিশ্রী যে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়? এটাই যথেষ্ট পায়, তাড়াতাড়ি যে কোন একটা অজুহাত দিয়ে মেয়েরা দূরে সরে যায়। তার মুখ একবারের বেশী দুবার দেখতে চায় না।

কিন্তু এই মেয়েটি তাকে দেখবার আগেই সে খুন করে ফেলবে, এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করবে না।

পিট জানালা থেকে সরে এল। একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসলো।

তাড়াতাড়ি চল। সময় নেই একটুও। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। বাড়ীটা শহরের শেষপ্রান্তে।

ফোনের নিচে গুঁজালো বরফ-ভাঙা গাঁইতিটা ছিল। পিট সেটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলো। হাতে নিল কয়েকটা নতুন চকচকে পত্রিকা। তারপর মো-কে অনুসরণ করে এগোতে লাগল।

ভাঙাচোরা সিঁড়ি ভেঙ্গে রাস্তায় এসে নামলো দুজনে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো প্যাকার্ড। গাড়ীর ওপরটা দেখলে মনে হয় পুরনো কিন্তু ইঞ্জিন নতুনের মত কাজ করে।

মো লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠলো, নিমেষের মধ্যে পিট এসে স্থান নিল তার পাশে। গাড়ী দ্রুতগতিতে ছুটলো।

—আমারা কিভাবে কাজ করবো, শোনো। মুখের একপাশ হয়ে বলল মো, আমি গাড়ীতে থাকেবো। ইঞ্জিন চলবে। তুমি কলিং বেল টিপবে। ও দরজার কাছে আসবে। ওকে পত্রিকার কাগজ দেখাবে। ও তোমাকে ঘরে ঢুকতে বলবে।

…আর যদি মিস কোলম্যান না এসে অন্য কেউ দরজায় আসে তবে তাকে ডেকে দিতে বলবে। একা ওকে পেতেই হবে। তারপর পত্রিকা বিক্রীর কথা বলতে বলতে—। এমন একটি সজোরে বসাবে যে মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবে না। তারপর পালিয়ে আসবে।

…প্রয়োজনে গুলি চালাতে দ্বিধা করো না। তারপর গাড়িতে উঠে সোজা চোদ্দ নম্বর রাস্তায় উইলকক্স্রয়ের ওখানে যাব। গাড়ীটাকে গুম করে দিতে হবে, ওখানে ডাক আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে, আমাদের ক্লাবে নিয়ে যাবে। তারপর মোটর বোট।

—বুঝতে পেরেছি। পিটার বললো—কিন্তু এসব গল্প আমার মুখস্থ।

—আমারও তাই। তবে আর একবরে ঝালিয়ে নিতে দোষ কি? ক্লাবে পৌছতেই যা একটু মুশকিল। তারপর একবার পা দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিউবা! আহা রে! ছবি দেখেছি, আর মেয়েগুলোর কি সাংঘাতিক স্বাস্থ্য। মো আনন্দে শীষ দিল। দাঁড়াও না। একবার বাদামী রঙের প্রিয়াদের কাছে পৌছনোর অপেক্ষায়।

পিট চুপ। মো-র কথা তার কানে যাচ্ছিল কিনা সন্দেহ। তার মনে হল, জীবনের এক চরম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, এই মুহূর্তে। গত কয়েক মাস সে এই ধরনের কাজের কথা ভেবেছে। সে একেবারে অকর্মন্য নয়, এটাই এবার সে প্রমাণ করে দেবে। তার প্রয়োজন ছিল একটি খুন, একটি প্রাণ। অনেকেই তাকে অনেক করে কষ্ট দিয়ে আসছে। আজ সেই কষ্টের শোধ নেবে। পেটের নীচে সব তার একাকার হয়ে গেল।

—লেনক্স এ্যাভিন্যু। এই যে বাড়িটা। গাড়ীর গতি কমিয়ে দিল মো। বাল্টি বয়েড নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সে থাকে। তবে বাল্টি কেমন মেয়ে জানি না। যদি দু'জনকে একসঙ্গে পাও, সরাতে ও:কে না পারো, তাহলে ওর বুকে বা পিঠেও গাঁইতি ঢুকিয়ে দেবে।

বাড়িটা পেছনে রেখে একটু এগিয়ে গাড়ি থামাল মো। আমি দেরী করছি। তুমি নেমে পড়। তোমাকে ফিরে আসতে দেখলেই আমি গাড়ি স্টার্ট দেব।

পিট পত্রিকাগুলো হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। সে কেমন অস্বস্তি বোধ করলো। হাত দুটি তার ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে।

—তুমি তৈরী তো? মো জানতে চাইল। মনে রেখো, দারুণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

—আমি ঠিক আছি। পিট উত্তর দিল। হাতঘড়িতে নজর দিল। সাড়ে দশটা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। হাতে তার মাত্র একুশ মিনিট সময়। এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে পালিয়ে আসতে হবে।

তাড়াতাড়ি বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল সে। মন থেকে ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। সে ঠিক পারবে, অসুবিধা হবে না। সে ভাবতে লাগলো, মেয়েটির চোখের চাউনি। ক্ষণিকের কাজ। কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দু'পাশে ছোট লন, মাঝখানে রাস্তা। যেতে যেতে সে লক্ষ্য করলো সামনের একতলায় জানালার পর্দাটা হঠাৎ নড়ে উঠেলো। হাওয়া বাতাস কিছু নেই অথচ পর্দা নড়ছে কেন? দুটো সিঁড়ি পার হয়েই সামনের দরজায় পা রাখলো পিট। দরজার পাশে চারটি নামের বোর্ড। আর প্রতিটি বোর্ডের পাশে রয়েছে একটি করে কলিং বেল।

তিনতলায় বাপ্টি বয়েডের ঘর। পিটের মনে হল, কেউ যেন তাকে লক্ষ্য, করছে। মুখ ঘুরিয়ে সে পর্দার দিকে লক্ষ্য করলো। চট করে একটা মুখ পর্দার পাশ থেকে সরে গেল, একটা ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল পর্দার আড়ালে।

বাপ্টির ঘরের বেল বাজিয়ে দরজটা ঠেলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। সরু প্যাসেজ, তারপরেই সিঁড়ি।

পিট তিনতলায় পা দিতেই শুনতে পেল, একটা ঘরে রেডিও বাজছে।

আচমকা ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক তরুণী। যেমন তার চকচকে দেহ তেমনি তার ঝলমলে পোশাক।

থমকে গেল পিট, তার মুখ শুকিয়ে গেল। কি এক অজানা আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো দ্বিগুণ। মেয়েটির পরণে সমুদ্রে যাবার সাদা পোশাক, তার দিকে তাকাল পিট।

মেয়েটি একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু তার মুখের বিশ্রী জড়ুলটার দিকে নজর পড়তেই মেয়েটির হাসি এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিটারের মনে চাপা আক্রোশ গুমরে উঠলো। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হলো।

তবুও সে জোর করে হাসলো। ধীরভাবে প্রশ্ন করলো—মিস্ কোলম্যান আছেন?

—আপনি—আপনি কি ফ্রান্সির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বুঝতে পেরেছি, আপনিই বার্ট স্টিভেনস্। আসছে, এখুনি আসছে। আপনি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করুন, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটি আর না দাঁড়িয়ে দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

পিট এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোটের মধ্যে হাত চালান করে দিলো, আঁকড়ে ধরলো গাঁইতিটা। যখনই ফ্রানসেস বাইরে আসবে তখনই সে বুকের বাঁ দিক লক্ষ্য করে গাঁইতি বসিয়ে দেবে। মুহূর্ত্ত-খানেকের জন্য ওর বুকের হৃৎপিণ্ডটা ওঠা-নামা করবে। তারপরে সব শেষ। ঘরের মধ্যে এই মেয়েটার সামনে ঠিক সুযোগ হবে না। সেই আক্রোশটা অন্য ধরণের রাগে ফুলতে লাগলো।

দরজাটা ভেজানো, একটু ফাঁক করা। ঘরের মধ্যের কণ্ঠস্বর তার কানে এলো—কিন্তু সাংঘাতিক দেখতে। ওর সঙ্গে কথা বলতে তোমার প্রবৃত্তি হবে না—

পিট অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে সেই সময়টির জন্য। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কপালে যেন রক্তের চাপ ধাক্কা মারছে।

দরজার বাইরে এল ফ্রানসেস কোলম্যান।

পিট তাকে দেখতে লাগল, যেন ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে সে যেমনটি কল্পনা করেছিল, তার চেয়ে লম্বায় ছোট, দেহের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। পাতলা নীল লিনেনের পোশাকের অন্তরালে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার যৌবন। কালো রেশমের মত ঘন চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। উজ্জল, আন্তরিক হাসি তার মুখখানাকে আরও বেশী সুন্দর ও লাবণ্যময় করে তুলেছে।

পিট নির্বাক। ঐ তাজা যৌবনের সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে পিট হতবাক হয়ে গেল। তার মুখের মিষ্টি হাসিটা মিলিয়ে যাবার অপেক্ষায় রইলো সে, কখন তার মুখে ফুটে উঠবে, বিতৃষ্ণা-ঘেন্না। ততক্ষণে তার আঙুল গাঁইতির হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরেছে।

না, পিট যেমনটি ভেবেছিল সেরকম ঘটলো না। ফ্রানসেস কোলম্যান মুখে হাসি মিলিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, সেখানে ফুলে উঠলো আরও বেশী আনন্দ। সে যেন তাকে দেখে সত্যি সত্যিই খুশী হয়েছে।

পিট একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটি ফ্রানসেসের মুখের ওপর আবদ্ধ, স্থির, অপেক্ষা করছে ওর মুখের রূপান্তরের জন্য।

যতই সময় কাটে পিট ততই অবাক হয়। মেয়েটির মুখের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। এটা তার কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। আবার একভাবে তাকিয়ে রইলো।

—আপনি নিশ্চয় বার্ট? ফ্রানসেস তার দিকে এগিয়ে এলেন। করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। আগেই টেরি বলে রেখেছিল, কি এক বিশেষ কাজে সে ব্যস্ত থাকবে। সত্যি, আপনি না এলে কি যে অবস্থা হতো। কি চমৎকার, শেষ সময়ে এসে পড়েছেন। আজকের দিনটির জন্যে কেবল দিন গুনেছি।

পিট কোটের পকেট থেকে হাত বের করে আনল. হাত তুলে দিল ফ্রানসেসের হাতে। সেই পরিবর্তনটা দেখার আশায় পিট আর একবার তার সুন্দর মুখ লক্ষ্য করলো।

না, একটুও পরিবর্তন নেই।

পিট ওয়াইনার যেন দুঃখ পেল।

* * *

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বান্টি। তার পেছন পেছন এলো একজন যুবক লম্বা-চওড়া জবরদস্ত চেহারা। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, মুখে রয়েছে মিষ্টি হাসি। সাদা ডোরা কাটা তোল্ডঅল দেখা তার বগলে।

তখনও পিটার আর ফ্রানসেস হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। বান্টিকে লক্ষ্য করে ফ্রানসেস হাসল।

—প্রস্তুত, সে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, বাস্টারের মতে আমরা যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বো ততই ভাল, নয় তো সমুদ্রে জোয়ার এসে যাবে।

পিটের সঙ্গে ফ্রানসেস ওদের আলাপ করিয়ে দিল।

—বার্ট, এ আমাদের বন্ধু বাস্টার ওয়াকার। আর বান্টিকে তো এইমাত্র দেখলে।

জোয়ান লোকটিকে লক্ষ্য করলো পিট। কি দশাসই চেহারা। ফ্রানসেসের হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে হাসল। ঐ মুখে নেই এতটুকু বিস্ময় অথবা বিতৃষ্ণা। সেখানে কেবল ফুটে উঠেছে বন্ধুত্ব পাতানোর চিহ্ন।

—খুব আনন্দিত হলাম। বাস্টার বলল। আগে জানবার সুযোগ ছিল না বলে দুঃখিত। তুমি এসে পড়েছো তাই রক্ষে, না হলে কি এই দু'জনকে একা সামলাতে পারতাম?

বাস্টার হাত বাড়িয়ে দিল, পিট ওর হাতে হাত রাখলো। পিটের অজান্তেই গলা দিয়ে কি একটা কথা বেরিয়ে এলো, কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না।

—পত্রিকাগুলো আমার কাছে দাও। রেখে দিচ্ছি, যাবার সময় নিয়ে যাবে।

ফ্রানসেস হাত বাড়াতেই পিট পত্রিকাগুলো দিয়ে দিল। ওগুলো নিয়ে সে এক লাফে ঘরে চলে গেল। তারপর খালি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে দিল।

—চল, বেরিয়ে পড়ি। সে পিটারের হাত ধরলো।

সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এলো ওরা। ফ্রানসেসই যেন তাকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে। পিট এই মুহূর্ত্তে কি যে করবে বুঝে উঠতে পারলো না। তার সব চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গেল। তবে এইটুকু আবিষ্কার করলো, ঐ সুন্দর দেহে গাঁইতি বসানো তার পক্ষে অসম্ভব। সে কি করে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে। সে যেমন ভেবেছিল তার বিপরীত ব্যবহার পাচ্ছে মেয়েটার কাছ থেকে।

মনে করেছিল, মেয়েটি তার বীভৎস মুখটা দেখে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু এতটুকু বিরক্তিও সে প্রকাশ করেনি। ফ্রানসেসের পরিবর্তে যদি বার্টি হত তাহলে তাকে এত দোনামনা করতে হতো না।

রাস্তায় পা রাখলো চারজনে।

বাস্টার প্রশ্ন করলো—বার্ট, তোমাকে নিশ্চয় জেরি বলেছে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—না, বলেনি।

—উঃ, ওর স্বভাবটা আর পাল্টালো না। আমরা সমুদ্রতীরে যাচ্ছি, সারাদিন ওখানেই থাকবো। এ্যামুজমেণ্ট পার্কেও যাবার ইচ্ছা আছে।

—বাস্টার ভাবছে ও আমায় নাগরদোলায় তুলবে। বার্টি বলল, আমি মোটেও চড়বো না। গ্রেগরী পেকের অনুরোধেও নয়। আর বাস্টার ওয়াকার তো দূরের কথা।

বাস্টার সশব্দে হেসে উঠলো।

—তোমার নিষেধ আমি শুনবোই না, নাগর-দোলায় তুলবই। প্রয়োজন

হলে কাঁধে করে নিয়ে যাব। আমার ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ীটা রয়েছে। গ্যারেজ ওরা ভাল করে দেখে দিচ্ছে।

পিট আড়চোখে দেখলো, এই জানালার পর্দাটা নড়ছে। পর্দার পেছনে কোন মানুষের ছায়া।

—পর্দার আড়াল থেকে বুড়ো পার্কারটা উঁকি মারছে। সে দিক লক্ষ্য করে বলল বাস্টি। সারাদিন উঁকি মারা ছাড়া ওর কোন কাজ নেই।

ফ্রানসেস বলল—ওকে কখনও বাইরে বেরোতে দেখিনি। হয়তো লোকটি একা বোধ করে।

—দূর! একা নয়, আসলে ওর মনটা নোংরা। বাস্টি উত্তর দিল। কি আর করবে। তাই সারাদিন ধরে পর্দার আড়ালে উঁকি মারছে, কে কি করছে। কোথায় যাচ্ছে—এসব নিরীক্ষণ করছে।

পিটের অন্তর উত্তেজনায় ভরে গেল। তবে কি ফ্রানসেস তাকে করুণা করেছে। হয়তো ফ্রানসেসের বেলায়ও এই রকম ঘটে। ওর শান্ত, ধীর স্বভাবের জন্ম সবাই তাকে করুণা করে। তাই পিটারের ভয়ানক মুখশ্রী দেখেও তার মনে জাগে নি বিরক্তি। বা মনে মনে বিরক্ত হলেও বাইরে তা প্রকাশ করে না। কারোর মনে কষ্ট দেবার প্রবৃত্তি এদের নেই।

তাহলে ওরও মনে রয়েছে সেই ঘৃণা। মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠলো তার হিংস্র মনোবৃত্তি, নিমেষের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের পকেটে, চেপে ধরলো গাঁইতির হাতল।

প্রায় কুড়ি গজ দূরে তাদের প্যাকার্ডটা দাঁড়িয়ে আছে। সে এই মুহূর্তে কাজ হাসিল করে বাকি দু'জন কিছু করবার আগেই ছুটে গাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সেটা অসম্ভব। বাস্টি আর ফ্রানসেস পাশাপাশি হাঁটছে সামনে। আর তার পাশে রয়েছে বাস্টার।

পিট লক্ষ্য করলো, তাদের গাড়ীট কিছুটা এগিয়ে থামলো। এখন মো কি মনে করছে কে জানে। মো নিজেই একটা কিছু করে বসতে পারে। এই ভেবে তার মেরুদণ্ডে শিরশিরানি বোধ করলো।

মো গাড়ী থেকে ফ্রানসেসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে। একথা ভাবতেই সে তাড়াতাড়ি ফ্রানসেসের পেছনে এসে দাঁড়াল। এমনভাবে আড়াল করে দাঁড়ালো যাতে মো ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে না পারে।

নিরুপায় হয়ে বাস্টারও পিটারের পাশে এগিয়েএলো। সে নিজের মনে, খেলার গল্প বলে চলেছে।

সামনেই গ্যারেজ, ওরা থামলো।

বাস্টার তার ছোট স্পোর্টস গাড়ীটা দেখিয়ে বলল—গাড়ীটা ছোট হলেও দৌড়ায় খুব ভাল।

পিট লক্ষ্য করলো, সামনে দুটো সীট, পেছনে একটা বাকেট সীট, কোনরকমে একজন বসতে পারে।

—পেছনের সীটে বার্টি, তুমি বসো। বাস্টার বলল,। আর বার্ট, তুমি আমার পাশে বস। তোমার হাঁটুর উপর বসবে ফ্র্যাঙ্কি। হয়েছে তো?

—বার্ট মনে করবে, আমি ওকে চেপে মেরে ফেলবো। ফ্রানসেস হাসতে হাসতে বলল।

পিটের লক্ষ্য রাস্তার অন্য দিকে। তারপর এক সময়ে বললো—তুমি আমায় চেপে মেরে ফেলবে কেন?

বার্টি ব্যাক সীটে উঠে বসলো। পিট বসলো সামনের সীটে, বাস্টারের পাশে। ফ্রানসেস পিটের কোলে বসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো

পিট অনুভব করলো, মন পাগল করা যুবতী, দেহের উষ্ণ মদির স্পর্শ আর নাকে ভেসে এলো এসেন্সের গন্ধ। পিট ক্রমশঃ যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ল। তার একটুও নড়ার ক্ষমতা নেই, পাথরের মত সে চুপ করে বসে আছে।

কখন যে সে ফ্রানসেসের কোমর জড়িয়ে ধরেছে খেয়াল করেনি। সে অবাক হয়ে গেল। এরকম অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে কখনও ঘটেনি। এ তো কেবল স্বপ্নেই দেখা সম্ভব।

বাস্টার গাড়ীতে স্টার্ট দিল, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, বার্টি ঠিকমত বসেছে কিনা। তারপর গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দ, কথা সম্ভব নয়। তাই পিট খুব খুশী হল। তাদের এই নৈকট্যে বাধা পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই ভেবে আনন্দিত হল।

ছোট্ট গাড়ি পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে, কখনও লাফাচ্ছে, আবার দুলছে। ফ্রানসেস শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য পিটকে আঁকড়ে ধরেছে। সে হাসছে। গাড়ি বাঁক ঘোরবার সময় সে চেঁচিয়ে উঠল, বাস্টারকে গাড়ীর গতি কমাতে বলল। কিন্তু বাস্টার তার কথা শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

পিটের সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা খেলে বেড়াচ্ছে। সে বুঝলো, জীবনে

এই প্রথম সে এই স্বাদ আস্বাদন করলো। ঠিক উত্তেজনা বললে ভুল বলা হয়, একটা পরম সুখ, শান্তি। তার সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি।

একটা গর্তের মধ্যে পড়লো গাড়ীর সামনের একটা চাকা। ফ্রানসেস প্রায় ওর কোল থেকে পড়েই যাচ্ছিল। তার স্কার্ট উঠে গেল হাঁটু পর্যন্ত, মোজার সবটুকুই নজরে পড়ে গেল। উরুর চকচকে গোলাপী চামড়া পর্যন্ত দৃষ্টি এড়ালো না। পিট তাড়াতাড়ি তার হাঁটুর ওপর স্কার্টের জামা নামিয়ে দিল।

—ধন্যবাদ। কি কাণ্ড দেখ দেখি।

বাস্টার ওয়াকার ব্যাপার দেখে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে চোখ টিপল সে। দুষ্টুমির ভঙ্গীতে বললো—গাড়ী যতই খানায় পড়ুক আর গর্তে পড়ুক না কেন, গাড়ী কিন্তু চলবেই।

—বাস্টার? বার্টি জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, আমরা কিন্তু তোমাকে ফেলে রেখে বাড়ী চলে যাব।

বাস্টারের সেদিকে খেয়াল নেই। সে সমান তালে গাড়ী চালাতে লাগল।

দূর থেকে কানে ভেসে এলো লোকজনের হৈ-হৈ কলতান। আর একটু এগোতেই এ্যামুজমেণ্ট পার্ক থেকে চীৎকার, হাসি আর হট্টগোলের শব্দ। ছুটির একটি দিনে সবাই আনন্দে মেতে থাকতে চায়।

—বাপরে, এত লোক! কোথা থেকে সে সব আসে ফ্রানসেস বলল, আমি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারি না। যখনই এখানে আস কেবল দেখবে লোক আর লোক।

পিট কি বলতে গিয়ে থমকে গেল। হঠাৎ সামনের আয়নায় দৃষ্টি আবদ্ধ হল। তাদের পুরনো প্যাকার্ডটা তাদের অনুসরণ করেছে। মো-র মুখের এক পাশটা দেখা যাচ্ছে।

পিট কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। এতক্ষণ মো-র কথা, তার কাজ—সব কিছু বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। মনে পড়ে গেল সাইগেলের হুকুম অমান্য করার শাস্তির কথা—মৃত্যু।

গাড়ি রাখবার জায়গায় এতটুকু জায়গা নেই। অজস্র গাড়ী গাদাগাদি। বাস্টার কোনরকমে একটা ফাঁকের মধ্যে নিজের গাড়ী ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

চারজনে গাড়ী থেকে নেমে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগল। এগোতে না

এগোতেই ভিড় এসে তাদের ঘিরে ধরলো। চারদিকে অগণিত নরনারী, শিশু, বালক, তরুণ, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ। কখনও ধাক্কা খেয়ে, কখনও ধাক্কা দিয়ে তারা একটু একটু করে এগোতে লাগল।

পিট এক পা সামনে এগিয়ে থাকলেও ফ্রানসেস তার বাহু ঝাপটে ধরে আছে। ভিড় থেকে ফ্রানসেসকে আগলাচ্ছে সে। বাস্টার চলেছে সবার আগে। সে তার চওড়া কাঁধ দিয়ে বাণ্টিকে রক্ষা করেছে, যেন গায়ের ওপর কোন লোক না এসে পড়ে। বাণ্টি তার শার্ট চেপে ধরেছে।

ছোট ছোট কাঠের ঘর, দু-পাশে সারিবদ্ধ এইসব ঘরে আছে গনৎকার, ফোটোগ্রাফার। কোথাও ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। ওরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে পিট ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। না, মো-কে আর দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেলেছে। সে মনে মনে বলতে লাগল— ঈশ্বর, তাই যেন হয়।

সমুদ্রের একেবারে কাছে এসে পড়লো ওরা। বিরাট নাগরদোলা চারদিকে ঘুরছে। নাগরদোলার ছোট চারটে বাক্সগুলো একবার উঠছে আবার নামছে। যারা চড়ছে, তারা চেঁচামেচি করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে।

বালির ওপরে কাতারে কাতারে লোক বসে আছে। কেউ বা চোখে চশমা এঁটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আবার অনেকে কানের কাছে ট্রানজিসটারে গান শুনছে। এছাড়া চলছে বল খেলা, ডেক টেনিস আর লিপ ফ্রগ। প্রত্যেকের লক্ষ্য সমুদ্র, হাজার হাজার নারী পুরুষ কেউ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অতল তলের দিকে।

—দেখে মনে হয়, শহরের বেশীর ভাগ লোক এখানে এসেছে। বাস্টার বলল, আমরাই যে দেরী করি কেন? চল, এগানো যাক্।

—সাঁতারের পোশাক কি তুমি এনেছ? পিটকে জিজ্ঞাসা করলো ফ্রানসেস।

—আমি সাঁতার কাটব না। পিট উত্তর দিল।

বাণ্টি মুখ বেঁকালো। তার মানে, জলেই যদি না নামো তাহলে এখানে আসার দরকারটা কি?

পিটারের মুখ আর কান গরম হয়ে উঠলো।

—বেশ, ফ্রানসেস বলল, আমরা দু'জনে বালির উপর বসে থাকবো। ওদের সাঁতার দেখব। আমারও সাঁতার কাটতে ভাল লাগছে না।

—না, এটা দৃষ্টিকটু লাগে। ওরা কি মনে করবে। তুমি বরং যাও ওদের সঙ্গে, আমি অপেক্ষা করছি।

—ওকি বলছে? বাস্টার জানতে চাইল।

—ও সাঁতার কাটবে না। উত্তর দিল ফ্রানসেস।

—বেশ তো, ও বরং আমার জামা কাপড়গুলো পাহারা দিক। এসো, নেমে পড়া যাক।

পোশাকের নীচে বাস্টারের সাঁতারের ট্রাঙ্ক পড়ে ছিল। পিট ওর নিরাবরণ শরীরের মোটা শক্ত পেশীগুলো লক্ষ্য করতে লাগল। কি সুন্দর স্বাস্থ্য।

মেয়েরা তাদের ওপরের পোশাক খুলে ফেলল। এখন তাদের পরনে সাঁতারের স্যুট।

ফ্রানসেসের দিকে তাকাতেই কি এক উত্তেজনা অনুভব করলো পিট, বুকের ভিতর পাক খেয়ে গেল। কি আশ্চর্য ওর শরীরের গড়ন? জীবনে সে প্রথম দেখলো। শরীর যে এত নিখুঁতভাবে গড়া যায় তা সে কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি!

মাথায় সাঁতারের টুপি লাগাল ফ্রানসেস, এগিয়ে গেল পিটকে লক্ষ্য করে।

—তোমার একা বসে থাকতে বিশ্রী লাগবে না তো? তাহলে বল, আমি তোমার পাশে বসি, সাঁতার দেখব।

—না না, তুমি যাও। আমি বসছি। আমার ভালোই লাগবে।

—এই ফ্রান্সি, বাণ্টি চেঁচিয়ে উঠলো, এসো না তাড়াতাড়ি।

ফ্রানসেস ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনজনে একসঙ্গে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অবাক কাণ্ড, পিট ভাবল, সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, জীবনে এমন একটা মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। সে বার বার তার মুখের দিকে লক্ষ্য করেছে। সেখানে নেই কোন ঘৃণা, নেই বিতৃষ্ণা, বিরক্তি। পরিবর্তে সর্বদা মিষ্টি মুখে টলমল করছে মধুর হাসি। আশ্চর্য তার মোহিনী দৃষ্টি। পিট কয়েকবার ঢোক গিলল।

—তুমি এ কি খেলা শুরু করেছো?

গম্ভীর রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনে পিট পেছন ফিরে তাকাল।

দেখলো, তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মো। পিট শক্ত হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন নিমেষের জন্য থমকে গেল।

তার পাশে বসলো মো। সমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি, ফ্রানসেসকে দেখার চেষ্টা করছে।

—ওদের সঙ্গে লোকটাই দরজা খুলে দিল। পিট বলল, তারপরে মেয়ে ছুটি এলো। কে একজন আসার কথা ছিল, ওরা চট করে আমাকেই সেই লোক ভেবে নিল। কিছু করবার অবকাশ পেলাম না। যদি কোন সুযোগ মেলে গাঁইতি চালাবার, তাই ওদের সঙ্গে চলে এলাম।

…কিন্তু তুমি লক্ষ্য রেখেছো। এক মুহূর্তের জন্যেও কায়দা করতে পারছি না। সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছি।

—আগে থেকে কিছু না জানলে যা হয়, মো বলল। কিন্তু ওর চোখে সন্দেহ। হতভাগা লুইকে তখনই বলেছিলাম, আগে থেকে কিছু জানা নেই, কাজটা করা সহজ হবে না। মো তার হাতঘড়ি দেখলো। পিট, তোমার আর দেরী করলে চলবে না। এখুনি ওদের বাড়ী পুলিশে ভরে যাবে। মনে রেখো, জল থেকে উঠে এলেই ওকে সাবাড় করতে হবে। যেমন করে পারো।

—এই ভিড়ের মধ্যে ?

মো নাগরদোলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো—ওকে চড়িয়ে নাও দু-জন ছাড়া আর কেউ উঠবে না, প্রয়োজন হলে বেশী পয়সা দেবে। যখন ওপরে উঠবে, তখন সজোরে এক ঘা বসিয়ে দেবে।

পিট কেমন অস্থির বোধ করলো।

—বেশ। সে বলল।

—দেখো, কথার খেলাপ যেন না হয়, হঠাৎ কর্কশ গলায় বলল, যেমন করে হোক ওকে মারতেই হবে। তুমি যদি ব্যর্থ, তবে তোমার কাজটা আমাকেই শেষ করতে হবে। তবে খেয়াল রেখো, ব্যাপারটা তাহলে তোমার পক্ষে শুভ হবে না। সাবধান।

-অত ভাবতে হবে না। আমার কাজ আমিই করবো।

—শুনে খুশী হলাম। মো উঠে দাঁড়াল। আমি আশপাশেই আছি। কিন্তু হাতে আমাদের খুব বেশী সময় নেই। তুমি যদি না পার, তবে আমি—

মো চলে গেল।

—কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। পিট আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, কালো পোশাক, চওড়া কাঁধ লোকটা ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। পিট ওকে

আর দেখতে পেল না। কিন্তু পিট জানে ও বেশীদূর যাবে না, ধারে কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবে, ও কি করছে না করছে।

রোদ্দুরে বালির উপর বসে আছে পিট। বুকের মধ্যে ক্রমশঃ ভয়টা জমাট বাঁধছে। কিন্তু সে বুঝতে পারলো, ফ্রানসেসকে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম যখন সে তাকে দেখে তখন থেকেই এটা সে উপলব্ধি করেছিল।

মো-র উপর এ কাজের দায়িত্ব থাকলে প্রথম দর্শনেই মেয়েটাকে মেয়েটাকে মেরে দিতো, মারবার সুযোগও ছিল যখন সে সিঁড়ির কাছে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাজ সেরে সে অতি সহজেই ফিরে আসতে পারতো। মো অন্ততঃ তাই করতো।

কিন্তু ওর হাসিটাই সব কাজেই বাধার সৃষ্টি করেছিল। ঐ হাসির জোরে ও বেঁচে গেছে। এই যে কাজে অনাগ্রহ, এর পরিণাম কি, সে ভাল করেই জানে। সে ইচ্ছে করেই নিজের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে আসছে। এখানে যে কাজের হুকুম অমান্য করেছে, সে মুক্তি পায় না। এ পর্যন্ত কেউ বেঁচে নেই।

একজন প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল নিউইয়র্ক, একজন মিয়ামি, অন্যজনের দৌড় ছিল মিলাম পর্যন্ত। কিন্তু একজনও নিষ্কৃতি পায়নি মরারের হিংস্র থাবা থেকে।

কিন্তু পিট এখন নিজেকে নিয়ে ভাবছে না। মেয়েটার অল্প বয়স, তার ওপর ভারী সুন্দর দেখতে, মুখে সর্বদা ফুটে আছে মিষ্টি হাসি। ওর মৃত্যুর কথা ভাবতেই পিটের বুকের ভেতর মোচড দিয়ে ওঠে। আঙুল দিয়ে বালিতে আঁক কষতে লাগলো, কেমন করে ওকে বাঁচানো যায়, প্রাণপণে ভাবছে।

যেমন করে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে। তবে হাতে সময় কম। যা করবার এখনই করতে হবে। তার দেরী দেখে মো-ই ওকে শেষ করে দেবে। সে সাহস ওর আছে। সকলের মাঝখানে সে ফ্রানসেসের বুকে অথবা পিঠে ছোরা বসিয়ে দিতে পারে। তারপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে যাবে। মো-র, প্রকৃতি তার জানা। কিছুতেই মো আর অপেক্ষা করবে না।

অবশেষে সে সিদ্ধান্তে এসে হাজির হলো। প্রথমে তার কাজ হলো, ফ্রানসেসকে সাবধান করে দেওয়া। তারপরে ভাবা যাবে মো-র কথা। প্রয়োজন হলে ওকেই খতম করে দেওয়া যাবে আর ফ্রানসেসকে বলবে শহরের বাইরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিতে।

মো-র সম্বন্ধে তাকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। ওর সন্দেহ হয়েছে। রিভলবারে

মো-র হাত খুবই পাকা। আগে ওর সন্দেহটা দূর করতে হবে, যেমন করে হোক। তারপর সুযোগ মত কাজ হাসিল করবে।

তার আগে ফ্রানসেসকে সাবধান করে দিতে হবে। ওকে একটু একা পাওয়া দরকার। ঐ দু'জনের সামনে বলা মানে বিবাদ ডেকে আনা। বাস্টার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকবে। তাহলে মো-কে কিছু করবার সুযোগ পাবে না সে।

স্থির করলো, মো-কে না মারলে কিছুই এগোবে না। সমুদ্রের দিকে তাকাল সে। ওরা জল ছেড়ে তীরে উঠেছে। নিজেকে সম্ভব মত শান্ত করে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল পিট।

*   *   *

লেনক্স এ্যাভিন্যুতে এসে পৌঁছল কালো-সাদা ডোরাকাটা পুলিশের গাড়ীটা। গাড়ী থেকে মুখ বাড়াল কনরাড, বাড়ির নম্বর দেখতে লাগল।

—আর একটু এগিয়ে রাখ গাড়ি। সে বলল বার্ডিনকে।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ী থামল। গাড়ী থেকে নেমে ওরা বাড়ীটা দেখতে লাগল।

কনরাডের হৃৎপিণ্ড একটু জোরে দৌড়তে লাগল। যখন ম্যাকক্যানের কাছ থেকে অফিসে টেলিফোন পেয়েছে যে, ফ্রানসেস ৩৫ নম্বর লেনক্স এ্যাভিন্যুতে থাকে, তখন সে অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্তহীন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

—আরে বাবা, এত উত্তেজিত হবার কি আছে? বার্ডিন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—চল ভেতরে।

ওরা বাগান পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামল। ডানদিকে একতলায় একটি জানালার পর্দা যে নড়ছে, এটা কনরাডের দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতে পারলো না। পর্দার অন্তরালে একটি ছায়ামূর্তি। কনরাডকে সেদিকে তাকাতে দেখে কে যেন চট করে সরে গেল। কনরাড ভারী অবাক হলো।

দরজার পাশেই নামাঙ্কিত ফলক। নির্দিষ্ট নাম দেখে সে বেল বাজালো। তারপর গ্যারেজ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। বার্ডিন তাকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে।

তিনতলায় উঠে এলো ওরা, ফ্রানসেসের ঘরের বন্ধ দরজায় আঘাত করলো কনরাড।

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কোন জবাব পাওয়া গেল না।

এবার একটু জোরে আঘাত করলো কনরাড। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো।

—মনে হচ্ছে না কেউ আছে. বলো এবারে কি করা যাবে? কনরাড প্রশ্ন করলো।

—পরে আসা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বার্ডিন বলল, এমন সুন্দর সকালে কে আর বাড়ি বসে থাকে? তার উপর ছুটির দিন।

অগত্যা নিচে নেমে এলো।

—জানালায় একটা লোক, উঁকি মারছিল। সম্ভবতঃ ও কিছু বলতে পারে।

—কোন্ জানালায়?

—ঢোকবার সময় দেখে গেলাম, ডানদিকে এক তলায় জানালায়।

—তাই নাকি? চল, দেখা যাক্।

তারা কয়েক পা এগিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, কয়েকবার ধাক্কা মারল।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর এক সময় দরজা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালো পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ। কালো ট্রাউজার আর কালো কোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা কেবল বড় বড চোখ দুটি দেখা গেল।

—গুড মর্নিং। আমি কি সাহায্য করতে পারি?

—আমি হলাম পল কনরাড। ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নীর অফিস থেকে আসছি। উনি লেফটেনান্ট বার্ডিন, সিটি পুলিশ। তিনতলায় ওরা কেউ নেই। ওরা কখন আসবে, আপনি কি বলতে পারেন?

পকেট থেকে সিল্কের লাল রুমাল বার করে বৃদ্ধলোকটি নাক ঘষলেন। নীল ভিজে ভিজে চোখে ফুটে উঠছে উত্তেজনা।

—আপনারা মশাই ভেতরে আসুন। তিনি একপাশ হয়ে দাঁড়ালেন। একা থাকি কিনা, তাই ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নেই।

—ধন্যবাদ। কনরাড বলল।

ওরা বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—প্রায় মাস চার-পাঁচেক ঘর পরিষ্কার করা হয়নি। দেওয়ালে তাক্ ধরে হুইস্কির বোতল আর ডজন খানেক ময়লা গ্লাস পড়ে আছে। প্রায় বেশীর ভাগ বোতলই খালি।

—বসুন, দয়া করে আপনারা বসুন। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে শুরু হয়েছে ছন্নছাড়া জীবন। ওহ্! আমি যে কি গভীরভাবে ওর অভাব বোধ করি। তারপর তাক থেকে একটা নতুন বোতল নিয়ে বললেন, আমার নাম কর্নেল নিউম্যান। আপনারা একটু ড্রিঙ্ক করুন।

—ধন্যবাদ, কর্নেল। এখন আমাদের হাতে একদম সময় কম। আপনি মিস কোলম্যানকে কি সকালবেলা বেরিয়ে যেতে দেখেছেন।

—আসলে, আপনারা যদি একটু না খান, তাহলে আমি কি পান করতে পারি? এই বৃদ্ধের এটাই একমাত্র সঙ্গী। গেলাসে মদ ঢেলে নিলেন কর্নেল নিউম্যান। তবে আমি একটু আধটু-ই খাই। বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না, অপকারও হয় না।

—দেখেছেন? কনরাড আবার তার প্রশ্নের সেই ধরে টানলো।

—ও, হ্যাঁ দেখেছি। ওরা একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে গেল। কিন্তু মনে করবেন না, আমার উঁকি মারা স্বভাব আছে। কোন ঝামেলা হয়েছে না কি?

ভদ্রলোকের এমন কৌতূহল লক্ষ্য করে কনরাড মনে মনে বিরক্ত হলো।

—না, ঝামেলা কিছু নয়। তবে মিস কোলম্যানের সঙ্গে আমাদের বিশেষ দরকার আছে। আপনি কি ওর সঙ্গে পরিচিত?

—না। তবে আসতে-যেতে দেখি, এই পর্যন্ত। সুন্দর চেহারা। ওর সঙ্গে পুলিশের কি কি দরকার, মিঃ কনরাড?

—আপনি কি জানেন, ওরা কোথায় গেছে?

—ওরা এ্যামুজমেন্ট পার্কের কথা বলছিল। অন্য মেয়েটি বলছিল সমুদ্রে সাঁতারের কথা।

কনরাড ভুরু কুঞ্চিত করলো। সত্যিই ওরা যদি সমুদ্রে গিয়ে থাকে, তাহলে খুঁজে বার করা অসাধ্য। ওখানে সর্বদা লোক গিজ গিজ করছে।

—ধন্যবাদ, কর্নেল। মনে হচ্ছে বিকেলের দিকে একবার আমরা আসবো।

—ওরা কোন বিপদে পড়েনি তো? ঠিক বলছেন? ওদের পেছন পেছন যে লোকটা যাচ্ছিল, তাকে আমার খুব সুবিধার মনে হল না। স্থির ধারণা, ও কোন গুণ্ডা।

কনরাডের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

—কোন লোকটার কথা বলছেন, কর্নেল?

অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে গেলাসটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখলেন কর্ণেল। তারপর রুমাল নিয়ে মুখ মুছলেন।

—আপনারা কখনই মনে পুষে রাখবেন না, সর্বদা জানালায় দাঁড়িয়ে লোক দেখা আমার অভ্যাস। আমি যখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তখন ওরা যাচ্ছিল। তবে আমি দেখেছি, পেছনের লোকটি গাড়ী নিয়ে এসেছিল। ওরা খানিকটা এগিয়ে যাবার পর পেছনের লোকটা গাড়ীতে উঠে ধীরে ধীরে ওদের পেছনে যেতে লাগল। লোকটার পোশাক-আশাক দেখে আমার সন্দেহ জেগেছে—হলদে চুল, কালো পোশাক।

—মিস কোলম্যানের সঙ্গে আর কে কে ছিল?

—ঐ বন্ধু মেয়েটির, সে তিনতলাতেই থাকে। একটি লম্বা চওড়া গড়নের ছেলে। তার শার্টের প্রান্ত সর্বদা ট্রাউজারের বাইরে আটকে থাকে। যদি একবার ওকে আমার আওতার মধ্যে পেতাম, পোশাক পরা শিখিয়ে দিতাম। আর ঐ উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটা। দেমাকে যেন মাটি ছুঁতে পারে না সে।

... যাক সে সব কথা, আমি ভাবছি ঐ কুৎসিত লোকটার সঙ্গে বেরোলো কি করে। গালে একটা বিশ্রী দাগ। খুব সম্ভব ঐ দাগটার জন্য মিস কোলম্যান ওকে করুণা করেছে। ওরা গ্যারেজ থেকে একটা স্পোর্টস গাড়ি বের করে নিয়ে গেছে। রাস্তায় নেমেই বাঁ দিকে ঐ গ্যারেজটা।

কনরাড আর বার্ডিনের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো। পিটার ওয়াইনার তাদের কাছে অচেনা নয়, অবশ্য ওর কোন পুলিশ রেকর্ড নেই।

—গালে দাগ লোকটাকে চেনেন?

—না, আমি চিনি না। আগে কখনও দেখিও নি। গালে একটা জড়ুল।

—বেঁটে খাটো চেহারা। একটু ছাত্র ছাত্র ভাব? বার্ডিন প্রশ্ন করলো।

—সম্ভবতঃ ছাত্রই হবে।

—আর গাড়ীতে যে বসেছিল? ওটা কি প্যাকার্ড? চওড়া পিঠ, হলদে চুল আর মুখটা সাদা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঐরকম। চেহারায় কেমন একটা বন্য ভাব। আপনারা তাহলে ওকে চেনেন?

—তাহলে আপনার কথামত জানা যাচ্ছে, গালে দাগ লোকটা ওদের তিনজনের সঙ্গে গেল?

—হ্যাঁ।

কনরাড ঘাবড়ে গেল। সে নিঃসন্দেহে বলতে পারে ওরা ত্'জন হল পিটার ওয়াইনার আর মো গ্রেব।

—ধন্যবাদ। ওরা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আপনার অনেক সময় অপচয় করলাম।

—এত তাড়াতাড়ি চললেন? কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। কি ব্যাপার, কিছুই তো জানালেন না?

ততক্ষণে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

রাস্তায় নেমে এলো ত্'জনে।

—রগড়টা দেখেছো? কনরাড বলল, তার মানে আমাদের এখুনি ঘোড়দৌড় দিতে হবে। চল, প্রথমে গ্যারেজে যাই, গাড়ির আকৃতিটা ওরা হয়ত বলতে পারবে। আমি যাচ্ছি এ্যামুজমেণ্ট পার্কে। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। এই মুহূর্তে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন পুলিশ চাই।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? অত লোকের দরকার কি? আমরা তুজন-ই যথেষ্ট।

—কি বলছ স্যাম? কম করেও ওখানে পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়েছে। আর মিস কোলম্যানের পিছনে সরারের তুটি জাঁদরেল গুণ্ডা। ওরা ওখানে কি করতে গেছে? ওদের অভিপ্রায় কি? বুঝতে পারছো না এখনও? ওরা মেয়েটাকে ওখানেই সাবাড় করবে। মনে নেই প্যারেটির পরিণতির কথা? ওরা প্রত্যেকটি সাথীকে নির্মূল করে দেবে। তাই আমাদের যথেষ্ট লোক প্রয়োজন। যা তুমি তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করতে পারো। যেমন করেই হোক মেয়েটাকে ওদের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে।

* * *

বাস্টারের তু'হাত ভর্তি জিনিস—পুতুল, ফুলদানী আর ছোট বড় লজেন্সের বাক্স।

ও চেঁচিয়ে উঠল—এই, দাঁড়াও এক মিনিট। এগুলো গাড়ীতে রেখে আসি। এগুলো হাতে করে নিয়ে হাঁটা যায় না।

—তোমার উচিত হয়নি ওগুলো জেতা, বার্ণি বলল, তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি।

ওরা গাড়ির খোঁজে গেল। এই মুহূর্তে পিটারের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। ফ্রানসেসকে একা পাবার জন্য সে একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে। সে একবার

পেছন ফিরে লক্ষ্য করল, কিছু দূরেই একটা স্টলের আড়ালে মো দাঁড়িয়ে আছে।

"আয়নার ধাঁধা। আপনি কি একা হতে চান। আসুন, আয়নার ধাঁধায় হারিয়ে যান।"

সামনের সাইনবোর্ডটা নজরে পড়লো পিটের।

সে বাস্টারকে বলল—গাড়ী খুঁজে বার করতে অন্ততঃ তোমাদের পনেরো মিনিট লাগবে। ততক্ষণ আমরা আয়নার ধাঁধা দেখি। দরজার সামনে আমরা অপেক্ষা করবো। কি বল ফ্রানসেস? ভেতরে ঢুকলে ভারী মজা। আমার ওর মধ্যে ঢুকবার ভীষণ ইচ্ছা, কিন্তু কখনও সুযোগ হয়নি। যাবে তুমি?

—তুমি কি ক্ষেপেছো? বান্টি বলল। ওখানে ঢুকলে সহজে বেরোতে পারবে না, হারিয়ে যাবে।

—না না, তুমি যা মনে করছ তা নয়। পিট উত্তর দিল, তুমি সর্বদা বাঁ দিকে যেতে থাক, তাহলে ঠিক দশ মিনিটে বেরিয়ে আসতে পারবে। যাবে ফ্রানসেস?

—যাব। ফ্রানসেস উত্তর দিল।

তার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিটারের আগ্রহকে সে নষ্ট করতে চায় না।

বান্টি বলল—বেশ যাও। তবে তোমরা আধঘণ্টা সময় পাবে। যদি এর মধ্যে বেরিয়ে আসতে না পার, তাহলে আমরা আর অপেক্ষা করবে না। বাস্টার চল, আমরা যাই।

ওরা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিট আবার পেছনে লক্ষ্য করল। মো একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ফ্রানসেসকে বলল—আমরা যাই, চল।

—তুমি কি লোকটাকে চেনো? হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ফ্রানসেস।

এরকম প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না পিট। চমকে উঠলো—কোন লোকটা?

—যাকে তুমি মুখ ফিরিয়ে বার বার দেখছো। কালো কোট গায়ে লোকটা তো সকাল থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে।

—তাই বুঝি? এতক্ষণ বলনি কেন? তবে ওকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি, ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

কথা বলতে বলতে ওরা গোলক ধাঁধার টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কাউণ্টার ফাঁকা, পিট টিকিট কাটলো।

—সর্বদা বাঁ দিকে হাঁটবে। কাউণ্টারের ওপাশে বসে থাকা বয়স্কা মহিলা নির্দেশ দিল। তাহলে বেরিয়ে আসবার অসুবিধা হবে না। যদি পথ হারিয়ে ফেলো, ঘণ্টি বাজাবে। দু'দিকেই ঘণ্টা আছে। দু'মিনিটের মধ্যে আমাদের গাইড এসে তোমাদের বাইরে নিয়ে যাবে।

—ধন্যবাদ, পিট বলল।

দু'জনে ভেতরে পা বাড়াল। পিট একবার পেছনে তাকাল, না, মো-কে আর দেখা যাচ্ছে না।

কয়েক পা যেতে না যেতেই ফ্রানসেস বলল—কেবল আটকা আটকা লাগছে, তাই না?

—আর একটু এগোলেই ওপরটা খোলা পাবে।

এক সময়ে দু'জনে গোলক ধাঁধার মধ্যে এসে পড়ল। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে দু'পাশ ঘেরা। দেওয়ালে আয়না লাগানো। মাপে দু'ফুট প্যাসেজ। খুব ভালভাবেই দু'জনে পাশাপাশি হাঁটা যায়। আয়নাগুলো এমনভাবে লাগানো দু'দিকেই নিজের ছায়া দেখা যায়। দু'দিকেই তাদের অসংখ্য মূর্তি, একই সঙ্গে প্রায় চল্লিশটা।

ফ্রানসেস হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ভীত কণ্ঠে বলল—আমার ভীষণ বিশ্রী লাগছে। মনে হয়, এখান থেকে বেরোতে পারব না।

—পারব, পারব। ঘাবড়াবার কিছু নেই। পিট ওকে সাহস যোগাল। সোজা গেলেই তিনটে রাস্তা সামনে পাব, আমরা কিন্তু বাঁ দিকেই যাব। তাহলেই বেরিয়ে যেতে পারব। দশ মিনিট লাগবে।

—বেশ চল। কিন্তু জায়গাটা আমার মনের মত লাগছে না।

পিট ওর হাত ধরে এগোতে লাগলো। মো ওদের পিছু নিতে পারে, তাই পিট মাঝখানে যেতে চায়। যখনই ওরা রাস্তা পাচ্ছে, অমনি বাঁ দিকে মোড় ঘুরছে।

প্রায় মাঝখানে এসে হাজির হয়েছে। মাথার ওপরের খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে পার্কের বিভিন্ন কলরব।

মিনিট দু'তিন কাটলো।

—চল, এবার বেরোনোর চেষ্টা করি। ফ্রানসেস উতলা হয়ে উঠলো। আর ভাল লাগছে না।

পিট দাঁড়াল। পেছনে তাকাল। দু'পাশের দেওয়ালে আয়নায় তার অসংখ্য প্রতিচ্ছবি। গালে দাগওয়ালা কম করেও কুড়িটা মূর্তি। হঠাৎ যেন সে অসুস্থ বোধ করল।

এইটাই তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা! এখন সে ফ্রানসেসকে সব বলবে। হাতে সময় নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ওকে খুলে বলা সহজ নয়। আবার ভাববারও সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে মো এসে পড়তে পারে।

—তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। তাই এখানে তোমায় নিয়ে এসেছি।

ফ্রানসেস চুপ করে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার পিটকে লক্ষ্য করছে।

—কি বলবে?

—যার আসবার কথা ছিল, সেই বার্ট সিভেনস্ আমি নই। আমি হলাম পিটার ওয়াইনার। দেখ, হাতে সময় খুবই অল্প। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, চুপ করে কথাগুলো শোন আর ভয় পেয়ো না।

কিন্তু ফ্রানসেসের চোখে-মুখে তৎক্ষণাৎ দেখা দিল ভয়। পিট সত্যিই দুঃখ পেল। আর বুঝতেও পারল, সম্পূর্ণ একটা অচেনা অপরিচিত লোকের সামনে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, তার ওপর এই গোলক ধাঁধার মধ্যে। কিন্তু পিট মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল।

—তুমি কি বলছো, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ফ্রানসেসের কণ্ঠে জড়তা। একি ঠাট্টা?

—ঠাট্টা হলেই ভাল হত। তবে আমার কথা বলবার আগে এটুকু জেনে রেখো, তোমাকে কোনরকম বিপদে ফেলবো না, কোনমতেই না। তুমি বিশ্বাস কর ফ্রানসেস।

পিটের গায়ের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল ফ্রানসেস।

—তুমি কি বলছ?

—আর সময় নেই। পিটের কথাগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের কোন ক্ষতি হলে আমি পরোয়া করি না। শোন, তোমাকে খুন করার

জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আর ঐ লোকটার উদ্দেশ্যও একই। আমরা একসঙ্গেই এসেছিলাম। লোকটা মারাত্মক।

· জানি, আমার কথাগুলো তোমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কিন্তু আমি বলছি, তোমায় একা পেলেই ও খুন করবে। তাই ওকে হত্যা করে তোমাকে বাঁচাতে চাই। তার আগে তোমাকে পালাতে হবে। সেজন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। শোন ...

ফ্রানসেস ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ওর মনে হল, লোকটা নিশ্চয় পাগল। অনেক উন্মাদ আছে যারা মেয়েদের নির্জন জায়গায় নিয়ে হত্যা করে। এটা খবরের কাগজ পড়েই সে জানতে পেরেছে।

হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়তেই সে পিছু হটতে লাগল। মিনতির ভঙ্গীতে হাত তুলে সে বলল—দোহাই তোমার, তুমি কাছে এসো না। আমাকে ছেড়ে দাও।

ওর এমন অবস্থা দেখে পিট দিশেহারা হয়ে গেল। এরকম যে ঘটবে, সেটা সে প্রথম থেকেই আশঙ্কা করেছিল। ও নিশ্চয়ই ভেবেছে, সে উন্মাদ। ফ্রানসেসের ভীত চোখের চাউনি দেখে তার তাই মনে হল।

—ফ্রাঙ্কি, ভয় পেয়ো না। ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তুমি আমায় বিশ্বাস কর। তোমায় আমি কেবল সাহায্য করতে চাইছি। বুঝবার চেষ্টা কর ফ্রাঙ্কি।

—তুমি যাও। তোমায় আর সাহায্য করতে হবে না। আমি এখান থেকে একাই বেরিয়ে যেতে পারব। তোমার সাহায্য চাই না। যাও তুমি চলে যাও।

—হ্যাঁ, যাব। তার আগে দয়া করে আমার কথা শোন। যে লোকটা আমাদের প্রথম থেকে লক্ষ্য রেখেছে, তোমাকে খুন করবার ভার তার। কি কারণে খুন করা হবে তা আমি জানি না। তবে আমি যদি তাকে বাধা না দিই তাহলে ওর হাতে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। ওরা তোমার একটা ফোটো আমাকে পাঠিয়েছে, তোমায় যেটা দেখাচ্ছি, আশা করি তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করবে।

পিট ফোটো বার করার জন্য বুক-পকেটে হাত ঢুকাল। ফ্রানসেস ভীষণ ভয় পেয়েছে। ও যে কোন মুহূর্তে পালাবার জন্য দৌড় লাগাবে। তাই তাড়াতাড়ি

করে ওটা বার করতে গিয়ে হাতটা গাঁইতির হাতলে আটকে গেল। তার পায়ের কাছে গাঁইতিটা পড়ল।

গাঁইতি নজরে পড়তেই ফ্রানসেসের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল, কাঁপছে, মনে হল যে কোন মুহূর্তে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে।

লোকটি সাংঘাতিক বিপজ্জনক. সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। হয়তো বা পাগল, নয়তো সুস্থ মানুষ জামার নীচে গাঁইতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? এবার সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, কেন লোকটি তাকে আয়নার ধাঁধার মধ্যে নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই ওর বদ মতলব আছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে. যেদিন চোখ যায় সেদিকে ছুটতে শুরু করল।

—ফ্র্যাঙ্কি? দাঁড়াও। যেও না।

ওর ঐ চীৎকার ফ্রানসেসের কানে এসে বাজলো, একটা হিংস্র জন্তুর গর্জনের মত। সে আরও জোরে দৌড়ল, পা তার কাঁপছে।

রাস্তা ঠিক করবার জন্য মাঝে মাঝে বাঁ হাতে আয়না স্পর্শ করছে। সে মোড় ঘুরল। পাগলের মত দৌড়চ্ছে, যেন বাতাসে ভর দিয়ে চলেছে। কোন দিকে হুঁশ নেই, ডাইনে বাঁয়ে যখন যেদিকে পারছে ঘুরছে। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এখুনি হয়তো দম বন্ধ হয়ে যাবে।

কতক্ষণ দৌড়েছে. কতগুলি মোড ঘুরেছে, তার কিছুই খেয়াল নেই। কেবলই মনে হচ্ছে. সে যেন বারে বারে একই জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ক্রমশঃ তার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। আর সে দৌড়তে পারছে না। একসময় আয়নায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, চোখ বন্ধ, হাঁ করে নিঃশ্বাস টানছে।

মুহূর্তখানেক কাটার পর সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। সামনের আয়নার দিকে তাকাল। এমন মুখ সে কখনও দেখেনি, ভয় পাওয়া একটা মুখ। চোখগুলো বড় বড, লাল হয়ে উঠেছে. চুল ঠিক পাখির বাসা!

সে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, বেরোবার রাস্তা কতদূরে, কিছুই জানা ছিল না। পিট কোথায় আছে তাও অনুমান করতে পারল না। সে কী চীৎকার করবে, যদি কেউ এসে পড়ে? হয়তো কাছে পিঠে কোথাও পিট-ই আছে, তার গলার শব্দ শুনে এসে পড়বে। না, সে চীৎকার করবে না।

দু'দিকে আয়নার দিকে একবার তাকাল সে। তারই অসংখ্য প্রতিচ্ছবি তাকে লক্ষ্য করছে। আবার একটা বিশ্রী আকঙ্ক তাকে ঘিরে ধরলো। যদি

সে প্রাণভরে একটু কাঁদতে পারতো, কোন সহৃদয় লোক সেই মুহূর্তে এসে পড়তো।

কিন্তু তখনও সে কাঁদেনি। কোনরকমে সংযত করে রেখেছে চোখের বাঁধভাঙা ঢেউ। মনে পড়ল হঠাৎ সব সময়েই যদি বাঁ দিকে যায় তাহলে বেরোবার রাস্তা পাবে।

তার আর দৌড়বার শক্তি নেই. হাঁটতে শুরু করলো। প্রতি মুহূর্তে দু'দিকে বারে বারে লক্ষ্য করছে সে।

আর একবার তাকাতেই মনে হল কি যেন নড়ছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আবার অস্বাভাবিক গতিতে ছুটতে লাগল।

পেছনে তাকাল, তারই ছায়া-মূর্তি তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

কিন্তু তার সামনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

তার একসঙ্গে কাঁদতে আর চেঁচাতে ইচ্ছে হল. কিন্তু সেগুলো তাল পাকিয়ে গলায় আটকে রইলো। লোকটির চওড়া কাঁধ, পরণে কালো পোশাক, আর সাদা ফ্যাকাশে মুখ।

ঐ লোকটি হল মো।

॥ পাঁচ ॥

এ্যাম্যুজমেণ্ট পার্কে কয়েক হাজার গাড়ীর ভিড়। এর মধ্যে থেকে তিন-সীটের স্পোর্টস গাড়ী খুঁজে বের করা মহা মুশকিল।

কনরাড খুঁজতে লাগল। প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কোন লাভ হল না। হঠাৎ পুলিশ সাইরেন শুনতে পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। বার্ডিন এক গাড়ি পুলিশ নিয়ে আসছে।

হাত নাড়তে নাড়তে কনরাড দৌড়ে গেল।

গাড়ী থেমে গেল। বার্ডিন উঁকি মেরে প্রশ্ন করল—স্পোর্টস গাডী খুঁজে পেয়েছো?

—সাইরেনটা থামাও। কনরাড গর্জে উঠল। ওরা টের পেয়ে যাবে না।

সাইরেন বন্ধ করতে বলে বার্ডিন গাড়ী থেকে নেমে পডল।

—গাড়িটা পেলে?

—আরে বাবা, দশ হাজার গাড়ীর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করা কি চাট্টিখানি কথা? নাও, তোমার লোকেদেব কাজে লাগিয়ে দাও। আর পুলিশ আসছে।

—হ্যাঁ, পেছনে আরও দু'গাড়ী আসছে। ক্যাপ্টেনের কানে গেলে চাঁচাবে।

—আর যদি মেয়েটা মরে যায় তাহলে বড় সাহেব চ্যাঁচাবে দ্বিগুন। ম্যাকক্যান পাগল হয়ে যাবে। তোমার লোকদের জলদি বলে দাও।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও,। বার্ডিন কনরাডের বাহু চেপে ধরলো। দেখ, কে আসছে। আঙ্গুল তুলে দেখাল সে।

একটা লম্বা তাগড়াই চেহারার লোক এগিয়ে আসছে। চুল ছোট করে ছাটা, লাল শার্টের প্রান্ত ট্রাউজারের বাইরে ঝুলছে। দু'হাত ভর্তি পুতুল, ফুলদানী আর গোটা কয়েক লজেন্সের বাক্স, বুকের কাছে ধরে আছে। তার সঙ্গে একটি মেয়ে, লাল চুল, পরণে স্পোর্টস ফ্রক।

—ওরা কি?

—আরে বাবা, ট্রাউজারের ওপর শার্ট ঝুলছে কম করেও দশ হাজার লোক এখানে ঘুরছে—বলল কনরাড, দাঁড়াও জিজ্ঞাসা করে দেখি।

কনরাড এগিয়ে গেল বাস্টার ওয়াকানের কাছে।

—তোমরা কি লেনক্স এ্যাভিন্যু থেকে আসছ ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে ? বাস্টার অবাক হল।

এবার কনরাডের নজর পড়লো বার্টির দিকে—তুমি মিস বয়েড, তাই না ?

—হ্যাঁ।

কনরাডের হাতের ইশারায় বার্ডিন এগিয়ে এল।

—এরা। বার্ডিন তুমি কথা বলবে ?

বার্ডিন ওদেরকে পুলিশ পদক দেখিয়ে বলল—আমি লেফটেনান্ট বার্ডিন, সিটি পুলিশ। মিস কোলম্যান এখন কোথায় ?

—ফ্র্যাঙ্কি ? আপনাদের কি প্রয়োজন ? কি ব্যাপার ?

—যা বলছি চটপট উত্তর দাও। বল, কোথায় সে ?

—এ্যামুজমেন্ট পার্কে তো ছিল।

—ওর সঙ্গে কি কেউ ছিল।

—হ্যাঁ, ওর সাথে বার্ট ছিল।

—বার্ট ? সে কে ?

—বার্ট ষ্টিভেনস। কিন্তু কি দরকার বলবেন তো ?

বার্ডিন এবার কনরাডকে লক্ষ্য করল।

—ষ্টিভেনসের গালে কি একটা দাগ আছে ? বার্ডিনকে প্রশ্ন করলো কনরাড।

—হ্যাঁ, একটা লাল দাগ, গালের ডানদিকে।

—তুমি কি সঠিক জান, ওর নাম ষ্টিভেনস্ ?

—ওটাই তো ওর নাম বলল। আচ্ছা, কোন কি ঝামেলা হয়েছে ?

—ওর নাম ষ্টিভেনস্ কিনা, তুমি সঠিক বলতে পার না ?

—না, বলতে পারব না। এবারে বার্টি উত্তর দিল। যখন ও এলো, একেবারেই আমার পছন্দ হয়নি। আগে থেকেই ঠিক ছিল, এখানে আমরা আসবো। ফ্রাঙ্কি, বাস্টার আর টেরিল্যানসিং।

…হঠাৎ টেরি টেলিফোন করে জানাল, সে বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছে, আসতে পারবে না। তাই বন্ধু বার্টকে পাঠাচ্ছে। এসে হাজির হলো ঐ লোকটা। নাম বলল বার্ট ষ্টিভেনস্।

—মিস কোলম্যানের সঙ্গে কোথায় তোমাদের শেষ দেখা হয়েছে ?

—আয়না ঘরের সামনে। বাস্টার বলল, ওরা আয়না ঘরে যাবে বলছিল।

—আয়না ঘর ?

—আয়নার ধাঁধা। এ্যাভিনুর একেবারে শেষ প্রান্তে। ভেতরে ঢুকলে খানিকটা ঘুরপাক খেতে হয়। কিন্তু আপনারা কি ব্যাপারটা খুলে বলতে পারেন না ?

—এখন বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কনরাড জানাল। তারপর বার্ডিনের দিকে তাকিয়ে বলল—চলো, জলদি। বলেই সে ছুটতে শুরু করল।

বার্ডিন তাড়াতাড়ি পুলিশ সার্জেন্টকে বলল, আয়না ঘর ঘিরে ফেলো। কেউ যেন বেরোতে না পারে। মো-র দিকে নজর রাখবে। আমি জানি ও আয়না ঘরের মধ্যেই আছে, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসবে। কথা শেষ করে সে ছুট দিল।

* * *

সূর্যের আলো বাঁকাভাবে এসে পড়েছে ভেতরে। সেই আলোয় মো-র হাতের নিকেল করা রিভলবারটা চকচক করছে।

ফ্রানসেসকে লক্ষ্য করেই সে রিভলবারটা ধরে আছে। ফ্রানসেস পলকের জন্য চেতনাহীনের মত তাকাল চকচকে অস্ত্রটার দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার অস্থির হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। ওর কালো পোশাক, প্রশস্ত কাঁধ, তার মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল একটা শিরশিরানি। ওর বুঝতে বাকী রইলো না, ঐ লোকটা তাকে খুন করবে, গুলি ছুঁড়বে।

ফ্রানসেস দিশেহারা হয়ে গেল। খাঁচায় বন্ধ ইঁদুরের মত সে অসহায় বোধ করল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। ডানদিকে, প্রায় দশ ফুট দূরে একটা পথ সে দেখতে পেল। ফ্রানসেস লাফ দিল।

ঠিক সেইক্ষণেই মো তার ট্রিগার টিপল।

গুলির শব্দটা চারদিকে খান খান হয়ে গুঁড়িয়ে গেল। ঠিক যেন একটা বোমা বিস্ফোরণ হল। ফ্রানসেসের ডানদিকে একটা আয়না টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল! কাঁচের টুকরোগুলো ছিটকে বেরিয়ে গেল চারদিকে, তার ফ্রকের এক জায়গা ছিঁড়ে গেল।

সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। এরকম দৌড়ানো সে কোনদিন দৌড়ায় নি। সামনে আয়নার পথ, শেষ নেই। পেছন থেকে ভেসে আসছে জুতোর শব্দ। লোকটাও দৌড়চ্ছে। মনে হচ্ছে, তার থেকে দ্বিগুণ গতিতে দৌড়চ্ছে।

ফ্রানসেস যেন বাতাসে ভর করে দৌড়চ্ছে, মাটিতে পা ঠেকছে না। ডান দিকে বাঁক, মোড় ঘুরতেই হুড়মুড় করে পড়লো আয়নার ওপর। মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে টাল সামলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, পারলো না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল সে।

আবার গুলির আওয়াজ। গালের পাশ দিয়ে বুলেট ছুটে গেল, ছিটকে পড়লো আয়নায়। প্রচণ্ড শব্দে আয়না ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। বুলেটটা ধাক্কা পেয়ে অন্য আয়নায় লাগল, সেটাও ভেঙ্গে গেল।

ছোট পথের চারপাশে আয়নার টুকরো ছড়ানো। ফ্রানসেস ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ছুটছে সে, কিন্তু তেমন জোর নেই। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বারে বারে তার কান্না বেরিয়ে আসছে।

ভাঙ্গা কাঁচের কাছে এসে থামল মো। সে জানে, সময় খুব অল্প। এর মধ্যে মেয়েটাকে খুন করতে হবে। এ কাজের ভার তাকেই দেওয়া হয়েছে। যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকেই খুন হতে হবে।

সে সামনে তাকাল। নীল পোশাক পরা মেয়েটি ছুটছে, ওর স্কার্ট চুল উড়ছে। কিন্তু গুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও কি দৌড়তে পারবে। ওর পিঠ লক্ষ্য করে মো রিভলবার তাক করলো। ট্রিগারে চাপ দিল। না, এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়। একদম নির্দিষ্ট পথে ছুটেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড আঘাত এসে লাগল তার কাঁধে, কানে এলো গুলির আওয়াজ। মো কয়েক পা পেছনে হেঁটে ফিরে তাকাল।

হাতে রিভলবার নিয়ে দেওয়ালের ওপর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি যে কে, চিনতে দেরী হলো না তার—ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নীর প্রধান গোয়েন্দা অফিসার। কনরাডই গুলি ছুঁড়েছে বুঝতে পেরে মো মাটিতে শুয়ে পড়ল।

তার ডানদিকের কাঁধ যেন জ্বলে যাচ্ছে। জামার হাতা রক্তে ভিজে গেছে, আঙুলের ফাঁকে রক্ত। মো মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাল। না, মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল সে।

তার থেকে পনেরো গজ দূরে কনরাড। ওখান থেকে দুটো পথ দুদিকে গেছে। কনরাড ওকে চোখে না দেখতে পেলেও বুঝতে পারলো, ও ওখানেই আছে। দু'ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়।

দশ বারোজন পুলিশ দেওয়ালের উপর উঠে এসেছে।

—ঐ যে ওখানে, কনরাড আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

মো উঠে দাঁড়াল, কনরাডকে তাক করে গুলি ছুঁড়লো।

বুলেটটা কনরাডকে স্পর্শ করল না, সাঁ করে তার মুখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথা নীচু করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে কনরাড ভেতরে লাফ দিয়ে পড়লো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মো-কে আর দেখতে পেল না।

কয়েকজন পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল ভেতরে। মো যেখানে উপুড় হয়ে পড়েছিল সেখানে রক্তের দাগ দেখতে পেল কনরাড।

একজন পুলিশ সারজেন্ট তাকে প্রশ্ন করলো—স্যার, আপনার লাগেনি তো?

—না, আমার কিছু হয় নি। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তোমরা ওকে খুঁজে বের কর, দেখ দেখা মেলে কিনা। আর লক্ষ্য রাখবে মেয়েটাকে যদি দেখতে পাও। আর চারদিকে সতর্ক নজর রাখবে।

সারজেন্ট ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেল।

মো দৌড়তে শুরু করল। খানিকটা এগিয়ে সে দাঁড়াল, কোন শব্দ শোনা যায় কিনা, কান খাড়া করে শুনলো। অ: দূরেই আয়নায় ভেসে উঠলো নীল স্কার্টের প্রতিমূর্তি। মো-র ঠোঁটে ফুটে উঠলো পৈশাচিক হাসি।

হঠাৎ লাউডস্পীকারে শোনা গেল—মিস কোলম্যান, যেখানেই থাক, ভাল করে শোন। পুলিশ তোমায় খুঁজছে। তুমি চেঁচাও, তাহলে তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাদের অসুবিধা হবে না। ডাইনে বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। এখনও খুনি আত্মগোপন করে আছে।

পুলিশের কথা শুনতেই ফ্রানসেস একটু আশ্বস্ত হল, সে জোরে নিঃশ্বাস নিল। কিন্তু ভয় তার একটুও কমল না। প্রথম ডানদিকে তাকিয়ে বাঁয়ে তাকাতেই সে চমকে উঠলো।

সেই কালো পোশাক, মাত্র তিরিশ গজ দূরে। হৃৎপিণ্ড তার লাফিয়ে উঠল। আবার লোকটা তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলেছে।

ফ্রানসেস চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল। গুলির শব্দ কানে এসে বিঁধলো। বাহুর ওপরটা যেন তার চিরে গেল। সে যেন মাটিতে ঢলে পড়েছে।

মেয়েটাকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে দেখে মো-র মুখে ফুটে উঠলো যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। কারা যেন ছুটে আসছে তারই দিকে। সেদিকে না তাকিয়ে সে আবার ঐ স্থির দেহটার দিকে গুলি ছুঁড়ল। ফ্রানসেসের মাথায় না লেগে

দু'ইঞ্চি ওপরে কাঁচে এসে লাগলো গুলি। কাঁচ ভেঙে ছিটকে পড়লো চারপাশে; ওর গায়ের ওপর।

মো তার কাছাকাছি-ই একটা শব্দ শুনতে পেল, কে ছুটে আসছে।

রাস্তার মোড় ঘুরে কনরাড দাঁড়াল। পলকের জন্য মো-কে দেখতে পেল। গুলি করার জন্য রিভলবার তাক্ করেছে। কিছুটা দূরে নীল ফ্রক-পরা মেয়েটা পড়ে আছে।

মো গুলি ছুঁড়বার আগেই কনরাড দ্রুত পায়ে এক পা ডানদিকে সরে গেল। ওর মুখের কাছেই আয়নায় লাগল গুলি। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল সে। মো তাকে দেখতে পেয়েছে, রিভলবার তুলল সে। দু'জনের রিভলবার একসঙ্গে গর্জে উঠল।

মো-র গুলি এসে বিঁধলো কনরাডের টুপিতে। ওটা ফুটো হয়ে বেরিয়ে গেল। আর মো-র হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল, বুকের পাশটা আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।

দেওয়াল থেকে লাফিয়ে পড়লো দু'জন পুলিশ, কনরাডের পাশে এসে দাঁড়াল। কনরাড উঠে দাঁড়াল। সাবধান—সে বলল।

ওরা পৌছনোর আগেই মো-র হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাৎ হয়ে পড়ে আছে তার বিরাট দেহখানা। একজন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে তাকে চিৎ করে দিল।

ভয় আর যন্ত্রণা এসে ভিড় করেছে মো-র ফ্যাকাশে মুখে। নিশ্চল দুটি চোখের তারা পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। কোটের সামনেটা রক্তে ভিজে গেছে।

* * *

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্যারাডাইস ক্লাবের একটা সৌখীন স্নানের ঘরে টুলের ওপর বসে আছে ডলোরাস।

তোয়ালে দিয়ে ঘষছে সে গায়ের চামড়া, ফুটে উঠেছে গোলাপী লাল আভা। এখন সে নীচু হয়ে বসে আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করছিল, হাতে তার তুলো।

একটু আগে সে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। এইমাত্র পরিষ্কার জলে স্নান করলো, ধুয়ে গেল গায়ের নোনা জলের পরশ।

মুখে তার ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তা, বাদামী চোখের তারা দুটি অশান্ত। সেখানে রাগ আর উদ্বেগের ছায়া স্পষ্ট।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে জ্যাক মরারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। মরার জানিয়েছে, সে মাছ ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে সেটা এখনও স্থির করেনি। সম্ভবতঃ মাসখানেক কাটাবে।

জানালায় দাঁড়ালে দূরে সমুদ্রের বুকে সাদা বিন্দুর মতো ডলোরাস দেখতে পাবে, জ্যাক মরারের ইয়াট ভেসে চলেছে।

ডলোরাস অনুমান করেছিল, তার স্বামীর এই নিরুদ্দেশের পেছনে একমাত্র কারণ হল জুন আরনটের হত্যা। আর এ প্রস্তাব পেশ করেছে এ্যাবি। জুন আরনটের সঙ্গে মরারের মেলামেশা ছিল, সেটা তার অজানা নয়। ক্রমে জুন যে ওকে গ্রাস করে ফেলেছে এও সে জানে।

জুনের মৃত্যুতে সে এতটুকু স্বস্তি পায়নি। অসুবিধা কি আছে, জুন গেছে, আসবে আরেকজন। ও জানে মরারের সঙ্গে যাবে গ্লোরিয়া লাইল, জনৈকা দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র তারকা, যে মেয়ের স্তন হল সর্বস্ব। এসব খবর সে সংগ্রহ করে, কিন্তু তাকে চুপ করে থাকতেই হবে।

জুনের হত্যা তার মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তারও মাথার উপর ঝুলছে খাঁড়া। মরার ফিরে এলে ডালোরাসের সে আধিপত্য থাকবে না। হয় তাকে তাড়িয়ে দেবে, নতুবা জুনের মত নৃশংসভাবে হত্যা করবে।

মরার সম্বন্ধে তার মনে কোন অবাস্তব কল্পনা জাগে না। সে জানে, তার কাছে স্ত্রীলোক মূল্যহীন, একগ্লাস মদের মত।

বিয়ের পর চার বছর কেটে গেল। আশ্চর্য, মরার তাকে এতদিনে তাড়িয়ে দেয়নি। এর কারণ সে ওকে বিরক্ত হবার সুযোগ দেয়নি, অন্য কোন পুরুষের দিকেও সে তাকায়নি।

মরার যে তাকে আর চায় না, এটা ভালমত বুঝতে পেরেছে ডলোরাস। হয়তো ফিরে এলেই কোন বিশ্বাসী অনুচরের ওপর দায়িত্ব দেবে, তাকে খতম করার। গাড়ি চাপা পড়বে, নতুবা গুলিতে তার মৃত্যু হবে। যে কোন সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাকে মরণ ফাঁদে ফেলতে মরারকে বেগ পেতে হবে না। তার অনেক রকম কায়দা জানা আছে।

হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা নিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে অলসভাবে টানতে লাগল।

ডলোরাস ভয় পেয়েছে, কিন্তু খুব নয়। কিন্তু যদি তাকে বাঁচতে হয়, তাহলে একটা কিছু করা প্রয়োজন। মোটামুটি তার শাণিত বুদ্ধি দিয়ে একটা মতলব

সে বার করেছে। মরারের অনুপস্থিতিতে তার কিছুটা সদ্ব্যবহার সে করতে পারে।

মাত্র আর আধঘণ্টা বাকি। তারপরেই তার ইয়াট নিয়ে ভেসে পড়বে সমুদ্রে।

টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো ডলোরাস, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোমরের পাশ থেকে উরু পর্যন্ত একবার হাত বুলিয়ে নিল। সে তার নিখুঁত সুন্দর দেহের সঙ্গে গ্লোরিয়ার পা আর হাস্যকর স্তনের তুলনা করল। কোন্ গুণে যে মরারের ওকে পছন্দ হল, তা আজ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করতে পারল না। ওর কি গুণ আছে? গলির বেড়ালটারও ওর চেয়ে বেশী গুণ আছে। মরার নিজেও একটা গলির বেড়াল, অন্ধকারে সঙ্গিনী খুঁজে বেড়ানো যার স্বভাব।

ডলোরাস পোশাক পরতে লাগল। ভাবছে ধীরে ধীরে সে বিপদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। একবার ঠিক করেছিল, গয়নাগাটি আর কিছু জামাকাপড় নিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু মরার তাকে খুঁজে বের করবেই, যেখানেই আত্মগোপন করে থাকুক না, তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

পোষাক পরে সে এসে হাজির হল ককটেল বার-এ। একটা উঁচু টুলে গলোউইজ বসেছিল, হাতে তার মার্টিনির গ্লাস। তার ঐ বিরাট পশ্চাৎ দেহ ছোট্ট টুলে ঠিকমত স্থান পাচ্ছে না, ঝুলে পড়েছে বাইরে।

দরজার কাছে এসে ডালোরাস একটু দাঁড়াল। এই সময়ে গলোউইজ তার একমাত্র সহায়। তবু ওর দিকে নজর পড়তেই বিরক্তিতে গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল। তেল চিটচিটে চেহারায় এতবড় ভুঁড়ি। এই লোকটার ওপর কিনা তাকে নির্ভর করতে হবে। যদি ওর চেহারাটা অন্ততঃ সাইগেলের মত হতো, তবু কিছুটা হতো।

অনেক সময় সে ভেবেছে, প্রেমিক হিসাবে সাইগেলকে বেছে নেবে। কয়েকবার সে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু এতে ঝুঁকিটা কতখানি তাও সে মানে। যদি সে সাইগেলকে নেয়, তাহলে তার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে।

গলোউইজ তাকে লক্ষ্য করছে। মার্টিনির গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। গলোউইজ তাকে নিয়ে হাতের পুতুলের মত যেমন খুশী তেমনিভাবে খেলতে পারে। কেবল ও সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছে, যেদিন সে মরারের পরিবর্তে এই প্রতিষ্ঠানের

সর্বেসর্বা হয়ে বসবে। কিন্তু বিপদের সময় তার কি ক্ষমতা হবে, তাকে বাঁচাবার ?

—হ্যালো, এ্যাবি ! সে ডাকল, তার সামনে এগিয়ে এল। ঠোঁটে ফুটে উঠল তার সেই ভুবন ভুলানো বিখ্যাত হাসি। জ্যাক তাহলে গেছে ?

গলোউইজ তাড়াতাড়ি টুল থেকে নেমে পড়ল। মাংস থলথলে মুখটায় হাসি আর ধরে না।

—হ্যাঁ, গেছে। এই মুহূর্তে তার কল্পনা শক্তিতে ভেসে উঠলো ডলোরাসের নগ্ন শরীর। সত্যি, ডলী, তুমি কি সুন্দর দেখতে। তুমি সর্বদা নিজেকে এত সুন্দর করে কিভাবে রাখ ?

ডলোরাস কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাশের টুলে বসে পড়ল।

—কি জানি, সেটা বলতে পারি না। কিন্তু জ্যাক তো অন্ধ। ভাল জিনিস ভোগ করবার মত ক্ষমতা তার নেই।

—লাইল মেয়েটা ওর সঙ্গে গেছে।

বারম্যান তার হাতে এক গেলাস ঠাণ্ডা মার্টিনি তুলে দিল।

— শুনেছি। কিন্তু ও ব্যাপারে মাথা গলানোর আমার কি দরকার বল ?

—এ্যাবি, জ্যাক কি কোন গোলমালে পড়েছে ?

—না না, ওসব কিছু নয়। হঠাৎ ওর কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে হল।

—এ্যাবি, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছো না। আমাকে বলতে আপত্তি কিসের ? তুমিই একমাত্র লোক যাকে আমি বিশ্বাস করি। মুশকিলে পড়েছে ? কোন ঝামেলা ?

গলোউইজ একবার তার প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল চারদিকে। কেউ কাছে পিঠে নাই।

—গোলমালে পড়বার সম্ভাবনা আছে। তাই স্থির করলাম, ওর এখন কিছুদিন অন্য কোথাও গা-ঢাকা দেওয়া নিরাপদ।

—এই কি নাটকের শেষ দৃশ্য ? প্রতিষ্ঠান কি লাটে উঠলো ?

—এসব কথাবার্তা আলোচনা করা বিপজ্জনক, ডলী। তবে এটুকু তোমায় বলতে পারি, কি যে ঘটবে আপাততঃ কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করছি, ব্যবসা-বাণিজ্যে ওর তেমন মন নেই। ওর কথাবার্তায় একদিন বুঝতে পারলাম, ও কেটে পড়বার ধান্দা করছে।

এটা ডলোরাসের কাছে নতুন খবর। ভারি বিস্মিত হলো সে, কিন্তু ওপরে প্রকাশ করলো না।

—জানি, এ ধরনের একটা আভাস আমাকেও একদিন দিয়েছে। আচ্ছা, এটা কি ওর বোকামী নয়?

—বোকামী তো হবেই।

গলার স্বর আস্তে করে সে বলল—যদি জ্যাকের কিছু হয় তাহলে তুমিই তো মালিক, তাই না?

গলোউইজের চোখে-মুখে অশান্তির ছাপ ফুটে উঠল। সেও বিপদের মধ্যে ঝুলে আছে, তবে তার চেয়ে ডলোরাসের অবস্থা আরও খারাপ।

—সব কিছুই নির্ভর করছে সিন্‌ডিকেটের উপর। খুব সম্ভব, ওরা অন্য কারুকে পাঠাতে পারে।

ডলোরাস ঘাড় নাড়ল।

—অসম্ভব। হঠাৎ সে মুখ তুলে তাকাল, তার চোখে আমন্ত্রণের ছাপ সুস্পষ্ট। যদি তুমিই এই প্রতিষ্ঠানের কর্তা হও, তাহলে আমার কি একটু জায়গা হবে না?

ডলোরাস বুঝতে পারল, গলোউইজ উত্তেজনা দমন করতে চাইছে, সে চঞ্চল হতে চায় না।

—যদি দেখা-শোনার ভার আমার উপর পড়ে, তাহলে তোমার কোন ভাবনা নেই, ডলী।

ডলোরাসের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি খেলে গেল।

—কিন্তু এখন যে আমি দুশ্চিন্তায় ভুগছি, এ্যাবি।

গলোউইজ ঘাড় নাড়ল। এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে হল ডলোরাসের নরম হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়, কিন্তু তা সামলে নিল। বারম্যান তাদের লক্ষ্য করছে।

—তা তো ঠিকই; আমারই কি দুশ্চিন্ত কম?

কাছেই কাউন্টারের ওপর টেলিফোন বেজে উঠল।

বারম্যান এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল। অপর প্রান্ত থেকে কথা শুনল। বলল —হ্যাঁ স্যার। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে গলোউইজের দিকে এগিয়ে এলো।

—মিঃ সাইগেল ফোন করেছেন, আপনার সঙ্গে দরকার আছে। আপনার অফিসে উনি অপেক্ষা করছেন। বললেন, ভীষণ প্রয়োজনীয়।

গলোউইজের মুখটা বিরক্তিতে ভরে গেল। এমন কি প্রয়োজনীয় কথা? আর দশ মিনিট অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হত তার? কিন্তু সে নিরুপায়, তাকে যেতেই হবে।

—লোকটার নাক ঝাড়বার সময়েও আমাকে প্রয়োজন। ডলোরাসের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। মিনিট কুড়ি পরে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি কি?

ডলোরাস ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল।

—এ্যাবি, ঠিক হবে না। কারণ গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরছে চারিদিকে। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। এর মধ্যে একদিন লাঞ্চ খাব। আমি সেই দিনটি গুনছি, যেদিন তোমার আর আমার মধ্যে কোন প্রাচীর থাকবে না। গুড বাই।

ডলোরাস চলে গেল, গলোউইজ ঐদিকে তাকিয়ে আছে অপলক নেত্রে। জলজলে চোখ দু'টিতে ভরে উঠেছে কামনার পিপাসা। পাতলা ফ্রকের নিচের নিতম্ব ঘূর্ণনে তার মাথা পাক খেতে লাগল। রীতিমত অসুস্থ বোধ করল সে।

সাইগেল তার অফিসে পায়চারী করছে। গলোউইজ এসে প্রবেশ করলো।

সাইগেলের মুখ ফ্যাকাসে, মুখ থেকে হুইস্কীর গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে— মেয়েটা এখন ওদের হাতে।

গলোউইজ কঠিন হয়ে গেল।

—মানে? কাদের হাতে?

—পুলিশের। ঐ চ্যাংড়া দু'টো সব মাটি করে দিয়েছে।

গলোউইজের মোটা মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের হিম শীতল ঢেউ যেন খেলে গেল। সব নষ্ট হয়ে গেল। যখন জাহাজ টলমল খাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাতে এল হাল ধরার সুযোগ। এখন তার সম্বন্ধে সিনডিকেট কি ভাববে? মরারের পরিবর্তে সে বসবে, ভাবছিল। আর কি সে সুযোগ সে পাবে। তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না, রাগে কাঁপতে লাগল।

—তোমার ওপরেই এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে ছিল জ্যাক। সে গর্জে উঠল। তার মানে মেয়েটা খুব ভালভাবেই পুলিশের হাতে আছে।

গলোউইজের রুদ্র মূর্তি দেখে সাইগেল ভীত হল, এরকম সে কোনদিন দেখেনি। কয়েক পা পেছিয়ে গেল।

কোন গোলমাল হলে মরার যেমন পাগলা হয়ে যায়, এও ঠিক তেমনি। তেমনি উন্মাদ, বিপজ্জনক।

—এ্যামুজমেন্ট পার্কে মো তাকে ঠিক কায়দা করেছিল। কিন্তু শেষ সময়ে পুলিশ হাজির হয়। মো মারা গেছে। আমার ধারণা, পুলিশ যে কোন প্রকারে খবর পেয়ে গেছে।

—মরার তোমাকে আগে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা কিছু করতে পারলে না? এটা কি একটা কথার কথা হল? গলোউইজ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল। রাগে, ভয়ে তার মুখের আকৃতি পাল্টে গেছে, বারে বারে মুঠো পাকাচ্ছে। তুমি কি ম্যাকক্যানের কথাগুলি কান দিয়ে শোন নি? কি হল তোমার সাইগেল?

—মিঃ মরারকে আমি প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বাড়িটা দেখবার সময় পর্যন্ত পাইনি। কি করা যাবে? আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। মেয়েটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। ওরা তার কাছে যাবার ফাঁক পায়নি। এইসব অসুবিধার কথা মিঃ মরারকে জানিয়েছিলাম।

—চুপ! আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর। তোমার ওসব মিথ্যে অছিলা আমি কানে নিতে চাই না। মরারের হুকুম ছিল, ওকে সাবাড় করে দিতে হবে। তুমি তার কথা রাখতে পারো নি।

সাইগেলের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—গ্রেব এবং ওয়াইনার তাদের কাজ করতে পারে নি।

—এর মূলে হলে তুমি। এর জন্য কি কৈফিয়ত দেবে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? আজে বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। যাও, ওর পেছু ধর, যেমন করে পার ওকে কেড়ে নাও, মেরে ফেলো। কেমন করে, কি ভাবে তা আমি জানি না। তবে তোমাকে একাজ করতেই হবে। মেয়েটাকে খুন করতেই হবে।

—কি করে এটা সম্ভব? মেয়েটা এখন ডি এ.-র হেফাজতে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ওখানে যাওয়া অসম্ভব।

গলোউইজ তার রাগ ও ভয় প্রকাশ করতে চাইল না। মনে হল সে মনিবের মত ব্যবহার করছে না। মরার নিশ্চয় এমনভাবে কথাবার্তা বলত না। এই চ্যাচানো ছটপট করা, মাথা গরম করে ফেলা। ভুল যখন হয়েই গেছে, তখন সেটা সংশোধন চেষ্টা তো করতেই হবে। তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করল গলোউইজ। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসল।

—যদি মেয়েটা জ্যাককে আরনটের বাড়ীতে দেখে থাকে তাহলে আমরা শেষ। যেন নিজের মনে কথা বলছে গলোউইজ। আমাদের কিছুই বাকি

থাকবে না, সব শেষ। যাক, ওসব ভেবে মন খারাপ করলে চলবে না। আসল কথা হল, সে কি কিছু দেখেছে? দেখেছে কি দেখেনি—এ নিয়ে তো দোটানার মধ্যে পড়ে থাকা যায় না।

—না, যায় না। কিছু একা করতেই হবে। যেভাবেই হোক ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে ম্যাকক্যানের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

—ম্যাকক্যান? ওর কথা ছেড়ে দাও। নিজেকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। না, নিজেদেরই একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ফন্দি বার করতে হবে। ঠিক কোথায় ও আছে, বলতে পার?

—পুলিশ গাড়ী করে ডি. এ-র অফিসে নিয়ে গেছে। মনে হয়, ঐ বাড়ীর কোনো ঘরেই আছে।

গলোউইজ নীরব, কি যেন ভাবল।

—মো মারা গেছে?

—হ্যাঁ, পুলিশের গুলিতে।

—আর ওয়াইনার?

—ওর কথা বলতে পারব না। এ্যাম্যুজমেন্ট পার্ক থেকে সরে পড়েছে।

—বলতে পারবে না? গলোউইজের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, মুখ রক্তশূন্য।

আবার একই প্রশ্ন করল সে—জান না? কি বলছ তুমি?

—পাওয়া যাবে। লোক পাঠিয়েছি। লাথি মেরে আমি ওর দাঁত কটা ফেলে দেবো।

—না, দেখছি তোমার মাথায় কিছু নেই। একেবারেই কি নিরেট? গলোউইজ আবার কাঁপতে লাগল। যদি মেয়েটা ওকে দেখে থাকে, তাহলে বলবে না ওর আকৃতির কথা? মুখে অমন বিশ্রী লাল দাগ? পুলিশ ওকে চেনে। আর ও পুলিশের হাতেই ধরা পড়বে। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করা অতি সহজ জান তো? আমাদের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে টের পাচ্ছো?

··ওয়াইনার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। আমাদের সবাইকে ধরিয়ে দেবে না? এ কাজের ভার তো তুমিই দিয়েছিলে? খুনের চেষ্টার অপরাধে কি তুমি জড়াবে না? আর ভেবেছো, ওয়াইনার চুপ করে থাকবে। একটা ঘুষি ছুঁড়ল সে শূন্যে।

··যাও, দেখ ওয়াইনারকে ধরতে পারো কিনা। ওকে খুঁজে বার করে সাবাড়

করে দাও। মেয়েটার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। কিন্তু যে ভাবেই হোক ওয়াইনারকে তোমায় সরাতে হবে। তুমি নিজে একাজ করবে।

সাইগেল কেমন যেন অজ্ঞান হয়ে গেল। সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে ঐ চীৎকার আর হাত নাড়া লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, গলোউইজ ঠিক কথাই বলেছে।

—বেশ, আমি নিজে যাচ্ছি। আমিই ওর ব্যবস্থা করছি। বুক পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে একবার দেখে নিল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

কনরাড সমস্ত ঘটনা ডি. এ.-কে শোনাল। সব শুনে ডি. এ-র মুখের আকৃতি পাল্টে গেল। এমন চেহারা কনরাড এই প্রথম দেখল।

—এখন কোথায় মেয়েটা? ফরেস্ট জানতে চাইল।

—এগারো তলায় স্যার। মিস ফিল্ডি, আর একজন নার্স ওর দেখাশুনা করছে। সিঁড়ির কাছে তিনজন পুলিশ পাহারায় আছে। আপাততঃ তার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

—ও কি চোট পেয়েছে?

—সামান্য। কাঁচের টুকরোয় বাহুর চামড়া কেটে গেছে। কিন্তু ভয় পেয়েছে ভীষণ।

—তুমি ওর সঙ্গে কখন কথা বলবে?

—ডক্টর হোমস্ ওর চিকিৎসা করছেন। কথা বলবার সময় হলে উনিই আমাকে জানাবেন।

—বেশ .... ওয়াইনার?

—পুলিশের চোখ এড়িয়ে ও কেমন করে পালাল বোঝা গেল না। চারিদিকে এত হৈ হৈ, ওর দিকে কারুর কোন নজর ছিল না। তবে আমাদের হাতে যত পুলিশ আছে সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুঁজে বার করা হবে।

—মরারের লোকও চুপ করে বসে নেই নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে আমাদের ধরতে হবে। ওর কাছ থেকেই সব রহস্য জানা যাবে। মুখে ওর বিশ্রী দাগ, ঐ মুখ নিয়ে বেশীদূর এগোতে পারবে না। রেডিওতে ওর বিবরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ফরেস্ট রিসিভার তুলে নিল। কিছুক্ষণ পরে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—খবর আছে। ফরেস্ট জানাল। মরার ঘণ্টা দু'য়েক আগে তার ইয়াট নিয়ে কেটে পড়েছে। মাছ ধরতে যাচ্ছে নাকি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে বলে যায় নি।

—দু'চার দিন পালিয়ে বেড়াবে। প্রমাণ পাওয়া গেলে ওকে ধরতে কোন অসুবিধাই হবে না।

—তবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মেয়েটার ওপর। সে যদি ওকে দেখে থাকে।

—ফ্রানসেস কোলম্যানকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। আপনি কি ওর সঙ্গে কথা বলবেন ?

—না, পল তুমিই কথা বল। আমি মেজাজী লোক, হয়তো দেখেই ভীত হয়ে পড়বে।

—যারা দোষী তারাই ভয় পাবে। কনরাড উঠে দাঁড়াল। বিকেলের মধ্যেই আপনার জন্য আমি রিপোর্ট তৈরী করব। একবার ওপরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি।

—ওয়াইনারের খবর পেলেই আমায় জানিও।

—নিশ্চয়ই, স্যার ?

লিফটে গিয়ে দাঁড়াল কনরাড। এগারো তলায় পা দিতেই দেখলো ম্যাকক্যান আর মরিস দরজার দু'পাশে বসে আছে। হাতে তাদের স্টেনগান।

এসব ব্যবস্থা কনরাড ই করেছে, সে আর কারুকে সুযোগ দিচ্ছে না। মরারের সাগরেদরা যে ভাবেই হোক সরাবার চেষ্টা করবে।

—কোন খবর আছে ? কনরাড প্রশ্ন করল ম্যাকক্যানকে।

—ডাক্তার এইমাত্র চলে গেলেন।

কনরাড দরজায় টোকা মারল, য্যাজ এসে দরজা খুলে দিল।

—আপনাকে আমি এইমাত্র খবর দিতে যাচ্ছিলাম। ডাক্তার বলেছেন, এখন আপনি কথা বলতে পারেন।

—কেমন আছে ?

—একটু অস্থির আর কি।

—তা তো হবার কথাই।

—আমি কি থাকব ? ম্যাক্স জানতে চাইল।

—তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। যদি কোন বিবৃতি দেয়, তোমাকে ডাকব।

নার্স এল ভিতরের দরজা খুলে। বলল ওর এখন বেশী কথা বলা চলবে না। ওর এখন যথেষ্ট ঘুমানো দরকার।

—আমি বেশী কথা বলব না।

কনরাড ঘরের ভেতরে পা রাখল।

ফ্রানসেস একটা কাউচের ওপর শুয়েছিল। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। ফ্যাকাশে মুখ, বড় বড় চোখে উদ্বেগ আর ভয়। কনরাডের দিকে তাকাল সে।

কনরাডের হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। গলায় একটা অস্বস্তি বোধ করল সে। ওর ফটো তাকে মুগ্ধ করেছে। সে কি মেয়েটার প্রেমে পড়েছে ? অথচ অবাক কাণ্ড, মেয়েটার সঙ্গে একবর্ণ কথা বলারও সুযোগ পায়নি সে। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল তার কাছে, এই ভালবাসার ব্যাপারটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য সব চিন্তাগুলি এক জায়গায় জড় হয়ে জট পাকিয়ে গেল। কি দিয়ে সে কথা শুরু করবে ভেবে পেল না কনরাড।

ফ্রানসেস তার দিকে একভাবে তাকিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

—আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আশা করি মিস ফিল্ডি' তোমায় জানিয়েছে। আমার নাম পল কনরাড। ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নীর অফিসে বিশেষ তদন্ত অফিসার। তোমার শরীর কেমন আছে, মিস কোলম্যান ?

—ভাল, ধন্যবাদ। ধীর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সে উত্তর দিল—আমি বাড়ী যেতে চাই।

—যাবে, নিশ্চয় যাবে। তোমাকে যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করব। তার আগে তোমার কাছে আমার কিছু জানার আছে। একটা চেয়ার টেনে কনরাড তার পাশে বসল। নার্স বলছিলেন, তোমার এখন যথেষ্ট ঘুম দরকার। তাই বেশী সময় আমি নেব না।

—আমি ঘুমোতে চাই না। বাড়ী যাব।

—আচ্ছা মিস কোলম্যান, তোমার কোন আত্মীয় আছে, যাকে খবর দেওয়া দরকার মনে কর ? সে জানতে পারবে তুমি কোথায় আছ ?

—আমার কোন আত্মীয় নেই।

—কেউ-ই নেই ?

—না।

আচমকা কনরাডের মনে হল, ওর সঙ্গে কথা বলা যতটা সোজা ভেবেছিল, ততটা ঠিক নয়।

—ন' তারিখ সন্ধ্যা সাতটার সময় তুমি জুন আরনটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, তাই না ?

ফ্রানসেস এবার তার দৃষ্টি নামালো। —হ্যাঁ, গিয়েছিলাম ?

—মিস আরনট কি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল ?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি বলবে, কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে।

—আমি—আমি বলতে রাজী নই।

ওর মুখ ক্ষণেকের জন্য লাল হয়ে উঠল। ঘরের চারিদিকে এমনভাবে তাকাল, যেন পালাবার পথ খুঁজছে, চঞ্চল দু'টি চোখের তারা।

—বেশ তো· তুমি যখন বলতে নারাজ, তখন বলতে হবে না। তাহলে জুন আরনটের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ ও তোমার সঙ্গে কথা বলেছে ?

—খুব বেশী হলেও পাঁচ মিনিট।

—আচ্ছ, কেন আমি তোমায় এসব প্রশ্ন করছি, অনুমান করতে পারো ?

—সম্ভবতঃ—খুব সম্ভব জুন আরনটের মৃত্যুর জন্য।

—হ্যাঁ, ওর খুনের জন্য।

ফ্রানসেস একটু জড়সড় হয়ে গেল, ঠোঁট কামড়াল সে। তার এই পরিবর্তন কনরাডের দৃষ্টি এড়াল না।

—মিস আরনটের সঙ্গে কথা শেষ করে তুমি কি করলে ?

—কেন, চলে এলাম।

—সম্পূর্ণ পথ হেঁটে এলে ?

—হ্যাঁ।

কনরাড পকেট থেকে রুমাল বের করল। হাত মুছলো এবারের প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে মরায়ের বাঁচা-মরা।

—তুমি কি আসবার পথে কাউকে দেখতে পেয়েছিলে ?

—না।

কম্বলের একপাশ থেকে তার চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছে। কনরাড কেবল তাকে লক্ষ্য করেছে। ক্রমশঃ সে নিরাশ হয়ে আসছে।

—ঠিক বলছ? ভেবে দেখ কাউকে দেখেছো কিনা?

—না, দেখিনি।

—মিস কোলম্যান, এটা ভীষণ প্রয়োজনীয়, মন দিয়ে শোন। আমার প্রশ্নের উত্তর অত তাড়াহুড়ো করে দেবার দরকার নেই, বেশ ভেবে চিন্তে বল। তুমি জান, জুন আরনটকে খুন করা হয়েছে।

...ন' তারিখ সাতটার কিছু পরে ওকে হত্যা করা হয়েছে। তুমি ঐ সময় ওখানে ছিলে। আমি আশা করছিলাম তুমি হত্যাকারীকে হয়তো দেখে থাকবে। তুমি আবার বল কারুকে তুমি দেখতে পাওনি হত্যার আগে অথবা পরে?

—না।

যদি ফ্রানসেস তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিত, তাহলে হয়তো বা সে তাকে বিশ্বাস করত। কিন্তু যেহেতু তাকাতে পারছে না।—ওর কথা সত্যি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

—তুমি কি গাড়ীতে গিয়েছিলে?

ফ্রানসেস তাকাল, তার চোখে ভয়। সে অনুমান করতে পারছে না এই প্রশ্নে কোন ফাঁদ আছে কিনা।

—আমি হেঁটে গিয়েছিলাম।

—ওর বাড়ি থেকে রাস্তায় কোন লোক তোমার চোখে পড়েছে? গাড়ীতে কি কেউ ছিল?

—না।

—অথচ, যাওয়া আসার রাস্তা তো একটাই। খুনীকে যেতে হবে ঐ পথ দিয়েই! 'ডেভ এণ্ড' এ যাবার অন্য কোন রাস্তা নেই। একটু অদ্ভুত, তাই না? ঐ সময়েই হত্যা করা হয়েছে, আর তুমি কিছু দেখতে পেলে না?

ফ্রানসেস নিরুত্তর। কিন্তু ওর মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে চঞ্চল চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো মনে করছে, কেউ যদি এই সময় এসে পড়ে, তাহলে প্রশ্নোত্তরের ঝামেলাটা বন্ধ হয়।

কনরাডের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল, ফ্রানসেস মিথ্যে বলছে। কিন্তু ওর জন্য দুঃখবোধ না করে পারল না সে। তবু তাকে তো প্রশ্ন করতেই হবে।

—জুন আরনট যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ওর কথার মধ্যে এমন কিছু আভাস পেলে, কেউ আসবার কথা আছে।

—না, এ সম্বন্ধে জুন আমাকে কিছু বলেনি। দয়া করে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। আমি এখন ক্লান্ত। বাড়ি যেতে চাই।

—ঠিক আছে, মিস কোলম্যান, কনরাড ঠোঁটে হাসি ফোটালো, তোমাকে বিরক্ত করলাম। দুঃখিত। এখন তুমি ঘুমোও। আবার কাল কথা হবে।

—আমি আর কথা বলতে চাই না। ফ্রানসেস একটু চেঁচিয়ে বলল, কেউ আমায় বিরক্ত করুক আমি চাই না। আমি ঘুমোতেও চাই না। আমি বাড়ী যেতে চাই।

—বেশ তো, কাল বাড়ী যাবে। যে দু'জন তোমাকে মারবে বলেছিল, তারা একজনও ধরা পড়েনি। তাদের ধরা না পর্যন্ত, তোমার বাইরে যাওয়া বিপজ্জনক।

—ও আমায় মারবে না। ফ্রানসেস এবার সোজা হয়ে বসল। আমি ওকে বিশ্বাস করি, ও আমায় একথা জানিয়েছে। আপনারা আমাকে বৃথাই আটকে রাখছেন। আমাকে আটকে রাখবার কোন অধিকার আপনাদের নেই। আমি চাই না এখানে থাকতে।

ক্রমশঃ তার কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় উঠেছে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কনরাড, ওর প্রেমে-পড়া চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে সে একটু অশান্ত হয়ে উঠল।

গলার শব্দ পেয়ে নার্স তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলো— এখন ওর ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।

কম্বলটা গা থেকে টান মেরে ফেলে দিয়ে ফ্রানসেস কেদারা থেকে মাটিতে নামল।

—আমি এখানে থাকবো না। আমি আপনাদের কথা শুনবো না, আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না। দরজার দিকে সে কয়েক পা হেঁটে গেল।

কনরাড লক্ষ্য করল, ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে, পাণ্ডুর। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ার আগেই কনরাড তাকে ধরে ফেলল।

* * *

রাস্তার পাশেই স্যামের বার। সমুদ্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে আসে যত ডকের কুলি, নাবিক আর বারবনিতার দল। বড় ঘর, নিচু ছাদ, একপাশে পরপর

বুথগুলো সাজানো। বুথের মধ্যে স্যামের খদ্দেররা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলতে পারে। পর্দা ফেলে দিলে তো কেউ দেখতেও পাবে না।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বুথে বসেছে পিট ওয়াইনার। টেবিলের ওপর পড়ে আছে এক বোতল স্কচ আর একটা গেলাস। সিগারেটের টুকরোতে ছাইদানি ভর্তি হয়ে গেছে। কত যে সিগারেট সে ধ্বংস করেছে, গুণে বলতে পারবে না।

সে কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। ভয়ে, আতঙ্কে সে দুর্বল বোধ করছে। অনুশোচনায় ভুগছে সে। যতক্ষণ ফ্রানসেস তার পাশে ছিল, তেমন ভয় সে পায়নি, এখন সে একা। একটা শীতল আতঙ্কে সে মুষড়ে পড়েছে।

পিট জানে, এতক্ষণ তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তায় যখনই বেরোবে, তখনই তাকে ধরা পড়তে হবে। কিন্তু সে তো নিরুপায়, করার কি আছে? পকেটও ধীরে ধীরে গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে। তার ঘরে পাঁচশ ডলার লুকানো আছে, কিন্তু সেখানে যাবার কোন উপায় নেই। ওখানে যাবার কথা সে মনে আনতেই পারে না। ওখানে তো দিনরাত্রি পুলিশের পাহারা থাকবে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে, কিছু দোমড়ানো নোট বার করল। গুনে দেখলো, পনেরো ডলার কয়েক সেণ্ট। সঙ্গে একটা গাড়ী পর্যন্ত নেই। এমন কোন জায়গা তার জানা নেই যেখানে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। আর টাকা ছাড়া সে আরও দুর্বল।

এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল ফ্রানসেসকে। আয়না ঘরে তাকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। ওকে খুঁজতে খুঁজতে সে একসময় বাইরের গেটে এসে হাজির হয়েছিল। সে বেরিয়ে আসতে চায় নি। মো-কে মারা তার উদ্দেশ্য ছিল। তারপর গেটের বাইরে এসে দেখে চারিদিকে অসংখ্য লোক। পুলিশ এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে হৈ-চৈ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল।

গুলির শব্দ শুনেও সে ভিড়ের মধ্যে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল মো ফ্রানসেসকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌছাল, মো-র মৃতদেহ ওরা নিয়ে গেল। ফ্রানসেস গিয়ে উঠলো পুলিশের গাড়ীতে। তারপর সে হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। অবশেষে হাজির হয়েছে এই স্যাম-এর বারে।

হয়তো তার আয়ু মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কারণ রাস্তায় বেরোলেই তো সে শেষ। তার রাস্তায় বেরোনো ছাড়া উপায় কি? এখানে ওরা তাকে কতক্ষণ

থাকতে দেবে? পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিলেও মরারের লোক তাকে ধরবেই। আচমকা সে হয় গাড়ী চাপা পড়বে, নয়তো গুলির ঘায়ে মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক দিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে ঠিক করলো, আর এখানে থাকা যায় না। যদি কোথাও রাত্রি হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতো তাহলে অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো, হয়তো বা সম্ভব হতো। দিনের বেলা গালের এই বিশ্রী দাগ নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়বে।

এক কোণায় সরে বসেছিল পিট, টেবিলে হঠাৎ ছায়া পড়তে তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছিল না। ডান হাতটা টেবিলের ওপর যেমনভাবে পড়েছিল, তেমনিই রইল। নাড়াবার শক্তি যেন তার লোপ পেয়েছে। যদিও তার ইচ্ছা করছিল পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে, কিন্তু পারল না।

একটি অল্প বয়েসের মেয়ে উঁকি মারল, মাথার ওপর চুল জড়ো করা, গায়ে সাদা স্কার্ট। সে হাসল। এই যে—টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকল। তার পুরুষ্ট স্তন দুটি পিটের চোখের ওপর ভাসছে—সঙ্গ চাই?

পিট তখনও তাকে লক্ষ্য করছে, স্থির হতে পারে নি। হল কি তার?

সে কি ভয় পেল? সে কিনা—মেয়েটা আসবার সময় একটুও লক্ষ্য করেনি। যদি ডাচ বা মরারের অন্য কোন সাকরেদ হতো, তাহলে সে তো শেষ হয়ে গিয়েছিল।

—সামনেই আমার ঘর, মেয়েটি আবার বলল, আসবে? কিছুক্ষণ ঠাট্টা তামাসা করা যেতে পারে। মেয়েটি আবার হাসল, সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা গেল। কিন্তু তার চোখে চলছে হিসেব, ছেলেটাকে বোঝবার চেষ্টা।

পিট ভাবল, ওর সঙ্গে গেলে হয়তো তার সুবিধাও হতে পারে। একবার ওর ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারলে অনেকটা বিপদমুক্ত হবে সে। এছাড়া তার পকেটে রিভলবার রয়েছে। কোনরকমে রাত্রি পর্যন্ত ওর ঘরে কাটাতে পারলেই অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া সোজা হবে। কিন্তু ও থাকে কোথায়? কাছে বলতে? কতটা কাছে? হয়তো ওকে নিয়ে যাবার জন্য বলছে, কাছেই ঘর।

—তুমি থাকো কোথায়? পিট যথাসম্ভব চেষ্টা করলো গলার স্বর সহজ রাখার।

—রাস্তার ওপারেই। আসবে, ডারলিং।

—চল। পিট উঠে দাঁড়াল। কাউণ্টারে গিয়ে দাম মিটিয়ে দিল। বারম্যানকে তার দিকে অমনভাবে তাকাতে দেখে পিট ভয় পেল। লম্বা ঘর পেরিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সে, মেয়েটি ততক্ষণে তার বাহু ধরেছে।

—মনে হচ্ছে তুমি একটু ভয় পাচ্ছ? মেয়েটি হাসল। এই প্রথম বুঝি?

পিট নীরব। রাস্তায় রোদ ঝলমল করছে। পিট নিজেকে কেমন নিঃসহায়—সম্বলহীন মনে করলো। এক্ষুণি যে কোনদিক থেকে তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি।

—কোন্ দিকে? সে বার বার ব্যস্ত চোখে তাকাচ্ছে, হয়তো এখুনি কোন চেনা মুখ সামনে এসে দাঁড়াবে।

—ঐ যে ওদিকে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটছিল। তিন ইঞ্চি হীলের জুতোয় ঠিক করে হাঁটা শক্ত।

—আমার ঘর তোমার ভাল লাগবে। রেডিও আছে। যদি পকেট থেকে তেমন কিছু বের করতে পারো—তাহলে তোমার সঙ্গে নাচতে পারি। বন্ধুরা আমার নাচ খুব পছন্দ করে।

বড় রাস্তা থেকে ওরা একটি সরু গলিতে ঢুকলো। দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো নোনা-ধরা বাড়ি।

পিট বার বার পেছনে তাকাচ্ছে। সেরকম কিছু নজরে পড়লেই ছুট দেবে।

—এই যে, এসে গেছি। একটা বাড়ীর কাছেই সে দাঁড়াল। কি বলিনি, কাছেই? ব্যাগ থেকে চাবি হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পিটকে ডাকল—এসো।

ভেতরে পা রেখেই পিট দরজা বন্ধ করে দিল। পিট এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটু স্বাভাবিক হল সে। যাক, রাত্রি পর্যন্ত বাঁচোয়া। মেয়েটা যদি তেমন কিছু ঝামেলা করে তাহলে তো তার রিভলবার আছেই।

দু'জনে হল পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল। মেয়েটিকে অনুসরণ করে পিট হাঁটছে।

দোতলায় উঠে সিঁড়ির কাছে একটা ঘরের সামনে মেয়েটা থামল। দরজায় তালা। সে তার হাতের চাবি ঢুকালো তালার গর্তে। কিন্তু চাবি ঘুরল না। কয়েকবার চেষ্টা করেও মেয়েটা তালা খুলতে পারল না।

—দেখ, কি বিশ্রী কাণ্ড, মেয়েটা বিরক্তি প্রকাশ করল। নিশ্চয়ই চাবির কোন গোলমাল হয়েছে। নিচে হল ঘরের পেছনে বাড়ীওয়ালার অফিস। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি চাবি নিয়ে আসছি।

মেয়েটা ওর বাহুতে আলগা থাপ্পড় মেরে হাসল। তারপর নিচে যাবার জন্য পা বাড়াল।

পকেট থেকে রুমাল বার করে পিট মুখ মুছল। সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াল।

সিগারেট ধরাল সে। তারপর সিঁড়ির রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল।

দেখল মেয়েটি হলঘরের মাঝখানে এসে থামল, কি ভেবে উপরে তাকাল। পিট লক্ষ্য করল, মেয়েটার চোখে- মুখে ফুটে উঠেছে ভয়। তার আর বুঝতে বাকি রইল না, সে ফাঁদে পড়েছে। মেয়েটি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এই বাড়ীতে।

ইস্! কি দারুণ ভুল করে ফেলেছে সে। বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে উঠল।

মরারের দল জানতে পেরেছিল, পিট ঐ বুথের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু অত লোকের মধ্যে তাকে মারতে তারা চায় নি। তাই মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছে; নির্জন বাড়ীতে জানাজানির সম্ভাবনা থাকবে না।

অকস্মাৎ দরজা খোলার পরিষ্কার শব্দ তার কানে এল। সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েটির বন্ধ ঘরের দরজা ভেতর থেকে কে যেন খুলছে। পিট একটুও না ভেবে দরজার ফাঁক তাক্ করে গুলি ছুড়ল।

দরজার পেছনে কেউ যেন আঁৎকে উঠল। তারপরেই একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দ পেল পিট।

পিট আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামতে লাগল। বাইরের দরজায় কাছে এসে দাঁড়াল। একটু ফাঁক করে চোখ রাখল, দেখল মরারের দুই মাইনে করা খুনী এগিয়ে আসছে। গোয়েজ আর কনফরটি।

এক লাফে সে পিছিয়ে গেল কিছুটা। এই মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল। হল পেরিয়ে ছোট দরজা। দরজা ফাঁক করে চোখ রাখতেই দেখল ঐ মেয়েটি দেওয়ালের সঙ্গে লেপ্টে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে দরজা বন্ধ করে বাইরে এল। ওর হাতে রিভলবার দেখে মেয়েটি কুঁকড়ে

গেল। রিভলবারের ঠাণ্ডা নলটা ওর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁতে দাঁত রেখে চিবিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—কোনদিকে বেরোবার পথ? তাড়াতাড়ি।

ততক্ষণে ভিতরের দরজা ঠেলে দুই খুনী হলে ঢুকে পড়েছে।

—চটপট। এক হাতে দরজা ফাঁক করে সে গুলি ছুঁড়ল। গোয়েন্দা বসে পড়ল মাটিতে। মেয়েটি কোন প্রতিবাদ না করে ডানদিকে আঙুল তুলে দেখাল।

পিট সেইদিক লক্ষ্য করে দৌড়ল।

কনফরটি বেরিয়ে, গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরী হল। তার আগেই পিট পেছন ফিরে ট্রিগার টেনেছে।

মুহূর্ত খানেক আগে পরে দু'টি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। কনফর্টির গুলিটা পিটের মাথায় সোয়া ইঞ্চি ওপরের দরজায় গিয়ে লাগল, টুকরো হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল কাঠ। তার গুলিটা কোথায় লাগল, সেটা দেখবার ফুরসত তার নেই।

দরজা ঠেলে বাইরে এসে উঠোনে পা রাখল। তারপর আবার দৌড়। এক লাফে ছোট বেড়াটা পার হয়ে একটা সরু গলিতে পড়ল।

পড়ি কি মরি করে সে দৌড়তে লাগল।

প্রায় একশ গজ ছুটবার পর সামনে বড় রাস্তা দেখতে পেল। গাড়ি আর লোকজন গিজ গিজ করছে।

ঐ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল পিট। রিভলবার রেখে দিল পকেটে। তাড়াতাড়ি হাঁটছে সে, কিন্তু এক মুহূর্ত নিরাপদ বোধ করল না। যে কোন সময়েই ওরা চলন্ত গাড়ী থেকে গুলি ছুড়ে তার পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেবে।

একটা ট্যাক্সী আসতে দেখে হাতের ইশারায় দাঁড়াতে বললো সে।

গাড়ীতে উঠতে বলল—দি পার্ক।

কিন্তু ওঠা তার হল না। তার আগেই বাধা পেল। দু'জন পুলিশ দু'দিক থেকে এসে তার হাত দু'টো জাপটে ধরল।

—পালাবার চেষ্টা করো না ওয়াইনার। একজন পুলিশ বলল, কোন ফল হবে না। জ্যাক, পকেট থেকে রিভলবার বের করে নাও।

জ্যাক অভিজ্ঞ হাতে পিটের বুক পকেট থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিজেরে পকেটে চালান করে দিল।

—এই ট্যাক্সিটাতেই যাওয়া যাক। উঠে পড়, হেডকোয়ার্টার। একটু তাড়াতাড়ি চলো দোস্ত।

পিট আড়চোখে লক্ষ্য করল, একটা বড় কালো গাড়ি ট্যাক্সিকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

হুঁশিয়ার। সে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে ফেলল।

চোখের পলকে মেশিনগান হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। এক ঝাঁক বুলেট এসে আক্রমণ করল ট্যাক্সিটা, দুলতে লাগল এলোমেলো। একজন পুলিশের মুখের অর্ধেকটা উড়ে গেল। বাকি অংশটা হাড়, মাংস, রক্তে বীভৎস হয়ে উঠল। অন্য পুলিশটি পিটের ঘাড়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। গুলির আঘাত থেকে ট্যাক্সির ড্রাইভারও রেহাই পেল না। গাড়ী থেকে ছিটকে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল সে।

রাস্তায় লোক প্রাণভয়ে যে যেদিক পারলো দেড়াতে লাগল। অনেকের গায়ে গুলি লেগেছে। বেশ কিছু লোক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

রাস্তার মোড় ঘুরে কালো গাড়ি উধাও হয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে ট্যাক্সির ভেতর পিটের কাঁধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পুলিশটি মুখ তুলে তাকাল।

—শালা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। তারপর পিটকে টেনে নামাল গাড়ী থেকে।

—জলদি। পিটকে নিয়ে দৌড়ল সে। কয়েক গজ এগিয়ে একটা দোকানের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

—ভেতর, আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দাও। পিট কাতর মিনতি জানায়। ওরা এক্ষুণি আবার গুলি চালাবে বুঝতে পারছ না?

—চুপ কর। পুলিশটা খেঁকিয়ে উঠল। কেউ গুলি চালাবে না।

বলতে বলতে আবার কালো গাড়ির আবির্ভাব হল।

কয়েক মিনিট আগে যারা কালো গাড়ীর কীর্তিকাহিনী জানতে পেরেছে তারা। টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। অনেকে আশ্রয়ের আশায় দোকান লক্ষ্য করে ছুটল।

—ঐ আসছে। বলেই পিট দরজার কোণায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু পুলিশটা কি পাগল হয়ে গেল, কালো গাড়ী লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়তে লাগল। নিমেষের মধ্যে মেশিনগানের গুলিতে সত্যি সত্যিই তার শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ঐ বিশাল দেহ মানুষটার কিছুই বাকি রইল না। সে একটা মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ল পিটের পাশে।

গাড়ীটা থামিয়ে গোয়েজ আর কনফরটি নামলো। ঘাম ঝরছে ওদের গাল

বেয়ে। হাঁ করা মুখে নিঃশব্দ চীৎকার। পিটকে খতম করার দায়িত্ব ওদের ওপর পড়েছে। যেভাবেই হোক, ওরা ওদের কাজ হাসিল করবেই। গাড়ী থেকে ওরা পিটকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, আছে কাছে কোথাও। এর মধ্যেই কি উড়ে যাবে!

গোয়েজের দু-হাতে দুটো রিভলবার, আর কনফরটির হাতে স্টেনগান।

দরজা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল কনফরটি।

পিট নিজেকে আড়াল করার জন্য পুলিশের মৃতদেহটা টেনে নিল। তার মুখে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। মৃতদেহে কয়েকটা গুলি এসে লাগল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কানে ভেসে এলো পুলিশ ভ্যানের সাইরেন। তার হৃৎপিণ্ড আবার নতুন তালে জেগে উঠল।

তারপরেই পুলিশ বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে লাগল।

গোয়েজ ঘুরে তাকালো, দেখলো তিনটে পুলিশ ভ্যান প্রায় তাদের কাছে এসে পড়েছে। রিভলবার তুলল। কিন্তু নিষ্ফল হল তার চেষ্টা। প্রথম পুলিশ ভ্যান থেকে গুলি বিঁধলো তার বুকে আর মাথায়। প্রায় উড়ন্ত তুবড়ির মত সে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। তারপর নিঃশব্দে রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে রইল।

কনফরটি পেছন দিকে আর না তাকিয়ে দোকানের দরজা লক্ষ্য করে ছুটলো।

পিট মৃতদেহের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো, কনফরটির পা দুটো সে দেখতে পেল।

কনফরটিরও নজর এড়াল না। জান্তব হাসিতে তার মুখটা বাঁকা হয়ে গেল। মরা মানুষটার বেল্ট আঁকড়ে তাকে পিটের গা থেকে সরাবার চেষ্টা করল।

—বাঁচাও, পিট প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

কনফরটির স্টেনগানের নলের দিকে তাকিয়ে পিট আঁৎকে উঠল, দু'হাতে মুখ ঢাকাবার চেষ্টা করল। একটা হাত বার করতে পারল না সে।

শোনা গেল পেছন থেকে আসা গুলির আওয়াজ। ট্রিগার থেকে কনফরটির আঙুল আলগা হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল অসহ্য যন্ত্রণা, চোখে আব্‌ছা দেখতে লাগল। এক সময়ে সে অন্ধ হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান, তারপর দুম্ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

পর মুহূর্তেই পুলিশ এসে ভিড় করল পিটের কাছে। সে ধীরে ধীরে মৃতদেহ সরিয়ে উঠে বসল।

॥ ছয় ॥

কনরাড ঘরে ঢুকলো, সারজেণ্ট একটু নড়ে-চড়ে বসলো।

—লেফটেনাণ্ট আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সে জানাল।

—ওয়াইনার কোথায় ?

—তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওয়াইনারের জন্য আমাদের তিনজন ভাল লোক মারা গেল।

কনরাড ওর কথায় উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

পিট রয়েছে লেফটেনাণ্টের ঘরে। ছোট ঘর। তামাক, ঘাম আর ধুলোর গন্ধে ভরপুর। চারদিকে ডিটেকটিভদের ভিড়। পিটের সামনে দাঁড়িয়ে বার্ডিন।

কনরাড দরজার পাশ থেকে লক্ষ্য করল, বার্ডিন পিটের গালে একটা মারাত্মক চড় মারল, কাগজের ঠোঙ্গা ফাটার মত শব্দ হল। পিটের মাথাটা ঘুরে গেল।

তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো বার্ডিনের দিকে, সেখানে নেই কোন ভয়ের চিহ্ন।

—তুমি তাহলে মরারের নাম কোনদিন শোননি। বার্ডিন প্রশ্ন করল— খবরের কাগজ পড় ?

—পড়ি। খেলার খবর।

বাডিন আবার মারবার উপক্রম করতেই বাধা পেল। ততক্ষণে কনরাড এগিয়ে এসেছে। সে বার্ডিনের কব্জি ধরে ফেলল।

—মেরে কোন ফল হবে না, বার্ডিন।

বাডিন রাগে ফেটে পড়ল।

—কাজ হবে না, তাই না ? কিসে হবে জানতে পারি কি ? আমার তিন তিনটি লোক মারা গেছে, হুঁশ আছে ? তাদের বৌ আর বাচ্চা ছিল। মেরে কাজ হবে না—ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করবো ?

—তোমার কাজে বাধা দিলাম, দুঃখিত। কিন্তু ওকে আমার দরকার। পকেট

থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে বার্ডিনের হাতে দিল। নাও, আশা করি এতেই হবে। প্রয়োজন মনে কর তো, আমিও একটা সই করে দিতে পারি।

বার্ডিনের গম্ভীর মুখ রক্তের মত লাল হয়ে উঠল। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল টেবিলে।

—তোমাদের কি দরকার ওকে? বার্ডিনের কণ্ঠস্বর রাগে কাঁপছে। বিছানায় শুইয়ে রেডিও শোনাবে, আর বার বার খাওয়াবে?

কনরাড বার্ডিনের দিকে তাকাল, কোন সাড়া দিল না।

—বেশ, নিয়ে যাও ছুঁচোটাকে। ও মুখ খুলছে না। ও নাকি কিছু জানে না। মরারের নামই এই প্রথম শুনলো। বার্ডিন বলতে থাকে—এ্যামুজমেণ্ট পার্কের আশেপাশে সে ছিল না। ওর বুকের গোটা কতক হাড় ভাঙলে যদি ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয়। তার আগে নয়। তুমি ভেবেছ এমনিতেই হবে; বেশ, চেষ্টা করে দেখ।

—ওকে নিয়ে যাব, দয়া করে আমাকে একটা গাড়ী দাও।

একজন ডিটেকটিভকে গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বলল বার্ডিন। তারপর পিটের দিকে তাকিয়ে বলল—ওয়াইনার, আবার তোমাকে এখানে আসতে হবে। ডি. এ-র তোমাকে প্রয়োজন। তবে মনে করো না, তুমি মুক্তি পেলে। আবার আসছ এখানে, তখন অনেক আরাম ভোগ করতে পারবে। বার্ডিন তাকে আচমকা সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিল। পিট সামলাতে না পেরে চেয়ারশুদ্ধ চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল।

পিট চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগল, অন্ধকার হয়ে এলো চারিদিক, সহজে মাটি থেকে উঠতে পারলো না সে।

কনরাড আর তাকাল না। এক্ষেত্রে বার্ডিনকেও খুব দোষ দেওয়া যায় না।

কারণ একটা তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডাকে বাঁচাবার জন্য তিনজন পুলিশের মৃত্যু কেউই সহ্য করতে পারে না।

পিট কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তখনও সে রীতিমত টলছে। আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সবাই চুপ। কেউ তার নিজের জায়গা থেকে এক পা-ও নড়েনি। সময় চলে যাচ্ছে নীরবে।

পাশের একটা দরজা খুলে একজন ডিটেকটিভ মুখ বাড়াল। বলল—গাড়ী তৈরী, স্যার।

—নিয়ে যাও। বার্ডিন হুঙ্কার দিয়ে উঠল। তবে জেনে রাখো, ওকে আবার আমার চাই।

—পাবে, পাবে। তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেব।

পিট দেওয়াল থেকে সরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে পা বাড়াল দরজার দিকে। তার দু'পাশে যেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ নয়—দৈত্যের দল।

লোহার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মেসিনগান হাতে সশস্ত্র পুলিশ চারিদিকে। সামনে পেছনে মোটর সাইকেলে পুলিশ পাহারাদার।

একজন মানুষরূপী দৈত্য পিটকে ধাক্কা মেরে গাড়ীতে তুলে দিল। বসবার আসনে সে মুখ থুবড়ে পড়ল। তার পেছন পেছন কনরাড উঠল। লোহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে একটা বিরাট বেল্ট এঁটে দিয়ে কনরাড তার পাশেই বসল।

গাড়ী চলতে শুরু করল। সামনে পেছনে একই গতিতে এগিয়ে চলেছে মোটর-সাইকেল।

কনরাড পকেট থেকে সিগারেট বের করে পিটকে দিল, নিজেও নিল। প্রথমে ওরটা ধরিয়ে তারপর নিজের সিগারেট ধরাল।

—কেউ যদি তোমাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তুমি কি করবে ওয়াইনার? শান্ত গলায় প্রশ্ন করল কনরাড।

আপনারা তো আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনবেন, তাতে তো জামিন হয় না।

—মনে কর, তোমাব বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনবো না। তোমার অপরাধ হল, খুনী আর গুণ্ডাদের সঙ্গে মেলামেশা। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে জামিনের ব্যবস্থা হতে পারে।

—আমি জামিন চাই না।

—কেন?

পিট উত্তর দিল না। তার হাতকড়ার দিকে তাকাল, কপালে কিছু কিছু ঘাম জমেছে।

—জামিনে তোমার আপত্তি কেন? ভয় কিসের?

—আমি কথা বলব না।

—কথা বলবেই। কথা তোমাকে বলতেই হবে। তুমি একবার আমার আওতার বাইরে চলে গেলে তোমার মরা বাঁচা নিয়ে আমি চিন্তা করবো না। এটাও স্মরণে রেখো। যদি তুমি মুখ না খোল তাহলে বাঁচাবার চেষ্টা আমি করবো না।

—আমি কিছু জানি না।

—বোকা! তুমি একদম বোকা। মেয়েটা তোমাকে সনাক্ত করবে না ভেবেছ? সেটার কি ব্যবস্থা করবে তুমি? তুমি ওকে হত্যা করতে গিয়েছিলে, তাই না? মরার তোমাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল? পারবে তুমি এটা অস্বীকার করতে?

পিট একটাও কথা বলল না

—তোমাকে কথা বলতেই হবে। হয় আগে নয় পার। সারা জীবন তো আর শূন্যে ঝুলে থাকা যায় না! কথা বল, তোমাকে আমরা বাঁচাবো। কথা না বললে আমরা তোমাকে সোজা রাস্তায় ছেড়ে দেবো। এছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

পিট তবুও নিরুত্তর।

—তোমার উপর আমাদের কোন উৎসাহ নেই। আমাদের লক্ষ্য হল মরার। আমাদের কথামত উত্তর দিলে প্রাণ তোমার যাবে না।

পিট মুখটা একটু ফেরালো।

—আপনারা আমাকে বাঁচবেন? হাসির কথা সত্যি। আপনারা ভেবেছেন আমাকে বাঁচাতে পারবেন? যদি আমি আপনাদের কিছু না বলি, তবু মুক্তি পাবার কিছুটা, সম্ভাবনা আছে। কিছুটা, খুব বেশী নয়। মুখ থেকে কথা বার করলে অপনি ধরে নিতে পারেন আমি মরে গেছি। আপনি আর আপনার সারা পুলিশ বাহিনীও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

—নির্বোধের মত কথা বলো না। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাকে কথা দেব।

পিট কনরাডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

*　　　*　　　*

ভ্যান রোশ অফিসে বসেছিল, কনরাডের সঙ্গে দেখা করবে। সে আসতেই জানতে চাইল—ওকে ধরেছো?

—হ্যাঁ, কনরাড তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল। এগারো তলায় রাখা হয়েছে। তোমাকে বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি ?

—ডি. এ.-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এ্যাবি গলোউইজ। মিস কোলম্যানের মুক্তির জন্য জামিননামা দাখিল করেছে।

কনরাড কঠিন হয়ে গেল।

—বিদ্রূপ করছো ?

ভ্যান রোশ মাথা নাড়ল।

—না, তামাসা করছি না। মিনিট দশেক আগে এসেছে। তোমার জন্য ডি. এ. অপেক্ষা করছে, কোনরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। মিস কোলম্যানের সঙ্গে ও দেখা করতে চায়।

কনরাড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমি এখুনি ডি. এ.-র কাছে যাচ্ছি।

ডি এ.-র অফিসে এসে দরজায় টোকা মেরে ভেতরে ঢুকল কনরাড।

টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছিল ফরেস্ট। টেবিলের ওপর তার হাত দুটি প্রসারিত। গভীর চিন্তায় মগ্ন। উল্টোদিকের চেয়ারে আরামে বসে আছে গলোউইজ।

গলোউইজের দিকে আঙুল তুলে ফরেস্ট বললেন—মিঃ গলোউইজ অপেক্ষা করছেন।

—ডি. এ.-কে এই মাত্র বলছিলাম, গলোউইজ বলল, আমি মিস্ কোলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কারণ ? কনরাড শান্তভাবে বলল।

—ওকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে, এটা আইন বিরুদ্ধ! আমি তার উকিল।

—এটা একটা সুখবর মশাই। মিস কোলম্যানের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হবে, তা কি জানে ? আমি মনে করেছিলাম, একজন তৃতীয় শ্রেণীর বেকার চিত্র-তারকাকে নিয়ে মাথাব্যথা করার সময় আপনার নেই। এর থেকেও বেশী জরুরী কাজ আপনার আছে।

—আমি নরগেট ইউনিয়নের আইন প্রতিনিধি। দরকার হলে যে কোন সভ্যের জন্য চিন্তা করতে হয়। মিস কোলম্যান এই ইউনিয়নের একজন সভ্য।

—ও, এটা তো আগে জানা ছিল না। ফরেস্টের দিকে তাকাল কনরাড।

—উনি এখুনি দেখা করতে চান। ফরেস্ট বললেন।

—নিশ্চয়ই। গলোউইজ জানাল। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। অবশ্য এ কথাটা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না। হাত বাড়িয়ে টেবিলে একটা কাগজের ওপর হালকা করে আঘাত করল। আর কোন বাধা নেই নিশ্চয়ই।

—সে রকমই মনে হচ্ছে। ফরেস্ট বললেন, কনরাডের দিকে তাকিয়ে, তুমি মিস কোলম্যানকে জিজ্ঞেস কর সে দেখা করতে চায় কিনা। আমরা অপেক্ষা করছি।

অফিস থেকে বেরিয়ে গেল কনরাড। ওর বিশ্বাস ফ্রানসেস ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবে। সে কি ওকে সতর্ক করে দেবে? ফ্রানসেস কি তার কথা শুনবে? সে কি বুঝতে পারবে তার বিপদের কথা? গলোউইজ যে কোন প্রকারে তাকে একবার বের করে নিয়ে গেলে আর তার হদিস পাওয়া যাবে না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

নিজের আফিসে ফিরে এল কনরাড।

ভ্যান রোশের দিকে তাকিয়ে সে বলল—ওখান থেকে ছ'টা ছবি আমাকে দাও। তার মধ্যে একটা মরারের ছবি থাকবে।

লোহার আলমারি খুললো ভ্যান রোশ। একটা খামের মধ্যে থেকে ছ'খানি ফটো বের করে কনরাডের হাতে দিল। ছবিগুলি পকেটে রেখে দিল সে।

—তুমি বাইরে থাকবে ভ্যান। আমি ডেকে পাঠানো মাত্রই তুমি ওয়াইনারকে নিয়ে মিস কোলম্যানের ঘরে আসবে।

ভ্যান রোশ একটু ঘাবড়ে গেল।

—কি ব্যাপার?

—দেখি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে আটকায়। আমাদের হাতে সময় কম। চল, ওপরে যাই।

দু'জনে লিফটে পা রাখতেই, মুহূর্তের মধ্যে এসে হাজির হলো এগারো তলায়।

—তুমি ওয়াইনারের ঘরের কাছে অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি।

দরজার দু'পাশে একভাবে বসে আছে জ্যাকসন আর নরিস, কোলের ওপর স্টেনগান।

ম্যাজ দরজা খুলে দিল। ক্লান্তি আর বিরক্তিতে তার মুখ পূর্ণ।

—ঝামেলা করছে নাকি?

—হ্যাঁ, একটু আধটু করছে।

প্রথম ঘর পেছনে ফেলে রেখে কনরাড এসে ঢুকল ফ্রানসেসের ঘরে।

ফ্রানসেস জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। নার্স কনরাডকে দেখে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সামনের দিকে মুখ ফেরাল ফ্রানসেস। তার চোখে ফুটে উঠেছে রাগ, মুখে দেখা দিয়েছে বিরক্তি।

—মিস কোলম্যান, একটু ভাল মনে হচ্ছে ?

—আমি বাড়ি যেতে চাই। কনরাডের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফ্রানসেস চেঁচিয়ে বলল, আপনারা কি কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না ?

—যাবে, বলছি তো যাবে।

সত্যি, রাগলে ফ্রানসেসের মুখটা ভারি সুন্দর দেখায়। ঠিক জেনীর বিপরীত। এই মেয়েটার মনে কোন রাগ নেই।

—আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস কোলম্যান। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমার এখন বাইরে যাওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা।

—আপনাদের তা নিয়ে মাথাব্যথা করতে হবে না। আমারটা আমাকেই ভাবতে দিন।

—তুমি অবুঝ। কনরাড হাসল, মনে করেছিল ফ্রানসেসও হাসবে। কিন্তু না, যেমন গম্ভীর মুখ ছিল, তেমনই রইল। শোন, লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার কথা শোন। ঐ চেয়ারটায় বসো। কয়েকটা কথা তোমার শোনা দরকার। এগুলি শুনেও যদি বাড়ী যাওয়ার জন্য উতলা হও, তাহলে আমি আর আটকাবো না। তোমার ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

ধীরে ধীরে ঐ মুখ থেকে দূরীভূত হলো রাগ, কিন্তু চোখে এসে ভিড় করলো সন্দেহের মেঘ।

—আমি কথা শুনতে চাই না। আমি বাড়ী যেতে চাই। আমাকে যেতে দিন।

—আমরা তোমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করছি। আমি যা বলছি, বোঝার চেষ্টা কর। ঐ লোকটা তোমাকে কেন হত্যা করতে চেয়েছিল ? তোমার ধারণা কি ? তা কি কখনও ভেবেছো ?

এবার সন্দেহের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।

—লোকটা হয়তো···হয়তো পাগল।

—বাস্তবিকই, তোমার ধারণা এই ? বোসো, আমি বেশী সময় নেবো না।

প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল সে, তারপর চেয়ারে বসল। হাঁটুর ওপর রাখলো মুঠো করা হাত দুটো।

—তাহলে জুন আরনটের বাড়ীতে কাকে দেখেছ এখনও মনে করতে পারছ না ?

কনরাড পকেটে বয়ে আনা ছ'খানা ফটো বের করল।

কনরাড ওর মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করল।

—আমি তো আগাগোড়া বলছি, কাউকে দেখিনি। এক কথা কি বারবার বলতে হবে ? আবার কি আপনি নতুন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন ?

—অত অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধর। ফটোগুলো দেখে বলতো, কারুকে চেনো কিনা।

—ফ্রানসেসের এ বিষয়ে এতটুকু আগ্রহ নেই। তবু ফটোগুলো সে নিল। একটার পর একটা ছবি সে দেখল। ওগুলো দেখে চোখ তার চড়কগাছ হয়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেল, শরীর অস্থির বোধ করল।

ছবিগুলো চেয়ারের ওপর রেখে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে, মনে হল হাতে ছ্যাঁকা লেগেছে তার।

—আমাকে এবার ছেড়ে দিন। আমায় দয়া করে বাড়ী যেতে দিন।

কনরাড ছবিগুলি হাতে তুলে নিল। সেও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা ওপরে প্রকাশ করল না। সে যে মরারকে ওখানে দেখেছে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হল।

মরারের একটা ফটো ফ্রানসেসের চোখের সামনে তুলে ধরে কনরাড প্রশ্ন করব—তুমি একে চেন ?

ফোটোর দিকে না তাকিয়েই ফ্রানসেস উত্তর দিল—না।

—জ্যাক মরারের নাম তুমি শুনেছ কখনও ?

—শুনেছি। নানারকম অসৎ উপায়ে যে টাকা রোজগার করে ! কিন্তু আমার এতে কি যায় আসে ?

—মরার সম্বন্ধে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। সত্যি, লোকটার প্রশংসা করতে হবে। আপাততঃ ওর মত শক্তিশালী ব্যক্তি এ অঞ্চলে দ্বিতীয় কেউ নেই। পনেরো বছর বয়েস থেকেই সে কাজ করতে শুরু করে। সে ছিল জেক মরিট্টির বডিগার্ড। এক বছরের মধ্যে খুনের দায়ে তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু

প্রতিবারেই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য কেউ রইল না। মরিস্টির ক্ষমতা যখন ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, তখন সে জেটির সঙ্গে যোগ দিল। তারপর কেটে গেল দশটা বছর। এর মধ্যে কম করেও তিরিশটা খুনের সঙ্গে সে জড়িত ছিল। যখন জেটি জেলে গেল, তখন মরার বিগ জোর্ড বার্নস্টাইনের দলে যোগ দিল।

...কিছুদিন যেতে না যেতেই সে হল সিণ্ডিকেটের অন্যতম কর্তা। সিণ্ডিকেট বোঝ? মহাশক্তিশালী খুনী সম্প্রদায়। সিণ্ডিকেট যার যার জায়গা ভাগ করে দিল। ক্যালিফোর্নিয়ার দায়িত্ব পড়ল মরারের উপর। দশ বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার মত জায়গায় সে কাজের হর্তাকর্তা। যত লেবার মহলে তার আধিপত্য। ইউনিয়নের প্রত্যেকটি সভার কাছ থেকে সে পয়সা পায়। তার পরিবর্তে তারা কিছু পায় না।

...এত বোকা আর মূল্যহীন ব্যবসা। বুঝতে পারছো কিছু? এমন লাভের ব্যবসা আমাদের দেশে আর দেখা যায় না। পাঁচ ডলার ধার নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ করতে ছ'ডলার। তার মানে বিয়াল্লিশ দিনে শতকরা ১২০ টাকা সুদ দিতে হবে। যদি সময় মত কেউ শোধ না করতে পারতো তাহলে তার শাস্তিও ছিল নির্মম। মরারের দু'জন গুণ্ডা তাকে ধরে নিয়ে এসে কষে মার লাগাতো। কি দিয়ে মারতো জান? অস্ত্র ছিল খবরের কাগজে জড়ানো লোহার ডাণ্ডা। যদি দেনাদার টাকা শোধ না করতে পারতো তাহলে তার পিঠ ভেদ করতো বুলেট। ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে তার মৃত্যু ঘটতো।

ফ্রানসেসের শুনতে আর ভাল লাগছে না, সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

...মরার শাসনভার নেওয়ার পর থেকে এখানে তিনশো লোক এ পর্যন্ত খুন হয়েছে। মাত্র দশটি লোককে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। অনেক তদন্তের পর জানা গেছে, ওরা সকলেই মরারের পেশাদার গুণ্ডা আমাদের ফাইলে আছে, মরার রাজা হয়ে বসবার আগে নিজের হাতে তেত্রিশ জনকে খুন করেছে। এখন ও আর নিজে হাতে খুন করে না, খুনের হুকুম দেয় কেবল। তাই ওকে হত্যাকারী হিসাবে কোন প্রমাণ উদ্ধার করতে পারিনি।

...কিন্তু ন'তারিখে ও একটু ভুল কাজ করে ফেলেছে। পনেরো বছরের মধ্যে এই প্রথম সে নিজের হাতে খুন করল।

...জুন ছিল মরারের উপপত্নী। মরার নিজে তাকে হত্যা করেছে। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফল জুন পেয়েছে। অবশ্য সে যে খুনী, তার প্রমাণ

এখনও আমাদের হাতে আসে নি। কিন্তু প্রমাণ আমাদের চাই। এবারে ওকে ধরব। একজন নিষ্ঠুর শক্তিশালী খুনীর আধিপত্য ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দূর করব।

…আমার বিশ্বাস, তুমি ঐ দিন 'ডেভ এণ্ড'-এ মরারকে দেখেছ। তোমার স্বীকারোক্তি পেলে ওকে শাস্তি দিতে আমাদের সুবিধা হবে। মিস কোলম্যান, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া তোমার উচিত। আমি তোমাকে বলছি—

ফ্রানসেস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কয়েক পা পিছু হাঁটল। মুখটা তার ছাইয়ের মত সাদা।

—না, আমি তাকে দেখিনি। বারবার আপনাকে বলছি। আমি সাক্ষী দিতে রাজী নই।

কনরাড ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল।

—তুমি তাহলে কিছু বলবে না?

—না। এবার আমি বাড়ি যাচ্ছি।

—আমি তো তোমাকে আটকে রাখতে পরবো না। তোমায় আমি বলেছি, মরার কি প্রকৃতির লোক। আমি বলছি, তুমি ওকে দেখেছো, কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছো। মরারেরও বিশ্বাস, তুমি তাকে দেখেছ। কেবল তোমার একটি কথায় ওর কোটি কেটি টাকার প্রতিষ্ঠান নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

…তুমি কি ভাবছ, বইরে গেলে তুমি নিরাপদ? ওরা তোমায় জীবিত রাখবে? ওর দুই মাইনে করা গুণ্ডা তোমাকে খুন করতে চেয়েছে। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল, সে যাত্রা বেঁচে গেছো। যদি তুমি আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাও, তাহলে ভেবো না তুমি বাঁচবে। মনে রেখো।

—আপনার কথা আমি মেনে নেবো কেন? অপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, জোর করে আমাকে রাজী করাবেন। আমি কিছুই দেখিনি। আমি আর এক মূহূর্তও এখানে থাকছি না।

কনরাডের ভীষণ রাগ হল, কিন্তু নিজেকে সংযত করল।

—মিস কোলম্যান, আমার অনুরোধ তুমি আর একবার ভালভাবে ভেবে দেখো। ভয় পাবার কিছু নেই। মরারকে ভয় পাচ্ছ তুমি ' কেন তুমি কয়েকটা দিন এখানে থাকতে নারাজ?

—আমার এখানে থাকবার ইচ্ছা নেই। ফ্রানসেস রেগে গিয়ে বলল,

আমাকে নিরাপদে রাখবার প্রয়োজন নেই। ভাবছেন, ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াবেন। তবে জেনে রাখুন, সাক্ষী আমি দিচ্ছি না।

কনরাড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার সামনে এসে ম্যাজকে বলল—ডি এ.-কে টেলিফোন করো। গলোউইজ ওপরে আসতে পারে, জানিয়ে দাও। তারপর আবার ফিরে এলো ফ্রানসেসের কাছে।

ফ্রানসেস ওর কথা শুনতে পেয়েছে। বলল—গলোউইজ? তাহলে আমাকে যেতে—

—নির্বোধ কোথাকার; যা বলছি শোন। কনরাড চেঁচিয়ে উঠল। একজন উকিল এসেছে, নিচে বসে আছে। তার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে দেখা করার। তোমাকে জামিনে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। ওর জামিন নামা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে তুমি যদি ওর সঙ্গে যেতে রাজী না হও, তাহলে জোর করে ও তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না। এখন নির্ভর করছে তোমার উপর।

—আমি একশোবার যাব ওর সঙ্গে। ফ্রানসেসের কণ্ঠস্বর কেমন বেপরোয়া শোনাল।

—ওরে হতভাগা মেয়ে, শোন। তোমাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য একজন উকিল বৃথা কেন কষ্ট করবে, বলতে পারো? চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কনরাড। তার কি স্বার্থ? দরকার কি? সে হল মরারের উকিল, তাই তোমাকে খালাস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করে ছুটে এসেছে।

—আপনি জানলেন কি করে, ও মরারের উকিল? বার্টি বয়েডও তো পাঠাতে পারে? আপনার ইচ্ছা, আমি এখানে বন্দী থাকি, তাই তো? না, আপনার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

দরজায় টোকা পড়ল, ম্যাজ উঁকি দিল।

—মিঃ গলোউইজ।

মুখে তৈলাক্ত হাসি নিয়ে গলোউইজ ঘরে ঢুকল।

—মিস কোলম্যান?

ফ্রানসেস ওকে লক্ষ্য করল। সে গলোউইজকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

—বলুন।

—আমি একজন উকিল। নরগেট ইউনিয়নের তরফ থেকে আসছি। ইউনিয়নের সেক্রেটারী আমার কাছে অভিযোগ করেছে, এরা তোমাকে এখানে

আইন অমান্য করে আটকে রেখেছে। আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে এলে আমি খুশী হব, ইউনিয়নও খুশী হবে।

কনরাড নিঃশব্দে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল। ম্যাজকে ইঙ্গিত করতেই সে কাছে এল।

—ভ্যানকে বলে, কনরাড ফিসফিস করে বলল, ওয়াইনারকে এ ঘরে নিয়ে আসতে।

কনরাড কাছে আসবার আগেই শুনতে পেল ফ্রানসেসের জবাব—আমি এখুনি যেতে পারি?

—অবশ্যই। জানালো গলোউইজ।

—আমি আপনার সঙ্গে যাব না, ধন্যবাদ। আমি একলা যেতে চাই।

—বাড়িই তো যাবে। তোমার দরজা পর্যন্ত তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো। তবেই আমার কাজ শেষ হবে। ইউনিয়নের সঙ্গে আমার এই রকমই কথা হয়েছে। পরে একদিন সময় মত তোমার সেক্রেটারীকে জানিয়ে দেবে আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা আমি পালন করেছি।

—মিঃ গলোউইজ, কনরাড বলল, যাবার আগে আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন। আমাদের আর একজন মক্কেল আছে। আপনি যদি তারও মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। ওয়াইনার, ভেতরে এসো।

দরজাটা খুলে ভ্যান রোশ পিটের পিঠে একটা জোরে ধাক্কা মারল। পিট হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রায় উপুড় হয়ে, নিজেকে সামলাতে বেশ সময় লাগল। তারপর গলোউইজকে লক্ষ্য করে লাফ মারল পেছন দিকে, যেন ভূত দেখেছে।

ফ্রানসেসের মুক্তিনামা বার করতে ব্যস্ত ছিল গলোউইজ। পিটকে নিয়ে চিন্তা করবার ফুরসৎ সে পায়নি। তাছাড়া, সাইগেল বলে গেছে, পিটকে সে ধরবে। কিন্তু হঠাৎ পিটকে ঘরের মধ্যে দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। ওর থ্যাবড়া চোখটা নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল।

—আমাকে এখানে কেন আনা হল? পিট কাৎরে উঠল, সে আরও কয়েক পা পেছিয়ে এল।

গলোউইজের বুঝতে বাকি রইলো না, পিট নিজের কথা সব জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। সে হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রানসেসের দিকে চোখ পড়তেই দেখল, ওর মুখটা ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

—ওয়াইনারকেও মিস কোলম্যানের সঙ্গে নিয়ে যান না? কনরাড

ধীরভাবে বলল। ও আপনার সঙ্গে যাবে কিনা, সেটাই কথা। তবে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

রাগে গলোউইজের চোখ জলজল করে উঠল। ফ্রানসেসকে বলল—চল, নিচে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

—না, ওর সঙ্গে যাবে না। পিট আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ওকে তুমি চেনো না, আমাদের দলের ও। তুমি এখানেই নিরাপদে আছো। ওর সঙ্গে যেয়ো না।

ফ্রানসেসের বাহু ধরে গলোউইজ শান্তভাবে বলল—লোকটা কি পাগল, ঠিক চিনতে পারলাম না। এস মিস কোলম্যান।

ফ্রানসেস কেঁপে উঠল, অজানা আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে গেল।

—না, আমি যাবো না। এখানেই থাকবো। আমি···আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

—নির্বোধের মত কাজ কোরো না মিস কোলম্যান। গলোউইজ নিরুত্তাপ ভাবে বলল।

ফ্রানসেস বুঝল, তাকে সে ভয় দেখাচ্ছে, শাসাচ্ছে। তার রক্ত হিম হয়ে গেল।

—তুমি যাবে কি যাবে না, সেটা আমি শুনতে চাই। গলোউইজের কর্কশ

—উঃ, আপনারা ওঁকে চলে যেতে বলুন। ফ্রানসেস কাৎরে উঠল, দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টা করল। ধপ্ করে বসে পড়ল কাউচে। আমি যাব না, ওকে চলে যেতে বলুন।

অগত্যা গলোউইজ ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এরকম কাণ্ড দেখে সবাই চুপ, কারো মুখে কথা নেই। থমথম করছে ঘরের আবহাওয়া।

*　　　　*　　　　*

নিচের হলঘরে প্রবেশ করেই কনরাড ডাকল—জেনী।

না, কোন ঘরে জেনী নেই। সম্ভবতঃ, সে বাড়ী নেই। আজকাল মাঝে মাঝেই তাকে বাড়ীতে পাওয়া যায় না। না বলে কোথায় যায়। আর কনরাডও জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে না।

—তুমি এসেছে? ওপর থেকে জেনী চেঁচিয়ে বলল।

ওকে বাড়ীতে দেখে কনরাড একটু অবাক হল। দ্রুত পায়ে উঠে এল ওপরে। সোজা এসে ঢুকল শোবার ঘরে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে জেনী বসেছিল। তার পরণে স্বল্পাবরণ—লেস দেওয়া প্যান্টি আর ব্রাসিয়ার। একটা পায়ে কালো নাইলনের মোজা পরছিল।

—এখন সাড়ে ছ'টা বাজেনি, মুখ না তুলেই জেনী বলল, তাড়াতাড়ি ফিরেছ দেখছি।

দরজাটা ভেজিয়ে দিল কনরাড, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই পোশাকে আজকাল জেনীকে দেখতে তার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু একদিন লাগত।

—একটা জরুরী কাজের জন্য আমাকে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে এখুনি রওনা দেব আমি।

—তাই নাকি। আমাকে বোধহয় নিচ্ছ না তোমার সঙ্গে? কোথায় যাচ্ছ, বলবে কি?

জেনী অন্য পায়ে মোজা পরার জন্য তৈরী হল। হঠাৎ তার কি হল। সব চিন্তা যেন জট পাকিয়ে গেল। কয়েকদিন মানে? এক হপ্তা? দশ দিন? সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। লুইকে কি এখানে আসতে বলবে?

—আমার ওপর দু'জন সাক্ষীর দায়িত্ব পড়েছে। মামলা পর্যন্ত ওদের গোপন জায়গায় নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে হবে। ডি. এ.-র আমার ওপর সেই রকমই হুকুম।

জেনীর মোজা পরা হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াল।

—এই কাজের ভার তোমার নেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? তুমি সাক্ষীদের তাঁবেদারী করা কবে থেকে শুরু করলে?

—এই দু'জন সাক্ষীর দাম প্রচুর। বিপদ এদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আমি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাইরে থাকব। হয়তো তোমার একটু অসুবিধা হবে।

—তোমার যদি দরকার হয় তো যাও। করার কি আছে। আমার এতে লাভ লোকসান-ই বা কি? এমনিতেই তো তুমি আজকাল বাড়ী থাকো না কিন্তু যাচ্ছো কোথায় শুনি?

—তোমায় ঠিকানা জানিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু খবরদার; কেউ যেন জানতে না পারে। মুচারস উডের কাছে যাচ্ছি। মনে রেখো, তুমি ছাড়া কেউ যেন জানতে না পারে, মুখ খুলবে না।

—আমি আবার কাকে বলব? তুমি কি বলতে চাও?

—ছাড়, ওসব কথা। বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি তো জান, তোমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। তবে তাদের তুমি বাড়ীতে আনার চেষ্টা করো না, বাইরেই সময় কাটিয়ে আসবে।

—বাড়িতে বসে কে তু'বেলা রান্না করবে, বাসন মাজবে।

আবার ঝগড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কনরাড এখন তর্কাতর্কি করতে চায় না। একটা ছোট্ট কাগজে ঠিকানা লিখে ড্রয়ারে রেখে দিল।

—তোমার ঐ মূল্যবান সাক্ষী তু'জন কে? যদ্দূর মনে হয়, ওর মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও আছে।

—যারা আছে, আছে। তোমাকে তা নিয়ে মাথাব্যথা করতে হবে না। কনরাড তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে কয়েকটা শার্ট, টাই আর ট্রাউজার্স ভরে নিল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু নোট বের করে আনল। টেবিলের ওপর রেখে বলল, টাকা রইল। আশা করি, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এতে চলবে।

জেনী ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে ব্যস্ত। আর ভাবছিল, লুইকে এখানে আসতে বলবে কিনা। তাহলে ভীষণ ঝুঁকি নেওয়া হবে। আর পাড়ার লোকেদের চোখ থেকেও তাকে আড়াল করতে পারবে না বরং তার বাড়িতে নিজে যাওয়া ভাল।

আবার সে উত্তেজিত বোধ করল। লুই যেন একটা হিংস্র পশু। ওর আদরটাও জান্তব, কেমন যেন স্বার্থপর। সীমাহীন তার লালসা। জেনীর পরে মনে হয়েছে, তার দেহের ওপরে একটু আগে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে। তবু সে আবার উতলা হয়ে উঠেছে, তার পেশীবহুল বাহুডোরে নিজেকে ধরা দেবার জন্য।

কনরাডের ব্যাগ গোছানো শেষ।

—যাবার সময় হল। কনরাড বলল—তুমি বরং বেথকে বলতে পারো, কয়েকটা দিন তোমার সঙ্গে এসে যেন থাকে। তোমাকে একলা ফেলে যেতে স্বস্তি পাচ্ছি না।

—ধন্যবাদ ডার্লিং। তোমার এই তুশ্চিন্তার জন্য আমি মর্মাহত। দিনের মধ্যে পনেরো ঘণ্টা তুমি থাকো না। একাই থাকি। আজ হঠাৎ ভাবতে বসলে? একা থাকার মেয়াদ কয়েক ঘণ্টা বাড়ল, এই যা।

—জেনী, চুপ কর। প্রতিটি কথায় তোমার খোঁচা মারা স্বভাব। আমি বাইরে যাচ্ছি কাজের জন্য, বেড়াতে নয়, তা তুমি ভালমতই জান।

—তাহলে তো বুচারসে উঠে কোন মেয়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে থাকলে বেশ একটা নতুন স্বাদ পাবে, তাই না?

কনরাডের মুখে ফুটে উঠল অনন্ত বিরক্তি, তাকাল ওর দিকে।

—চলি তাহলে। ব্যাগটা হাতে তুলে নিল কনরাড।

—এসো। বসে বসেই বলল জেনী।

—নিচের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। এই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছিল জেনী, এবার সে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে এলো। দেখলো, কনরাড গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ীটা দেখা গেল না। জেনী একভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দুই বাহু আবদ্ধ করে চোখ বন্ধ করল। অস্ফুটে গলা থেকে বেরিয়ে এলো—উঃ, কি আরাম!

চারদিন চার রাত্রি, জেনী একা, সে মুক্ত—ভাবতেই পারছে না সে।

এবার সে ছুটল টেলিফোনের কাছে।

প্যারাডাইস ক্লাবের নম্বর ডায়াল করলো, সে অনুভব করলো, তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—দয়া করে মিঃ সাইগেলকে ডেকে দেবেন?

—আপনার নাম?

—মিঃ সাইগেলকে আমার ফোন করার কথা ছিল। আপনি ওকে ডেকে দিন।

জেনী তার নাম রিসেপশনিস্টকে জানাতে চায় না।

—ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে সাইগেলের গলা শোনা গেল—কে? গলার স্বরে মনে হল, সে খুব ব্যস্ত। তার সঙ্গে প্রকাশ পেল বেশ কিছুটা উষ্মা।

—লুই? আমি জেনী।

—ও! হ্যালো! কি খবর?

তার গলার স্বরে কোন উৎসাহের লক্ষণ না পেয়ে জেনী খুব আঘাত পেল।

—আমার ফোন পেয়ে তুমি বোধহয় খুশী হচ্ছো না।

—আমি একটু ব্যস্ত আছি। বল, কি বলবে?

—ও বাইরে গেল। দু'তিনদিন আমি একাই থাকবো। তাই তুমি যদি—

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। জেনী বুঝতে পারল, লুই ভাবছে।

—ঠিক আছে। হঠাৎ উত্তর দিল লুই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে নেই এতটুকু অন্তরঙ্গতা। চলে এস।

—ক্লাবে?

—হ্যাঁ, চলে এসো। দু'জনে বসে ডিনার খাওয়া যাবে।

—আমার মনে হয়, ক্লাবে যাওয়া উচিত হবে না। তার চেয়ে তোমার বাড়ীতে গেলে কেমন হয়?

—না, তুমি ক্লাবেই এসো। ন'টার সময়। তার আগে আমার সময় হবে না। এখন ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

জেনী ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল। লুইয়ের কথায় নেই হৃদ্যতা, জেনী বুঝল। না হোক গে! তাতে তার কি। সে যে নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে তাতেই বা কি ক্ষতি। লুই-এর ঐ জান্তব লালসা তাকে মুগ্ধ করেছে। সে শুধু ওর ক'দিন, নির্মম বাহুডোরে পিষ্ট হতে চায়। রাস্তার স্ত্রীলোকদের যেমন ভাবে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনটি সে চায়। এই অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। জেনী এটাই চায়। সব সময়।

* * *

সাইগেল অস্থির পায়ে তার অফিসের দিকে গেল। শুকনো গম্ভীর মুখ। তিনদিন আগে নাকি তার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সই হয়েছে, এটা সে জানতে পেরেছে। ম্যাকক্যান তাকে জানিয়েছে। বলেছে, পুলিশ ধরতে আসবার আগে তাকে জানিয়ে দেবে।

কিন্তু ম্যাকক্যানের টেলিফোন এখনও পর্যন্ত এল না। তার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। এছাড়া সে আরও উতলা হয়ে উঠেছে, কারণ তার হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে গলোউইজ। বলেছিল মেয়েটার ব্যবস্থা সে করবে। কিন্তু কি ব্যবস্থা করেছে? কিছু না। বাজে কথা।

মেয়েটা আর ওয়াইনার—দু'জনেই আছে ডি. এ.-র অধীনে। সম্ভবতঃ, ওরা এতক্ষণে সব ফাঁস করে দিয়েছে, কিছু বাদ দেয়নি। একবার সে স্থির করেছিল, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিউইয়র্ক পালাবে। কিন্তু গলোউইজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, যেন কোথাও সে না পালায়। তাহলে তার সিনডিকেটের হাত থেকে রক্ষা নেই।

—এত উতলা হবার মত এখনও কিছু ঘটেনি। গলোউইজ বলেছিল, ঠিক সময়ে ম্যাক খবর দেবে। ফরেস্ট যখন যা কিছু করুক না কেন, আমাদের অজানা থাকে না। সাইগেল, তুমি সময় পাবে, চঞ্চল হয়ো না।

দরজা খুলেই দাঁড়াল সে। টেবিলের ওপাশে তার চেয়ারে বসে আছে গলোউইজ।

—আপনি আমার ঘরে? কি দরকার?

—অপেক্ষা করছি।

গত তিন দিন ধরে তার দেহের উপর দিয়ে ঝক্কি-ঝামেলা বয়ে গেছে তার পরিষ্কার ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। চোখের কোণে কালি পড়েছে গালের মাংস যেন আরও ঝুলে পড়েছে। গলোউইজ তার আইনের বিধি-নিয়ম অনুযায়ী বুঝতে পেরেছে, তাদের এবার ধ্বংস অনিবার্য। একটা মাত্র পথ আছে, ওদের দু'জনের সাক্ষী দেওয়া যদি বন্ধ করা যায়। যেমন করে, যেভাবেই হোক ওদের মুখ বন্ধ করতেই হবে।

সাইগেলকে এ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে ব্যর্থ হল। যে দু'জন লোক সে লাগিয়েছিল, তাদের মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। যত সব গোমূর্খ। গলোউইজ সিনডিকেটের শরণাপন্ন হয়েছে। সে তার অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। তাদের সাহায্যের দরকার।

—অপেক্ষা? কিসের অপেক্ষা? সাইগেল বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

গলোউইজ তার হাতঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য করল।

—ফেরারির আসার সময় হয়ে গেছে। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি। যে কোন সময় ও এসে পড়তে পারে।

সাইগেলের মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠল, মুখটা শক্ত হয়ে উঠল।

—ফেরারি? সে আবার কে?

—ভিটো ফেরারি।

সাইগেল ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, প্রাণপণ শক্তিতে হাতল আঁকড়ে ধরল।

—ভিটো ফেরারি এখানে আসছে?

—হ্যাঁ।

—কেন? কি মতলবে আসছে? ও কি এখানে মরতে আসছে?

—আমার কথাতেই সে আসছে।

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সাইগেল।

—আপনি কি পাগল হলেন? ফেরারিকে আসতে বলেছেন? কেন?

—এমন বিশৃঙ্খলাকে ঠিক পথে আনতে পারবে কে? কার শক্তিতে কুলোবে? টেবিলের ওপরে মোটা হাত দুটো প্রসারিত করল গলোউইজ। তুমি? তুমি কি কিছু করতে পারবে? কি মনে হয়?

—কিন্তু ফেরারি—

—ওরা দু'জন যদি সাক্ষী দেয়, তাহলে আমরা আর বাঁচতে পারবো না। ওদের সাবাড় করে দিতে হবে। তোমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমিও আমার কাজ সফল করতে পারি নি। আমরা দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছি। তাই সিনডিকেটের শরণাপন্ন হয়ে ফেরারিকে আসতে বলেছি।

—মিঃ মরারের এতে কি মত? জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো একবার ভিজিয়ে নিল সাইগেল। তার এলাকায় সিনডিকেট মাথা গলাক, এটা একেবারেই মরার পছন্দ করবেন না।

—মরার তো সরে পড়েছে। থাকলে, সে-ই যা করবার করতো। কিন্তু এখন আমাকেই সব দিকে নজর রাখতে হবে, সামলাতে হবে তাই না? এই কাজ একজনকে দিয়েই সম্পন্ন করা যায়, সে হল ভিটো ফেরারি।

ভিটো ফেরারির নাম শুনা মাত্র সাইগেলের চোখ ওপরে উঠেছিল। এখন তার আরও ভয় হল। বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। সিনডিকেটের মাইনে করা খুনী ভিটো। ওর ভয়ঙ্কর সব খুনের প্রায় অলৌকিক কাহিনী সে অনেকদিন থেকেই শুনে আসছে। ফেরারীকে প্যাসিফিক সিটিতে আসতে বলা মানে মৃত্যুর দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করে আনা।

—ওকে না আনলেও চলতো। তুমি যদি কাজ দেখাতে পারতে, ওকে ডাকবার কোন দরকার ছিল না।

সাইগেল কি বলতে গিয়ে বাধা পেল। দরজায় কে যেন টোকা দিল। বুক হঠাৎ ধড়াস করে উঠল।

—এসো, গলোউইজ বলে উঠল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডাচ। বোকা চেহারা।

—একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডাচ জানাল।

—পাঠিয়ে দাও। গলোউইজ বলল।

চেয়ারের পিঠ ধরে সাইগেল দাঁড়িয়েছিল। হৃৎপিণ্ড সমানে লাফাচ্ছে, যেন

কোন পাখি খাঁচা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটপট করছে। সে ফেরারির নাম অনেকবার শুনেছে। কিন্তু কখনও তাকে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। ভেবেছিল, বিশাল দেহী এক দুর্দান্ত মানুষ।

কিন্তু সাইগেলের ধারণাকে মিথ্যে করে দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলো এক বামনাকার লোক। সাইগেল রীতিমতো অবাক হল। এই বেঁটে, এক ফোঁটা লোকের নামে সবাই কিনা ভয় পায়, কাঁপে।

ফেরারি লম্বায় পাঁচ ফুটের চেয়ে কিছু কম। তার শরীরে মাংসের চিহ্ন নেই। কেবল হাড় আর অস্থিময় কঙ্কালসার চেহারা। গায়ে তার কালো পোশাক, যেন পুতুলের গায়ে জামা পরিয়ে দোকানের শো কেসে সাজানো হয়েছে।

কিন্তু তার হাঁটার গতিকে প্রশংসা করতে হয়। তার পা দুটো যেন মাটিতে ঠেকছে না, শব্দহীন গতিতে হাওয়ায় ভেসে এল। লোকটাকে দেখে সাইগেলের মনে হল, এ মানুষ নয়, প্রেত। তার কপালটা চোখে পড়ার মত, মুখের চেয়ে চওড়া। নাকটা টিয়া পাখীর মত বাঁকা, গাল সরু হয়ে নেমে এসেছে। পাতলা ঠোঁট দুটো নজরেই পড়ে না। হলদে টান টান চামড়ায় মুখের আর মাথার হাড়গুলি ফুটে উঠছে।

গলোউইজ আর সাইগেল হঠাৎ ওকে দেখে সম্মোহিত চোখে তাকিয়ে রইল, দু'জনেই ভয় পেয়েছে, মুখে কারো কথা নেই।

টুপী খুলে ফেলল ফেরারি, টেবিলের উপর রাখল। মাথা ভর্তি কালো চুল, খুব পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কানের পাশে কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে। সাইগেল যে চেয়ারে বসেছিল, সেটাতে বসল সে।

—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তাই তো? ফেরারি জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বর নরম হলেও স্পষ্ট। সাইগেলের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমপ্রস্রবন বয়ে গেল।

গলোউইজ তার ভয় ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে।

—তোমায় দেখে খুব খুশী হলাম। সে বলল, বিগ জো-কে আমি ধন্যবাদ জানাব।

—যাদের ব্যবস্থা করতে হবে, তারা কোথায়?

—বুচারস উড-এ ওদের আটকে রাখা হয়েছে। এই একটু আগে ম্যাকক্যান তাকে খবরটা দিয়েছে। ড্রয়ার খুলে একটা হাতেআঁকা নক্সা বের করে ফেরারীকে দিল।

ফেরারি ভাঁজ খুলে না দেখেই পকেটে চালান করে দিল।

—ওদের কি ভাবে হত্যা করব? ফেরারি জানতে চাইল।

—তোমার যেমন ভাবে ইচ্ছা। গলোউইজ বলল, তবে একটা কথা জেনে রাখা ভাল, মৃত্যুগুলো হবে ঠিক আকস্মিক দুর্ঘটনার মৃত্যুর মত।

—কোথায় দুর্ঘটনা হবে?

—তার আগে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন কিভাবে মারা হবে। ফেরারির ঔদ্ধত্য তার অসহ্য লাগছে। কাজটা কি এতই সোজা„ তাহলে তোমাকে ডেকে আনার দরকার কি ছিল। ওকে দিন রাত্রি সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কাছে যাবার ক্ষমতা নেই। পুলিশের কুকুর আছে, আর আছে চারিদিকে সার্চ লাইট, একটি পুলিশ বাহিনী।

...ওখানে প্রবেশ করার পথ একটাই। এছাড়া আছে গুলি চালানাতে ওস্তাদ ছ'জন বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ। মিস কোলম্যানকে কখনই কাছ ছাড়া করে না দুটি মেয়ে ডিটেকটিভ। রাত্রে ওর ঘরে শোয়। তুমি ওদের কখন মারবে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, কীভাবে মারবে।

ফেরারি তার একটা রোগা আঙুল দিয়ে নাক চুলকাতে লাগল। গলোউইজকে সে এমনভাবে দেখতে লাগল, যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বীজানু পরীক্ষা করছে।

—আমি জানতে চাইছি, ওদের কখন মারা হবে?

—তাড়াতাড়ি হলেই ভাল। এটা আবার বলার কি আছে? গলোউইজ উত্তর দিল।

—আচ্ছা। প্রথমে ম্যাপটা দেখে নি। তারপর জায়গাটা ঘুরে দেখে এসে জানাবো তারিখটা। সম্ভবতঃ, দু-তিন দিনের বেশী লাগবে না।

—দু-দিন দু'জনকে মারবে? সাইগেল বলল, অসম্ভব, তাই না?

—দু'দিনে দু'জন যাবে না, ঠিক। তবে দু'দিনে একজনের লাস পড়বেই। দু'দিনে দু'জনকে সাবাড় করা যেত যদি তোমরা ওদের মৃত্যু দুর্ঘটনা বলে প্রকাশ করতে না চাইতে। দু'টো লোক একই দিনে মরলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে ওরা খুন হয়েছে, যদি একবার খবরের কাগজ-ওয়ালারা সন্দেহ করে তাহলে এমন হৈ-চৈ করবে এ নিয়ে তখন আমরা বিপদে পড়তে পারি। এই সময় নতুন করে কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।

—বেশ। তাহলে ঐ কথাই হল। একজন মরছে দু'দিনের মধ্যে। আর অন্য জনের কথা পরে চিন্তা করা যাবে কি করা যায়।

—কিছু মনে কো না, আমার কেমন সন্দেহ জাগছে, গলোউইজ বলল,

তোমাকে ডাকবার আগে আমরা এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোন মতলব আবিষ্কার করতে পারিনি। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এক্ষুণি কাজটা হয়ে গেছে। অথচ তুমি জায়গাটা চোখেও দেখনি।

ফেরারি তার অভ্যাসবশতঃ আবার নাকে আঙুল দিয়ে চুলকাল।

—আমি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, আর তোমরা হলে নতুন। তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে কি হবে, সেই বুদ্ধিই তোমাদের নেই। তোমরা নিজেরা নিজেদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছো। আগেই তোমরা স্থির করেছো, এ কাজ তোমাদের পক্ষে করা অসম্ভব।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গলোউইজ। হাঁটুর ওপর হাত তুলে আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়াল। সাইগেলের মনে হল, লোকটা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে সে দুর্বল বোধ করছে, তবুও না তাকিয়ে পারছে না।

—আমি যখন কাজে নামি, ফেরারি বলতে থাকে, পূর্ণ বিশ্বাস থাকে আমার মনে। সর্বদা আমি সফল হয়েছি, এবারে হব। এর চেয়ে অনেক শক্ত কাজ আমাকে করতে হয়েছে।

—এটাও কঠিন কাজ, সাইগেল বলল, দু'জনের কথা বাদ দিলাম। একজনকে মারতে পারলেই, বুঝতে হবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

ফেরারি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁত বের করে হাসল। ওর ক্ষয়ে যাওয়া হলদে দাঁতগুলো দেখা গেল।

—এর সঙ্গে ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে করে কাজ করলে আমাকে দিয়ে কিছু হতো না। তবে সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখতে পারো, ওরা দু'জনেই মরবে। আমার কথা কখনও মূল্যহীন হয় না। তবে এ কথা বলছি না, আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। অপেক্ষা করলেই সব প্রমাণ পেয়ে যাব।

…তবে স্মরণে রেখো, আমি যাকে মারবো বলে স্থির করি, তার মৃত্যু অনিবার্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে বলেছি, আবার বলছি, কোন কাজে বিফল হয়নি, আর হবোও না।

ওর কথা শুনে গলোউইজের কেমন শরীর অস্থির লাগল, বমি বমি লাগলো। দেহের স্নায়ুগুলো সেদিন থেকে তার সজাগ আছে যেদিন ওদের দু'জনকে পুলিশ ডি. এ.-র কাছে নিয়ে গেছে। এই লোকটার সামনে বসে তার চিন্তাধারা তালগোল পাকিয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল এই বামন তাকে মিথ্যা বলছে না। তার রাজত্ব একমাত্র ফেরারিই বাঁচাতে পারবে, এ বিশ্বাস জন্মাল তার মনে।

॥ সাত ॥

—এসো, পল। কনরাডকে ঘরের মধ্যে ডাকলেন ফরেস্ট।

পল ভেতরে ঢুকলো।

—কি খবর? বোসো। আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

কনরাড একটা চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট বের করতে করতে সে বলল, ওষুধ ধরেছে। ওয়াইনার মুখ খুলেছে।

ফরেস্ট মাথা নাড়লেন।

—হুঁ, আমিও ঐরকম আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু আমরা একদম বোকা বনে যেতাম, যদি ও জামিনে চলে যেতে রাজী হত। তবে আমার ধারণা, ওরা বাইরে যেতে ভয় পায়। আর মেয়েটা?

—মেয়েটা প্রতিজ্ঞা করতে পারে, সে ডেভ এণ্ড'-এ কাউকে দেখেনি, এখন বলছে। তবে বাড়ি যেতে আর চাইছে না। অবশেষে মাথায় ঢুকেছে, এখানে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

পকেট থেকে একটা চুরুট বার করলো ফরেস্ট—ওয়াইনারের মতামত কি?

—মিস কোলম্যানকে হত্যা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করেছে। সাইগেলের কাছ থেকে হত্যার হুকুম পেয়েছিল। এ ছাড়া আর একটা কথাও বলছে না। সাইগেল তার মনিব। মরারকে সে জানে না, চেনে না। ও মিথ্যে কথা বলছে। তবে খুব সম্ভব ওর আসল কথা বের করা যাবে। আমাদের চাই মরারকে, সাইগেলকে ধরে কোন লাভ নেই।

ফরেস্ট মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ছাইদানীতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কনরাড।

—আসলে, ওয়াইনারের দৃঢ় বিশ্বাস, আজ হোক, কাল হোক, ওরা তাকে খুন করবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। অথচ আমরা এত করে বোঝাচ্ছি, সে আমাদের কাছে নিরাপদ, কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না, কে কার কথা শোনে। যদি একবার তার মনে ঢুকানো যেতো, সেটা সম্ভব নয়, তাহলে সব কথা বের করা হয়তো সহজ হতো।

—ও কি সত্যিই নিরাপদ, পল ?

—হ্যাঁ। নিরাপত্তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারোর পক্ষে এখানে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই ঐ জায়গাটা ঠিক করেছি। আপে পাশে যে আত্ম-গোপন করে থাকবে সেরকম সুবিধা নেই। বাড়ীর পেছনে রয়েছে দু'শ ফুট উঁচু পাহাড়, কিন্তু ঐ পাহাড় বেয়ে মানুষ কেন একটা মাছির পক্ষেও বেয়ে ওঠা অসম্ভব।

·· এছাড়া পাহাড়ের চারপাশে মাঝে মাঝে অস্ত্রধারী পাহারাদার টহল দিচ্ছে। মিস্ কোলম্যান আর ওয়াইনারকে নিমেষের জন্যও একলা থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। যদ্দিন এখানে ওরা আছে, ততদিন নিরাপদ, কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

—এত রকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওয়াইনার ভাবছে, সে নিরাপদ নয় ?

—বাস্তবিকই পুলিশের কাছে কথা বলে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায় নি। মরারের লম্বা থাবা এসে তাকে আক্রমণ করবেই। একবার যে কোন প্রকারে ওর মন থেকে এই ধারণা দূর করতে পারি, তাহলে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। কিন্তু আপাততঃ সে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

—আমি ওকে সম্পূর্ণভাবে দোষী বলতে পারি না। ফরেস্ট বললেন। মরার সম্বন্ধে ওর যা ধারণা,সেটা ঠিক। ভয় পাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। ও একটা সাধারণ মানুষ। যতই গুণ্ডামি, মস্তানি করুক না কেন, ভয় সে পাবেই।

—সেটা ঠিক। কিন্তু আমি সব রকমের ব্যবস্থাই করেছি। ওখানে অনেক বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ লোকও হাজির আছে। আর প্রত্যেক দুজন দুজন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ একা নেই। এদের প্রত্যেককে দেখা শুনার ভার দেওয়া হয়েছে সার্জেন্ট ও'ব্রায়ামের উপর। ওকে নিশ্চয় জানেন কেমন লোক। ওর তীক্ষ্ণ চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।

—হ্যাঁ, জানি আমি ও'ব্রায়ামকে, তৃতীয় শ্রেণীর লোক। আচ্ছা, যদি কেউ এদের মধ্যে থেকে ছুটি চায় ?

—প্রত্যেককে বলে দিয়েছি, এ কাজে কেউ ছুটি পাবে না। এদের মধ্যে তিনজন বাইরে যেতে পারবে—ভ্যান রোশ, ও'ব্রায়াম আর আমি।

—বেশ ভাল। আমি কাল পরশু যাব, দেখে আসব সব।

—হ্যাঁ, আসবেন। যদি সেরকমই দরকার কিছু বোঝেন, তাহলে সে ব্যবস্থাও করা হবে। যদি ওয়াইনারকে একবার বিশ্বাস করানো যেত, তার কোন ভয় নেই, তাহলে খুব ভাল হত।

—এখনও সময় আছে। খুব সম্ভব ঠিক হয়ে যাবে। ওর পেছনে লেগে থাক। এবার পল, মেয়েটা সম্বন্ধে বল।

—মেয়েটার ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ও একটা রহস্য।

ফরেস্টের চোখে ও কানে সবকিছু ধরা পড়ে। ধরা পড়ে গেল কনরাডের গলার নৈরাশ্য। তিনি একটু অবাক হলেন। এই নৈরাশ্যের কারণ কি? হতাশ হচ্ছে কেন? পল কনরাড তো কখনও নিরাশ হয় না।

—কি তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, পল? ফরেস্ট শান্ত মৃদু গলায় প্রথম বললেন।

—আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, মরারকে সে 'ডেভ্ড এণ্ড'-এ দেখেছে। কিন্তু কেন অস্বীকার করছে? কিন্তু না বলে সে তাহলে খুনীকে সাহায্য করছে।

—তুমি কি সে কথা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছো?

—না, এখনও স্পষ্ট করে বলিনি। হয়তো মনে করতে পারে ওর কথা বের করার জন্য ওকে ভয় দেখাচ্ছি।

—কিন্তু ওকে জানানো দরকার। মিস্ কোলম্যান কিন্তু দেখছে, এটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সে তো ছাড়া পাবে না, তার শাস্তি হবে।

—জানি। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আর একটু আমাকে সময় দিন। আমার বিশ্বাস, ওকে বুঝিয়ে আমি ঠিক কায়দা করতে পারব। প্রথম প্রথম সে যা চোটপাট করেছিল, গলোউইংকে দেখার পর থেকে একটু বাগে এসেছে।

—তাই নাকি? কি করে বুঝলে?

—ওর কথাবার্তা আর কর্কশ নয়, একটা আন্তরিকতার ভাব আছে। মনে হচ্ছে, এবারে ওর ভয়টা মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

—কিন্তু বুঝতে তো পারছো, ওকে বেশীদিন এভাবে আটকে রাখা যাবে না?

—জানি। এটাও একটা মহাসমস্যা। এখন ওর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ, ওকে স্বীকার করতে হবে, মরারকে সে দেখেছে। তাহলে মরারকে ধরা আমাদের সুবিধা হবে। আর যতক্ষণ সে বাইরে আছে, ভয়ে কাটাবে। কারণ সে জানে পুলিশ পাহারায় চিরকাল থাকা সম্ভব হবে না।

—এটা বুঝতে পেরেছে সে?

—খুব সম্ভব। তাকে বারবার বলেছি। ছাইদানিতে ফেলে দিল সিগারেটের অবশিষ্টাংশ। তারপর তাকিয়ে রইল মেঝেতে পাতা কার্পেটের দিকে, কপালে কুঞ্চন রেখা।

ফরেস্ট বাঁকা চোখে তাকে লক্ষ্য করছেন।

—আর একটা কথা, কনরাড বলল, কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না। মনে হয়, আপনি এর একটা কিনারা করে দিতে পারবেন।

—কি ব্যাপার?

—এত ঝামেলার মধ্যেও ওদের দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। বলতে পারেন প্রেম।

—দু'জন বলতে?

—মিস কোলম্যান আর ওয়াইনার।

—প্রেম? বলছ কি তুমি? এটা কি করে হয়?

—কি করে হয়? দুটো লোক কিভাবে প্রেমে পড়ে? এ কি বিস্তৃত বর্ণনা করা যায়? দু'জনের দেখা হয়, তারপর নিমেষের মধ্যে কি যে ঘটে, কিছুই বোঝা যায় না। এ তো যখন এখন হচ্ছে?

—তোমার দেখা ভুল হয়নি তো? ঠিক দেখেছ?

—না, ঠিক দেখেছি। মিস কোলম্যান কাল আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, ওয়াইনারের সঙ্গে সে দেখা করতে পারে কি না। ওদের দু'জনকে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছিল। মিস ফিলডিং আমাকে বলেছিল ওয়াইনারকে যখন মাঠে বেড়াতে দেওয়া হয়, মিস কোলম্যান নাকি জানালায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—এতে কি বোঝা যায়, ওরা প্রেমে পড়েছে? কনরাড কাঁধ ঝাঁকাল।

—হয়তো ওদের কথাবার্তা শুনলে আপনি বুঝতে পারতেন। কনরাড হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, মিস কোলম্যানের মত মেয়ে কি করে ওয়াইনারের মত ইঁদুরের প্রেমে পড়ে। এক-রকম রহস্য বলতে পারেন। কোন গুণ নেই ওয়াইনারের। গালে একটা বিশ্রী লাল দাগ। ওর রক্তে বইছে গুণ্ডামি আর শয়তানি বুদ্ধি। সারা জীবন ধরে গুণ্ডামি ছাড়া আর কোন শিক্ষা তার জানা নেই। ঐ লোকের জন্য কি করে যে ভালবাসা উথলে ওঠে, সেটা আমার মগজে কিছুতেই ঢুকছে না।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফরেস্ট। মেয়েটির প্রতি পলের আসক্তি জন্মেছে? ব্যর্থ প্রেমিকের মত তার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় তা নয়। জেনীর সঙ্গে ফরেস্ট কথা বলেছে। সত্যিই জেনী সুন্দরী, তার রূপ যে কোন পুরুষকে

আকর্ষণ করে। এমন একটি মেয়েকে পল বিয়ে করতে পেরেছে বলে ফরেস্ট তার ভাগ্যকে হিংসা করেন।

—মনে হয়, ঐ বিশ্রী জড়ুলটার জন্য মিস কোলম্যান তাকে করুণা করে। মেয়েরা যে কি ধরণের জীব, বোঝা দুষ্কর।

—তাই হবে।

--কিন্তু হয়েছে কি? ওরা যদি প্রেমে পড়ে, তাহলে আমরা করবো কি? আমরা এত ভাবছি কেন?

—না, আমাদের কিছু এসে যায় না। ওদের কি কথা বলতে দেবো?

—আমার তো মনে হয় উচিত হবে না। তোমার কি মতামত?

কনরাড একভাবে পায়চারী করে চলেছে।

—কিন্তু কাজটা কঠিন হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আসল উদ্দেশ্যের কথা। মরারকে ধরাই আমাদের মূল লক্ষ্য। মিস কোলম্যানকে দিয়ে মরারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, কথা বলার সুযোগ দিলে, ওয়াইনার নিশ্চয়, মরার প্রসঙ্গ তুলবে। কেন মরারের হুকুমে সে তাকে খুন করতে এসেছিল, মিস কোলম্যান সেটা জানতে চাইবে। ওই সূত্রে ওয়াইনার অনেক কথাই বলে ফেলতে পারে।

...এ পর্যন্ত আমি মিস কোলম্যানকে বুঝিয়েছি, কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি। সে মনে করেছে তাকে দিয়ে কোনরকমে সাক্ষী দেওয়ান আমার মতলব। কিন্তু ওয়াইনারের মুখ শুনলে তার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, ভাবতে পারে সাক্ষী দেওয়া তার উচিত। এটা একটা সমস্যা ঠিক কথা, কিন্তু আমার ইচ্ছা, ওরা কথা বলুক। তারপর কি হয় দেখি।

—বুঝলাম। ঠিক আছে, তাই কর, কিন্তু এটা ভেবে দেখেছো কি, ওয়াইনার হয়তো তাকে নিষেধ করে দেবে। এমন ভয় দেখাবে, সে মুখ আর খুলবে না?

—কিন্তু ওয়াইনার স্বীকার করেছে, তাকে মিস কোলম্যানকে খুন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। অতএব এখন ভয় দেখানোর কোন মানে হয় না।

—ঠিক আছে। কিছু একটা তো করতেই হবে। আর একটা কথা। তুমি বললে, মিস কোলম্যানাকে তুমি অনেক বুঝিয়েছো। ওয়াইনার বলেছে, মরারই তাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মিস কোলম্যান কেন সাক্ষী দিতে রাজী নয়?

—মরারের ভয়ে ও কুঁকড়ে আছে।

—তোমার কথাটায় আমি সায় দিতে পারছি না। ফরেস্ট বললেন, মরার কি প্রকৃতির লোক, ওর মত মেয়ে অনুমান করতে পারবে না। ও যে দারুণ বিপজ্জনক লোক, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কেবল খবরের কাগজ পড়ে ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আমার বিশ্বাস, এর ভেতরে আর কোন রহস্য আছে। যার জন্যে ও কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

…হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কোর্টে মামলা উঠলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। অথবা স্বামী আছে যে ওর খোঁজ করছে। ও জানে, মরারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ওর ছবি ছাপা হবে। এটা হয়তো ওর পছন্দ না। তাই সে মুখ বন্ধ করে আছে। এ সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন।

—তা অবশ্য ঠিক?

কিন্তু ফরেস্টের আশার দীপ নিভে এল। কারণ কনরাডের গলার স্বরে তেমন সেই উৎসাহ নেই। ফরেস্টের মনে হল, কনরাড মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। ফরেস্ট একটু ঘাবড়ে গেল।

—বেশ। তুমি একটু সন্ধান নাও। তুমি কি এখন ওখানেই থাকবে?

—হ্যাঁ, কয়েকটা দিন ওখানেই কাটাবো। ভ্যানকে দিয়েই আমি খোঁজ খবর নেবো।

এটা যে প্রেম ঘটিত ব্যাপার, সে বিষয়ে ফরেস্ট নিঃসন্দেহ হল।

—মেয়েটা সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য, পল? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, একজন পুরুষের চোখে ওকে কেমন লাগতে পারে?

—এ প্রসঙ্গ এখানে উঠছে কেন? আমি ওর সম্বন্ধে কি ভাবছি, না ভাবছি, তাতে কার কি?

—না, সেটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা আজ তাহলে এখানেই আলোচনা শেষ হোক। কতদূর এগোলে আমাকে জানাবে।

—নিশ্চয়ই।

কনরাড বিদায় নিল।

ফরেস্টের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টেবিলের দিকে।

* * *

সারজেন্ট ও'ব্রায়াম বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, ছেলের দিকে তাকাল। এই

মুহূর্তে তার পাথরের মত কঠিন মুখে ফুটে উঠলো মমতা। ঠিক ঐ সময়ে তাকে তার বয়সের চেয়ে তরুণ মনে হল। তার চোখের কোণে যে মমতা আর স্নেহ দেখা দিল, তার আপনজনদের কোনদিন নজরে পড়েনি।

—এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়, সোনা। বলল ও'ব্রায়ান। নয়তো তোমার মা এসে বকবে।

সাত বছরের ছোট্ট ছেলে, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিল।

—লিটল সীজারের সঙ্গে তোমার সেই লড়াইয়ের গল্পটা শোনাবে না, বাবা? তোমরা কেমনভাবে মারামারি করেছিলে। বেশী তো সময় লাগবে না, বাবা। বল না। মাকে আমরা বলব না।

ছেলে এখন থেকেই মারামারির গল্প শুনতে ভালবাসতে শিখেছে। ও'ব্রায়ানের চোখ বিস্ফারিত হল। তার আনন্দও কম হল না। একবার ইচ্ছে হলো, ছেলেকে সেই গল্পটা শোনায়। কিন্তু রাত হয়ে গেছে। ন'টা বাজে। অথচ ছেলের ঘুমোনোর সময় আটটা।

—না বাবা আজ আর হল না। তুমি বলেছিলে, লিঙ্কনের গল্প শুনেই তুমি ঘুমোবে। এবার ঘুমোও। অনেক দেরী হয়ে গেছে। পরদিন আবার লিটল সীজারের গল্প শুনবে। এখন ঘুমোও।

—বলবে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো। এখন ঘুমোও। আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ছেলে চোখ বন্ধ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাতি নিভিয়ে দিল ও'ব্রায়াম। তারপর নেমে এলো নীচের হলঘরে। বাড়ীতে কেউ নেই। স্ত্রী গেছে তার মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা আসবে। দোনামনা করছে—ডিসগুলো ধুয়ে নেবে, না, টি.ভি-তে বক্সিং দেখবে।

অন্য ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। সে কি বাতি জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিল?

বাতি জ্বালাতেই সে স্থির হয়ে গেল। আরাম-কেদারায় বসে আছে একটি বেঁটে-খাটো লোক, কালো পোশাকে তার সর্বাঙ্গ আবৃত।

ও'ব্রায়ামের মত কঠিন স্নায়ুসম্পন্ন সাহসী লোক ভীত হল। কি এক অজানা আতঙ্কে বুকটা তার ধড়াস করে উঠল।

লোকটি ছায়ার আড়ালে বসেছিল। ও'ব্রায়ামের মনে হল, সে ভূত দেখছে। পায়ে কালো সোয়েডের জুতো, কিন্তু মাটিতে তা স্পর্শ করেনি। তার গা শিরশির করে উঠল। কিন্তু ভয় প্রকাশ না করে সে কয়েক পা এগিয়ে এল।

—তুমি কে বাপু? কে—

আচমকা তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটির হাতের রিভলবার চকচক করে উঠলো। নলটা তার বুকের ওপর লক্ষ্য করে রয়েছে।

—হ্যালো সারজেন্ট, খুবই আস্তে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে লোকটি বলল, তুমি একটু অবাক হয়েছো, দুঃখিত। কিন্তু বেশী সাহস ফলাতে যেয়ো না। কারণ এত কাছ থেকে আমার নিশানা ব্যর্থ হবে না।

গলার স্বরটা তার চেনা চেনা লাগল। এমন কণ্ঠস্বর একজন লোকেরই হওয়া সম্ভব। সে হল ভিটো ফেরারি। ও'ব্রায়ামের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল। সে যখন নিউইয়র্কে পুলিশের কাজ করত, সেই সময় একবার ভিটো ফেরারির সঙ্গে তার মোলাকাত হয়েছিল। সত্যি সেটা একটা অভিজ্ঞতা, কোনদিন ভুলবার নয়।

ও'ব্রায়াম তার দিকে তাকাল। ফেরারি চেয়ার থেকে মাথাটা একটু আলগা করল, এবার ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

—মনে হচ্ছে, আমায় তোমার মনে আছে, সার্জেণ্ট।

—তুমি এখানে কি করতে এসেছ? ও'ব্রায়াম কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু একবিন্দুও নড়ল না। ফেরারি কি প্রকৃতির লোক, সেটা সে ভালমতেই জানে। তার মনে হল, ফেরারি তাকে খুন করতেই এসেছে। অবশ্য এর মধ্যে কি কারণ থাকতে পারে, সেটা আন্দাজ করতে পারল না সে। সিনডিকেটের বাছাই করা খুনী ফেরারি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে খোস গল্প করতে আসেনি।

—বসো সারজেন্ট, ফেরারি তার উল্টোদিকের চেয়ারটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল তোমার সঙ্গে দরকার আছে।

ও'ব্রায়াম চেয়ারে বসল। তার পা কাঁপছিল। তাই বসতে একটু শান্তি অনুভব করলো। মনে পড়ে গেল, ওপরে ঘুমন্ত ছোট্ট ছেলের কথা। স্ত্রী বাড়ী ফিরতে এখনো ঘন্টাখানেক দেরী। এই প্রথম তার মনে হল, তার চাকরিটা, স্ত্রী পুত্রের বিপদ টেনে আনতে পারে।

—তুমি প্যাসিফিক সিটিতে। কি ব্যাপার? ও'ব্রায়াম তার ভয়টা প্রকাশ করতে চায় না, এটা তো তোমার এলাকা নয়।

ফেরারি রিভলবারটা কোটের বুক-পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। এরকম ব্যবহারে ও'ব্রায়াম যে একটু আশান্বিত হল, তা নয়। ও জানে, সে ওর ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ার আগে সে অনায়াসে রিভলবারের গুলি ছুঁড়তে পারে।

—জানি, এটা আমার এলাকা নয়। একটা কাজে এখানে এসেছি। ওয়াইনারকে আমার চাই। ফেরারি ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল। সে পা দোলাতে লাগল।

ও'ব্রায়ামের সর্বাঙ্গ কঠিন হয়ে গেল। সত্যি, তার ভুল হয়ে গেছে, ফেরারিকে দেখা অব্দি তার ওয়াইনারের কথা মনে করা উচিত ছিল।

—তাহলে তোমার দুর্ভাগ্য। ওয়াইনার আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—একটা কথা জেনে রেখো, কেউই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নাই, ফেরারি উত্তর দিল, লোকে অবশ্য তাই ভাবে। তুমি কেবল আমাকে বল, ওকে কি ভাবে পাওয়া যায়।

ফেরারির অনেক প্রশংসা সে শুনেছে। সে জানে, ফেরারি যা বলে কাজের কথাই বলে।

—তোমাকে আমি বলবো কেন ?

—কেন বলবে না ?

ও'ব্রায়াম ওকে লক্ষ্য করল, ওর ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হল। বড় বড় হাতের মুঠো পাকাল।

—তোমার ছেলে ভাল আছে তো ? ফেরারি প্রশ্ন করল, সকালবেলা দেখলাম। ভারি সুন্দর ছেলে।

ও'ব্রায়াম নীরব। সে দুর্বল বোধ করল, যেন জালে জড়িয়ে গেছে। ফেরারি কোথা দিয়ে নাক গলাচ্ছে তার বুঝতে বাকি রইল না।

—যাক, ওয়াইনারের কথায় আলোচনা করি, কি বল ?

—কেন কথা বাড়াচ্ছ ? ওসব করতে গেলে জীবনে বাঁচবে না। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

—তুমি আমার কথার উত্তর দাও। ওয়াইনার ক'টার সময় রাত্রে স্নান করতে যায়।

—দশটা। কিন্তু তুমি জানলে কি করে ও রাত্রে স্নান করে। ও'ব্রায়াম রীতিমত অবাক।

—আমার মক্কেলদের ইতিহাস একটু আধটু জানতে হয়। খুঁটিনাটি কয়েকটা

জিনিস জেনে রাখলে কাজের সুবিধা হয়। ঐ সময় কি ওর সঙ্গে গার্ড থাকে না একা থাকে?

ও'ব্রায়াম কি বলবে ভেবে পেল না, কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকাও নিরাপদ নয়। কারণ তা হলে পরিণতি কি হবে সে জানে। নিজের জীবনের জন্য সে চিন্তা করে না।

—একা।

—স্নানের একটু বর্ণনা দাও, দয়া করে।

—আর পাঁচটি স্নানের ঘরের মত, তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। তিন তলায়। গরাদ দেওয়া একটি ছোট জানালা আছে। শাওয়ার আছে, একটা কাবার্ড, বাথটাব আর টয়লেট।

—শাওয়ারের চারপাশে কি পর্দা রয়েছে?

—ফেরারি, তুমি বাজে সময় নষ্ট করছ। মাথা ঠিক করে কাজ কর। স্নানের ঘরে ঢোকা তোমার পক্ষে অসাধ্য। এমন কড়া পাহারা চারদিকে, একটা ইঁদুরও ঢোকার সুযোগ পাবে না।

—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পার। এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, আমার জায়গাটা দেখা হয়ে গেছে।

—তুমি বাজে কথা বলছ। ও'ব্রায়াম একটু বিচলিত হল।

—তুমি তাই ভাবছ? বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলছি। এবার বলো, ওয়াইনার স্নানের ঘরে ঢোকার আগে কি সার্চ করা হয়?

—অবশ্যই।

—কে সার্চ করে?

—রাত্রে যার ডিউটি থাকে, সে।

—তোমার ডিউটি কখন, সারজেন্ট।

—কাল রাত্রে।

—বেশ, উত্তম কথা। এবার যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। ওয়াইনার স্নানের জন্য তৈরী হলে তেমনি তুমি সার্চ করবে। আমি শাওয়ারের পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকব। বুঝেছো? মনে থাকবে?

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল ও'ব্রায়াম।

—ফেরারি, তুমি কি যা-তা বকছ, হয়তো নিজেই বুঝতে পারছো না। স্নানের ঘরে ঢোকা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আর তুমি যে বললে, ওখানে গিয়েছিলে,

তাও আমার কাছে অবিশ্বাস্য। রাস্তায় কঠোর পাহারা, একটা বেড়ালও ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকতে পারে না।

—আমি তো রাস্তা দিয়ে যাই নি, পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে গিয়েছি।

—ফের মিথ্যে কথা বলছ। পাহাড় ডিঙোতে হলে প্রয়োজন দড়ি আর আঁকশী।

ফেরারির মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি।

—সারজেন্ট, তোমার কি মনে নেই, ঐ গুণ[illegible] আমার ভালমতই জানা আছে।

তক্ষুণি ও'ব্রায়ামের মনে পড়ে গেল, ফেরারির মা-বাবা দুজনেই সার্কাস দেখাত। এসব খেলা ফেরারিরও জানত। একবার আনন্দ ফুর্তি করার জন্য এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ওপরে উঠে রাস্তার গাড়ি আর লোকজনের হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছিল। সবাই বোকার মত ওপর দিকে তাকিয়েছিল।

—চিন্তা করো না, সারজেন্ট। আমি ওখানে হাজির থাকবো। তবে নিজে থেকে বিপদ ডেকে এনো না। তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি তো?

ও'ব্রায়াম কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

—তুমি সন্দেহ করছো, তাই না। আমি অবাক না হয়ে পারছি না। ওয়াইনার একটা সস্তা, তৃতীয় শ্রেণীর বদমাইস। তুমি কি তোমার ছেলের থেকে ওর জীবনের দাম বেশী দিতে চাও? তোমার ছেলের জীবন বিপন্ন করবে না নিশ্চয়? ওয়াইনারের মত একটা চ্যাংড়ার জন্যে কি করবে?

—এ প্রসঙ্গে আবার আমার ছেলেকে টানছো কেন?

—তোমাকে কেবলমাত্র মনে করিয়ে দিলাম। এবার বল, তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি কিনা। তুমি জান, আমি কখনও মিথ্যে বলি না। তুমি কোনটা বাঁচাতে চাও—তোমার ছেলে না ওয়াইনার। বুঝে দেখ।

ও'ব্রায়াম এই মুহূর্তে ভীষণ অসহায় বোধ করল। ঐ সাংঘাতিক বিপদপূর্ণ লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। ফেরারি যখন বলেছে, তখন একজনের জীবন নেবেই। সে তার ছেলেই হোক আর ওয়াইনার হোক। আর এটাও সে ভালমত জানে, ফেরারিকে সে মারতে পারবে না, মারার ফুরসৎ ফেরারি তাকে দেবে না। সে আজ পর্যন্ত মিথ্যে ভয় দেখায় নি। এটা যে মিথ্যে শাসানি তা মনে করার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না।

—আবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করো

না। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় তোমার ছেলের জীবন চলে আসবে আমার হাতে। আমি ব্যাপারটাকে জানাজানি করতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতিটা লক্ষ্য কর। তুমি যদি ঠিক থাক, তাহলে আমার কথা যেমন তেমনই থাকবে। কি তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি তো?

এটা বুঝতে অসুবিধা নেই—হ্যাঁ তার ছেলে, নতুবা ওয়াইনার।

—হ্যাঁ, শব্দটা যেন অকস্মাৎ তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, কর্কশ শোনাল। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পার।

* * *

কনরাড যতটা আন্দাজ করেছিল ততটা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক, ওয়াইনার ফ্রানসেসের প্রেমে পড়েছে। কেননা, ভালবাসার অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। তাই ফ্রানসেসের প্রতি আসক্তি তাকে ভীষণভাবে সজাগ করে দিয়েছে।

ওয়াইনার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, তার এই অনুরাগ কোনদিন সফল হবে না। মরারের শক্তি সম্পর্কে তার ভালই জানা আছে। তবে একটা কথা ভেবে সে সবচেয়ে বেশী অবাক হচ্ছে, এখানে আটদিন ধরে সে নিরাপদে আছে। সে জানে তার বাঁচার মেয়াদ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। মরার তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। যতই কঠোর পাহারার ব্যবস্থা থাক, কনরাড যতই ভাবুক, তার ব্যবস্থা নিখুঁত, এখানে কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না, তবু মরারের হাত থেকে রেহাই পাবে না সে, আগুনের সংস্পর্শে যেন পাতলা কাপড় পুড়ে যায়, ঠিক তেমনি।

এই কারণেই তার ভালবাসার মধ্যে রয়েছে এক করুণা। সে জানে তার প্রেম স্থায়ী নয়। কেবল থেকে থেকে মনে হয়, এটা স্বপ্ন।

ফ্রানসেসকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখলেই সে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করে তাকে, তার রঙীন স্বপ্ন পাখা মেলে উড়তে চায়। সত্যি তারা কত কিনা করতে পারত। দু'জনে সুন্দর জীবন কাটাতে পারত। একটা ছোট বাড়ি আর কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে উঠতো তাদের সুখের পিঞ্জর। সবই সম্ভব হত কিন্তু সবার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ মরার নামের লোকটি।

তাই কনরাড যখন তাকে বলল, সে ফ্রানসেসের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তখন সে রীতিমত অবাক হয়ে গেল?

ও মনে করে, কনরাড বলল, তুমি ওকে নতুন করে জীবন দান করেছো। তোমার সঙ্গে কথা বলার ওর ইচ্ছা। আমি কোন বাধা দেব না।

রাত্রিবেলাও এ বাড়িতে কাটাচ্ছে কনরাড। ফ্রানসেসের সঙ্গে সে রোজই কথা বলে। যতই সে তার সঙ্গে মিশছে, ততই তার প্রতি অনুরাগ বাড়ছে। তার ওপর মেয়েটার আর রাগ নেই! ওর সর্বত্র ফুটে ওঠে একটা মমতাময় হৃদয়ের রূপ—ওর হাঁটা, ওর গলার স্বর, দেহের ভঙ্গি, ওর চোখ। নিজের অজান্তেই যে জিনিসটির জন্য তার মন জীবনভোর সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জেনী যে তাকে এমনভাবে হতাশ করবে, ভাবতে পারে নি। জেনী হল স্বার্থপর, কেবল নিতেই জানে, দিতে শেখেনি কিছু। তার চাহিদার শেষ নেই, চাহিদা মিটে গেলে শেষ হয়ে গেল যেন স্নেহ-ভালবাসা। এমন ঘোরতর স্বার্থপরতা কনরাড কোনদিনই পছন্দ করে না, খাপ খাওয়াতে পারেনি নিজেকে। এমন বস্তুতান্ত্রিক ভালবাসায় অভ্যস্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মনে মনে সে ফ্রানসেসের সঙ্গে জেনীর তুলনা করতে লাগল। অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়েছে। সে কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। অবাক কাণ্ড? বিয়ের জন্য জেনীকে কত অনুনয়ই না সে করেছিল।

কনরেডের এই ভালবাসা যথেষ্ট করুণ। সে জানে, মরার মাঝখানে বাধা থাকার জন্যে ওয়াইনারের যে ভয়, তেমনি জেনীর জন্যই তার প্রেমের কোনোদিন পূর্ণতা ঘটবে না!

ফ্রানসেস পিটের প্রেমে পড়েনি। পিট তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাই তার প্রতি করুণা ফ্রানসেসের। এক্ষেত্রে ভালবাসার চেয়ে অনুকম্পা অনেক বড কথা।

ফ্রানসেস জানত, পিট এসেছিল তাকে খুন করার জন্যে। হাতে ছিল রিভলবার, পকেটে ছিল গাঁইতি। তাকে মারবার সুযোগও পিট পেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে না মেরে নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা ফ্রানসেসকে মুগ্ধ করেছে। আর ঐ লাল বিশ্রী দাগটার জন্যে তার মনে জেগেছে এক কোমল করুণা।

ফরেস্টের সঙ্গে কনরাডের যেদিন কথা হল, সেদিন বাগানে ওদের দু'জনের দেখা হল। ঐ সময় ফ্রানসেসের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে হাসি, মনে অন্তরঙ্গতা, পিটের সঙ্গে কথা বলছে। সাধারণতঃ দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রথম আলাপে যেমন দ্বিধা আর সংকোচের সৃষ্টি হয়, তেমন ফ্রানসেস আর পিটের মধ্যেও দেখা গেল!

পিট তার গালের দাগ সম্বন্ধে সজাগ। কিছুতেই সে সহজ হতে পারছে

না। ফ্রানসেসের ডানদিকে বসায় যেন তার গালের দাগটা আড়াল হয়ে আছে। মুখ ফেরানোর সময় কেবল হাত দিয়ে গাল ঢাকছে।

হঠাৎ কথার ফাঁকে ফ্রানসেস প্রশ্ন করল, তোমার গালের ঐ দাগটা নেভাস, তাই না?

পিট কুঁকড়ে গেল, মুখে ফুটে উঠল রক্তাভা, চোখে রাগ আর বেদনা। কিন্তু তার দয়ালু কণ্ঠস্বর শুনতে সে ভুল করেনি, সেই স্বরে নেই বিতৃষ্ণার আভাস, সেই একই রকম অন্তরঙ্গতাপূর্ণ হাসি।

—তুমি কিছু মনে করো না, তখন থেকে লক্ষ্য করছি,ঐ দাগটার জন্য তোমার সংকোচের শেষ নেই। তাই বললাম। তুমি ভাবছো, এর জন্যে আমি বিরক্ত বোধ করছি? না, ভুল ভেবেছো। তুমি কি বুঝতে পারছ না, ঐ দাগটা আমি লক্ষ্যই করি নি।

পিট ওর দিকে তাকাল, বুঝলো ওর কথায় কোথাও এতটুকু ভেজাল নেই, সত্যি বলছে। তার মনে হল, এমন কথা শোনবার জন্যে কি গভীর ব্যাকুলতাই না ছিল তার মনে। সে তার ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হল যে মনের আবেগ সামলাতে তাকে দস্তুর মত কষ্ট করতে হলো।

ফ্রানসেস জড়িয়ে ধরেছে তার বাহু।

—তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি, বিশ্বাস কর। আচ্ছা ওটার কিছু ব্যবস্থা করা যায় না? খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা থাকে, সারানো যায়। তুমি কি এটা সারাতে পারো না?

—সারানো যায়। অপারেশন করতে হয়। আমি একজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। আমার রক্তে কি একটা গোলমাল থাকায় অপারেশন করা ঠিক হবে না! থাক, আমার কথা বাদ দাও, এবার তোমার কথা কিছু বল।

-- তোমার মত মেয়ের সঙ্গে আলাপ আমার এই প্রথম! সত্যি তুমি কি ভাল, তোমার গুণের তুলনা হয় না। আমাকে স্পর্শ করতে তোমার মনে জাগে না সংশয়। যদি আরও আগে আমাদের পরস্পরের দেখা হতো তাহলে কি আমি এমন ঘৃণ্য জীবন কাটাতাম? লোকে সব সময় আমাকে তাচ্ছিল্য করে এসেছে, ঘৃণার চোখে দেখেছে। অগত্যা দলে যোগ দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। আমার অন্য কোথাও এতটুকু ঠাঁই হলো না।

পিট ওর গায়ের কাছে সরে এল। আবার বলতে শুরু করল—কিন্তু এখন

কিছুই কয়ার নেই। তোমাকে কয়েকটা দরকারী কথা বলা দরকার। মরারের বিরুদ্ধে তোমার সাক্ষী নেওয়াই কনরাডের মতলব। কনরাডের কথা তুমি শুনবে না। কারোর কথা নয়। ওরা মনে করে, সব কিছু জানে। আসলে কিছু না। ওদের ধারণা 'ডেভ এণ্ড'- এ তুমি মরারকে দেখেছো।

··শোন, আমি জানি না, তুমি তাকে দেখেছ কিনা তা জানতেও চাই না। কেবল তোমাকে সাবধান করে দি, তুমি কখনও ওদের কথায় রাজী হবে না। বলবে না, তুমি মরারকে ওখানে দেখেছ। আমাকে নয়, কনরাডকে নয়, কাউকে নয়, এমন কি তোমার মা-বাবাও যেন জানতে না পারে। যদি তুমি মুখ বুজে থাক, তাহলে একটু বাঁচার সম্ভাবনা আছে। আর কারো পাল্লায় পড়ে সব ফাঁস করে দাও তাহলে বিপদ অনিবার্য।

ওর এমন ভীত কণ্ঠে ফ্রানসেস ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সে ভয় পায়নি। এই বিশ্বাস তার মনে কনরাড পোষণ করছে—এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

—জানি, চিরকাল এখানে এভাবে থাকা সম্ভব নয়। তবে যতদিন আছি ততদিন তুমি এবং আমি তু'জনেই বিপদমুক্ত।

—বিপদমুক্ত? এখানে? মোটেও না। মরারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ রুখে দাঁড়াতে পারবে? মনে করেছ, সে কিছু করতে পারবে না? ক'জন পুলিশ এখানে পাহারা দিচ্ছে? কুড়িজন? একশোজন এলেও মরারের সঙ্গে পারবে না। একবার ও কাউকে মারবে বলে মনস্থির করলে কেউ টলাতে পারবে না আজ পর্যন্ত কেউ ওর হাত থেকে নিস্তার পায়নি? যদি সে তার কাজে বিফল হয়, তাহলে সেই ভার পড়বে সিনডিকেটের ওপর। তার হাত থেকে মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না কেউ। হয় মরবে, নয় মারবে। আর আমাদের চেয়ে মরারের প্রাণ বেশী মূল্যবান।

—তোমার কল্পনাটা একটু বেশী বিস্তৃত হচ্ছে না? ফ্রানসেস প্রশ্ন করল আমি বলছি. এখানে আমাদের কোন ভয় নেই, নিরাপদ। কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

পিট মুঠো পাকিয়ে তার হাঁটুতে মারতে লাগল।

লক্ষ্য করছে, মারলে কেমন ছুরি ঢোকে? তেমনি মরারও ঐ পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করবে। যখন আমি সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হয়েছিলাম, তখনই আমি ওদের হুকুম অগ্রাহ্য করেছি। মরার আমাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে

রাখতে পারে না। কারণ ও জানে, আমাকে যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে অন্য কেউ তার হুকুম অমান্য করবে।

··আমি কনরাডকে কিছু কিছু বলেছি। আমি সময়ের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কিন্তু মরার আমাকে ধরবেই। সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি মনে করছ তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। না, আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, বেশীক্ষণ আর এ সংসারে আমার অস্তিত্ব থাকবে না। হয় আজ অথবা কাল, নয়তো পরশু। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর বেশী নয়।

ফ্রানসেস হঠাৎ দুর্বল বোধ করল। পিট ধীর, স্থিরভাবে কথা বললেও, ওর চোখে ফুটে উঠেছে ভীষণ ভয়।

—তুমি বুঝতে পারছো না। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ফ্রানসেস তার বাহু নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। ওরা কি করে এখানে আসবে? ভয় পেয়ো না।

—পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই, যার কাছে ওরা পরাজয় স্বীকার করে। ওরা আসতে পারে এবং আসবে। ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।

—এত পুলিশ তোমাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। অথচ কিভাবে—

পিট নিরাশ হল, শূন্যে হাত ছুঁড়তে লাগল।

—তুমি ভাবছ, আমি ওদের বিশ্বাস করি? মরারের টাকায় ওরা কথা বলে, জানো তো? ওরা যথেষ্ট টাকা পেলে কাজ হাসিল করতে কতক্ষণ? এভাবে টাকা দিয়ে বশ করিয়ে অনেক কাজ হাসিল করেছে সে।

—কনরাড আমায় বলেছে, টাকা দিয়ে ওদের বশ করানো যাবে না।

—হ্যাঁ, ঐ একই কথা কনরাড আমায় বলেছে। কিন্তু ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না। ও নিয়ে আমায় ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পারে।

—তোমার এ কথাটা আমি মেনে নিতে পারছি না। তুমি বাজে কথা বলছ।

—যাক, আমার যেদিন মৃত্যু হবে, সেদিন তুমি আমার বলে যাওয়া কথাগুলো স্মরণ করো। আর সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার একমাত্র বাঁচবার অস্ত্র হল, কাউকে কিছু না বলা। মনে রেখো, কোন কথা বলবে তো, তুমি মারা পড়বে। সাক্ষীর কাঠগড়া পর্যন্ত পৌছানো তোমার পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয়, ওরা তা হতে দেবে না। তুমি যদি চুপ করে থাকো, তাহলে মরার ভাববে তুমি কিছু দেখোনি, তাহলে বাঁচবে। দয়া করে, তোমায় বারবার বলছি, আমার এই ছোট্ট কথাটা মনে রেখো।

—বেশ, মনে রাখবো। কিন্তু তুমি বাঁচবে। কেবল বাজে চিন্তা করে মন খারাপ করছো।

পিট হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

—তুমি দেখতে পাবে আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আর একটা কথা আমি বলবো। জীবনে আমি ভালবাসার স্বাদ কোনদিন পাইনি। তুমিই একমাত্র মেয়ে যে আমাকে করুণার চোখে দেখেছ। তাই আমি তোমাকে ভালবাসি। এই ক'দিনে আমি পেয়েছি অনন্ত সুখ ও শান্তি। আমার মন ভরে গেছে, আমি তৃপ্ত।

দূর থেকে কনরাডকে আসতে দেখে পিট পা বাড়াল চলে যাওয়ার জন্য। তিনজন গার্ড তাকে অনুসরণ করল।

ফ্রানসেস একভাবে বসে পিটের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছে।

—কি হল, মিস কোলম্যান? কনরাড এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, তোমাকে বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে।

ফ্রানসেস মুখ তুলে তাকাল।

—ও যে এখানে নিরাপদ, কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মৃত্যু নাকি কেউ রুখতে পারবে না।

—জানি। কনরাড তার পাশে বসে একটা সিগারেট ধরাল, ও এখন মানসিক বিকারে ভুগছে। আর কিছুদিন এখানে কাটালেই বুঝতে পারবে, ও কতটা নিরাপদ। ওর মনের দৃঢ় বিশ্বাস, মরার একজন দারুণ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, ওর ইচ্ছেমত সবকিছু করতে পারে। এই বিশ্বাসটা সে মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছে না। এত বুঝিয়েও তার মনে পরিবর্তন হচ্ছে না। তুমি ওর জন্যে ভেবো না। ক'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

ফ্রানসেস কনরাডের দিকে তাকাল, তার চোখে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতা।

—আমারও কি সব ঠিক হয়ে যাবে?

কনরাড হাসল।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমাকে তো বেশীদিন এখানে রাখা যাবে না, সেটাই একটা ঝামেলা। শীগ্‌গিরই ভেবে একটা কিছু ঠিক করতে হবে। যদি মরারকে আমরা ধরতে পারি, তাহলে তোমাদের দু'জনেরই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মরারের শাস্তি হয়ে গেলে আমি ভাবছি, তোমায় ইউরোপে পাঠিয়ে দেব। তারপর ধীরে ধীরে সব চুপচাপ হয়ে যাবে।

··· তখন তুমি ফিরে এসে নতুন করে জীবন শুরু করবে। তখন আর কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি স্বীকারোক্তি দিচ্ছ ততক্ষণ মরারকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারছি না।

ফ্রানসেসের মুখ সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে গেল।

—তুমি 'ডেভ এণ্ড'-এ মরারকে দেখেছ, এটাই আমার বিশ্বাস। হয়তো তুমি ভাবছ, স্বীকারোক্তি দিলে খবরের কাগজে তোমার নাম ছাপা হবে; সবই জানাজানি হবে। খুব সম্ভব তুমি এটা চাও না? যদি আমার ধারণাই ঠিক হয়, তাহলে এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি, কি করা যায়। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি, এটুকু বিশ্বাস তুমি কর তো?

ফ্রানসেস কোন উত্তর দিল না। তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে, হাত কাঁপছে।

—শোন, কনরাড চটপট বলল, আমরা এখানে একা। আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না! ধারে কাছে কেউ নেই। মনে কর আমি একজন সাধারণ লোক। তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পার না?

তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট করে বললেই, আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব। আমি তোমার কাছে শপথ করছি, তুমি যা প্রকাশ করবে, তার একটি কথাও তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না. কোন কথারই আমি সুযোগ নেব না। আমি এর চেয়ে বেশী আর কি বলতে পারি?

কনরাড লক্ষ্য করল, ও ইতস্ততঃ করছে। ক্ষনিকের জন্য তার মনে হল, এবারে সে ফ্রানসেসকে বিশ্বাস করাতে পেরেছ। এবারে নিশ্চয়ই মুখ খুলবে।

কিন্তু ফ্রানসেসের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তার চকিতে মনে পড়ে গেল সাবধান বাণী—কখনই তুমি প্রকাশ করবে না, মরারকে তুমি দেখেছ। এটাই মূল কথা। আমাকে নয়, কনরাডকে নয়, এমন কি তোমার মা-বাবাকেও নয়। মুখ খোলা না পর্যন্ত তুমি বাঁচবে। একটা কথা ভুলে যেয়ো না, কনরাড যদি কোন রকমে তোমার মুখ খুলাতে পারে, অবশ্য তুমি যদি কিছু জান তাহলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়ই। কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

ফ্রানসেস উঠে দাঁড়াল।

—না, আমার কোন বক্তব্য নেই। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখন ঘরে যাব। সূর্যের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে।

সে ঘুরে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

তার চলে যাওয়ার দিকে কনরাড তাকিয়ে রইল।

॥ আট ॥

—তাহলে জ্যাকের কোন খবর পাওনি ? ডলোরাস প্রশ্ন করল।

ডলোরাস লক্ষ্য করল, গলোউইজ তার চিন্তা নিয়ে মগ্ন। তাকে দেখে যে খুশী হয়েছে তাও বোঝা গেল না। সে একটা চেয়ারে বসে স্কার্ট ঠিক করতে ব্যস্ত। গলোউইজ একবার আড়চোখে তার অনাবৃত হাঁটুর প্রান্ত লক্ষ্য করল। স্কার্ট ঠিক করতে ডলোরাস ইচ্ছে করেই একটু বেশী সময় নিচ্ছিল।

ডলোরাসের প্রশ্নের উত্তরে গলোউইজ মাথা নাড়ল।

—না, কোন খবর পাইনি। গালে হাত বুলোতে বুলোতে গলোউইজ বলল। তার একবার মনে হল, কাছে গিয়ে ওকে একটা চুমো দেয়। কিন্তু সাইগেলের কথা ভেবে একটু নিরুৎসাহ হল, কে জানে কোথায় সে আছে। যে কোন মুহূর্তে ঘরে ঢুকতে পারে। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুপ করে বসে থাকাই ভাল মনে করল।

—ও কোথায় আছে জানতে পারলে ভাল হত। মনে করেছিলাম, আমায় অন্ততঃ জানাবে।

—কেন, তাকে কি দরকার। দিব্যি তো চালিয়ে নিচ্ছ। এত ভাবনা কিসের ?

—আমার ভাবনা কি একটা ? মাথা স্থির রাখা কি সোজা কথা ? জ্যাক থাকলে তাকেও কি কম ভাবতে হত ? ভাবছি ঐ মেয়েটাকে যদি না পাওয়া যায়—

মেয়েটার কথা ওর শোনার প্রয়োজন নেই। গলোউইজ কি করছে, না করছে তাও নয়। এসব ব্যাপারে যত কম চিন্তা করা যায়, ততই ভাল।

—কিন্তু এত চিন্তা করেই বা কি হবে ? ডার্লিং, অত উতলা হয়ো না। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি জানতে এসেছিলাম যদি জ্যাকের কোন খবর থাকে। ডলোরাস তার ব্যাগটা খুলে ভেতরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমার কিছু টাকা দরকার। জ্যাক কি তোমাকে টাকার ব্যাপারে কিছু বলে গেছে ?

—না। কিছু বলেনি। খুব সম্ভব, মনে নেই। আচ্ছা, বেশ। তোমার কত টাকার দরকার, ডলি ?

—তোমার থেকে নেব কেন ? আর নেওয়াটা কি উচিত হবে ?

—থাক, ছেলেমানুষী কোরো না ডলি। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে এক গোছা নোট টেবিলের ওপর রাখল। পাঁচশো আছে। আপাততঃ এতেই চালিয়ে নিতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। টাকা নেওয়ার জন্য ডলোরাস চেয়ার ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। এ্যাবি, ডার্লিং আমার, সত্যি তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো। তুমি যদি না থাকতে, আমার যে কি দুরবস্থা হতো।

গলোউইজের নিঃশ্বাসে মিশে গেল সেন্টের উগ্র গন্ধ। ঈপ্সায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে। ডলোরাস টাকা নেওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল। তার সূচ্যগ্র স্তন দুটি গলোউইজের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল সে, মুখে তার দেখা দিয়েছে রক্তোচ্ছ্বাস, চোখ দুটো পাশবিক লিপ্সায় জলজ্বল করছে। এমন সময়ে ঘরে এসে ঢুকল সাইগেল আর ফেরারি।

টাকা তুলে নিয়ে ব্যাগে রাখল ডলোরাস। ওদের দিকে সে তাকাল না। ওর মুখে কোন ভাবান্তর হয় নি। গলোউইজকে নিজের বাসনা দমন করতে দেখে তার হাসি পেল, কৌতুক বোধ করল!

—আমি জানতাম না, আপনি ব্যস্ত আছেন। দুঃখিত। সাইগেল বলল।

—আমি যাচ্ছিলাম। ডলোরাস তাকিয়ে হেসে ফেলল। পরমুহূর্তে ফেরারির দিকে দৃষ্টি পড়তেই নিভে গেল সেই হাসির প্রদীপ। কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল, তাই নিচ্ছি। এমন এলোমেলো কথা সে কোনদিন বলেনি। এই ভয়ঙ্কর চেহারায় বামনটি চোখের চাউনি দিয়ে তাকে যেন উলঙ্গ করে ফেলছে।

—ঠিক আছে ডলি, জ্যাকের অনুপস্থিতিতে আমি যদি কিছু করতে পারি, নিশ্চয় জানাবে।

ফেরারির থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ডলোরাস চলে গেল।

ফেরারি তাকে একবার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নাকে আঙুল বুলোতে লাগল।

—কে ঐ সঙ্গিনীটি ? ফেরারি জানতে চাইল।

—মিসেস মরার, সাইগেল বলল, জান না ?

কয়েক পা এগিয়ে এসে ফেরারি চেয়ারে বসল। তার ঝুলন্ত পা দুটো মাটি স্পর্শ করল না।

—মনে হয়, মরারের দিন রাত্রি, দুটোই ভাল কাটছে—সে বলল। পাতলা ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠেছে ব্যঙ্গ আর লিপ্সার হাসি।

—কি ব্যাপার? গলোউইজ জানতে চাইল।

—ব্যাপার? ফেরারি উত্তর দিল। সব ঠিক আছে। ওয়াইনার আজ রাত্রে, ঠিক দশটায় পরকালে ফিরে যাচ্ছে।

একথা শুনে গলোউইজ আর সাইগেল তার মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

—তামাসা করছ নাকি? সাইগেল প্রশ্ন করল।

ফেরারি তার কথা কানেই তুলল না। নিজের কথার জের টেনে বলল—নিখুঁত এবং সুন্দরভাবে। কোন অসুবিধা হবে না। মৃদু গলায় সে বলল।

—কিভাবে হবে? গলোউইজ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল।

—ভেতরের লোকের সাহায্য প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থাও করেছি। সারজেন্ট ও'ব্রায়ামকে রাজি করিয়েছি।

—ও'ব্রায়াম? গলোউইজের যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না, তুমি ওকে বিশ্বাস করলে? তুমি ওকে চেনো না।

ফেরারি একটু হাসল।

—আপনারা হয়তো এ দিকটা ভেবে দেখেন নি, তারও যে কোন ব্যাপারে দুর্বলতা আছে। ও'ব্রায়ামের একটি ছেলে আছে। তাকে সে খুব ভালবাসে। আমি বুঝি বাপের মনের কথা। কারণ আমারও একটা ছেলে আছে তো!

—সত্যি দারুণ কাণ্ড তো! সাইগেল প্রশংসার স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ওর যে একটা ছেলে আছে, আমি জানতামই না।

—দু'ঘণ্টায় মারা যাবে ভো ওয়াইনার? গলোউইজ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—অবশ্যই। স্নান করবার সময় আচম্বিতে অজ্ঞান হয়ে টবের জলের মধ্যে পড়ে যাবে। জলে ডুবে তার মৃত্যু ঘটবে। কি, প্ল্যানটা আপনাদের পছন্দ?

ফেরারির কণ্ঠস্বর এত সহজ আর মৃদু যে বাকি দুজন অস্বস্তি বোধ করল, একে অন্যকে লক্ষ্য করল।

—চমৎকার। গলোউইজ বলল, রাত দশটার তার স্নান করা অভ্যেস নাকি ?

—কিন্তু তুমি কিভাবে স্নানের ঘরে ঢুকবে ? এবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সাইগেল।

—ঢোকা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। স্নানের ঘরে একটা মাত্র ছোট জানালা আছে। ক্ষতি কি, আমি তো ছোট। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওয়াইনার স্নানের ঘরে ঢোকার আগে সার্চ করা হয়। এ জন্যই রাত্রে ওর ডিউটি। সেই ঘর সার্চ করবে।

—তাহলে তুমি পারবে ? সাইগেল আবার প্রশ্ন করল।

—আমি কখনও কোন কাজে ব্যর্থ হইনি।

—মেয়েটার কি হবে ? গলোউইজ জানতে চাইল। ওর সম্বন্ধে কি কিছু ভেবেছে ?

—এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ওর জন্য অন্য কিছু ফাঁদ পাততে হবে। মনে রাখবেন ওয়াইনারের মৃত্যুর পর ওর ওপর আরও কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হবে। মনে হচ্ছে সমস্যাটা আরও জমবে। মেয়েটাও যাবে, এ বিষয়ে আপনারা নিচিন্তে থাকতে পারেন! অনেক কিছু ভাবতে হবে, তাই একটু সময় বেশী প্রয়োজন! কিন্তু যাবে ঠিক।

ফেরারি চেয়ার থেকে নেমে পড়ল—ভাবছি এখন এখন একটু ঘুমোবো। রাত্রে তো ঘুমোবার ফুরসৎ পাবো বলে মনে হয় না। আপনারা সাড়ে এগারোটার সময় থাকবেন ? তখন খবরটা পাবেন।

গলোউইজ মাথা নাড়ল।

ফেরারি পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর চকিতে মুখ ফিরিয়ে তার জলজলে চোখ দুটি লক্ষ্য করল গলোউইজ আর সাইগেলকে, তারপর দরজাটা বন্ধ করে নিঃশব্দে চলে গেল।

* * *

একটুও হাওয়া নেই, ভ্যাপসা গরম। সন্ধ্যা থেকে আকাশে ভিড় করেছে কালো মেঘের দল। সারাদিনের গরম অনুযায়ী সন্ধ্যের পর গরম আরও বাড়ছে।

কনরাড দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, আকাশের দিকে তাকাল সে।

—ঝড় উঠলে ভালোই হয়। ম্যাজ ফিল্ডিংকে সে বলল, মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ভিজে কম্বল।

ফ্রানসেসের সঙ্গে সারাদিন ঘরের মধ্যে কাটিয়েছে ম্যাজ। একটু হাওয়া

পাওয়ার আশায় এই মাত্র বাইরে এসেছে। কিন্তু হাওয়া কোথায়? তবে ঘরের চেয়ে একটু ঠাণ্ডা।

—চল, একবার টহল দিয়ে আসি, কনরাড বলল, আসবে?

—যাচ্ছি। ঝড় কি এখুনি উঠবে?

—মনে তো হয় না। বাতাস এখনও গুমোট হয়ে আছে। চল, গাড়ি নিয়ে একবার রাস্তা পর্যন্ত ঘুরে আসি।

ম্যাজ গাড়িতে উঠে বসল।

—সাতদিন এখানে থাকতে না থাকতেই মনে হচ্ছে কয়েক মাস ধরে এখানে আছি। ম্যাজ বলল। আর কতদিন এখানে থাকতে হবে?

—সঠিক বলতে পারি না। মিস কোলম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য ডি. এ. শনিবার আসছেন। এবারে ওর ওপর নির্ভর করছে। আমি ব্যর্থ হলাম। মিস কোলম্যান জিতে গেল। যদি কোন রকমে ওর মুখ খোলা না যায় তখন ভাবতে হবে অন্য কিছু। আর বেশীদিন তো ওকে এভাবে আটকে রাখা যাবে না। যদি মুখ খোলে তাহলে মামলা চলা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। ধরো, মাস তিনেক।

কনরাড গাড়ীতে স্টার্ট দিল। সদর দরজা থেকে রাস্তার দূরত্ব মাইল খানেক হবে।

—মেয়েটা কেমন? ম্যাজ জানতে চাইল।

—ভারি সুন্দর মেয়ে। তোমার কেমন লাগে?

—আমার ভালই মনে হয়। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়।

—তোমায় কিছু বলেছে নাকি?

—না। তবে লক্ষ্য করে দেখেছি, সর্বদাই কি যেন ভাবে। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। মনে হয় ওর ওপর জোর খাটালে, কথা বার করা যাবে! শুধু যে নিজের জন্য চিন্তা তা নয়, ওয়াইনারের জন্যও সে ভাবে, কেবলই জানতে চায়, ওয়াইনার এখানে নিরাপদ কিনা।

—নিরাপদ তো অবশ্যই। আদালতে ওকে হাজির করার সঙ্গে সঙ্গেই ঝামেলা শুরু হবে। বাইরে গেলেই ওরা ওকে মারবার চেষ্টা করবে।

বিশাল মজবুত গেটটা হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। পাঁচজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই বন্দুক। কনরাড গাড়ি থামাল, একজন এগিয়ে এল।

—সব ঠিক আছে তো ? কনরাড প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, স্যার।

—ঝড় বৃষ্টি হলেও এক পা কেউ নড়বে না। যদি তেমন জোরে বৃষ্টি আসে তাহলে তিনজন গেট ঘরে থাকতে পার, আর বাকি দুজন বাইরে থাকলেই চলবে।

—আচ্ছা, স্যার।

—একবার বাইরে ঘুরে আসি, রাস্তা আটকানোটা দেখে আসি।

একজন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে দিল।

কনরাড গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল।

সরু রাস্তাটায় দুজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সার্চলাইটের আলোয় সবই চোখে পড়ে। সবাই ডিউটিতে উপস্থিত।

কনরাড বাঁ দিকে কাঁচা রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। পাহাড়ের গোড়ায় এসে গাড়ি থামাল। এখানে একশ গজ দূরে দূরে একজন করে গার্ড রাখা হয়েছে। তিনটি সেনট্রি বক্স পাহাড়ের নীচে।

—আজ রাত্রিটা সবাই কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো। কনরাড বলল, ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এমন রাত্রেই ওরা কিছু করার সুযোগ খোঁজে।

—এদিক দিয়ে ওরা আসবে না, স্যার। পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস আমারও একটু আধটু ছিল। এমন খাড়া পাহাড়ে উঠার ক্ষমতা কারুর হবে না। আমি ভাল করে চারিদিক ঘুরে দেখেছি। অসম্ভব, স্যার।

—তবুও নজর রাখবে।

—নিশ্চয়ই, স্যার।

—আলো সব ঠিক আছে তো ?

—আছে।

কনরাড গাড়িতে ফিরে এল। এই সময় একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল।

—মনে হচ্ছে, খুব শীগ্‌গির ঝড় শুরু হবে। সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করল। কালো মেঘের ভার আকাশ যেন আর সহ্য করতে পারছে না। ধীরে ধীরে মেঘ আরও জমছে। চল, এবার ফিরি।

—চারিদিকে এত প্রহরী, ম্যাজ বলল, সম্ভবতঃ ওরা এখানে ঢুকতে ভয় পাবে।

—চিন্তা নেই, সব ঠিক আছে। যতদিন এখানে আছে, ততদিন ওরা নিরাপদে

থাকবে। বাইরে গেলেই ওদের খুনের চেষ্টা চলবে। আমাদের তখন সত্যি-কারের সাবধানী হতে হবে।

অনেকদুর থেকে মেঘের গর্জন ভেসে এল।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিল কনরাড।

—রাত্রে কি আবার তুমি বেরোবে? ম্যাজ জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, আরও কয়েকবার টহল দিতে হবে। তাহলে সব ঠিক থাকবে নয়তো সখনই ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে এরা সব ঘরে ঢুকে পড়বে

বারান্দায় টুলের ওপর বসেছিল কেউ। অস্পষ্ট আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছিস না।

—কে, টম নাকি? কনরাড আন্দাজে বলল।

—হ্যাঁ, ও'ব্রায়াম উত্তর দিল।

—আমি ওপরে যাচ্ছি। মিস কোলম্যান কি করছে একবার দেখা দরকার। গুড-নাইট পল, গুড-নাইট সারজেন্ট। ম্যাজ চলে গেল।

ও'ব্রায়ামের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল কনরাড।

—মনে হচ্ছে, শীগ্‌গিরই ঝড় উঠবে।

—হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে। ও'ব্রায়ামের গলায় যেন কোন প্রাণের চিহ্ন নেই।

—এখনও মনে হয় ঘণ্টা খানেক দেরী আছে! ক'টা বাজল এখন?

—পৌনে দশটা। না, না এক ঘণ্টা বাকি কি বলছেন? মনে হয় দশ মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। শুনতে পাচ্ছেন মেঘের গর্জন? আসছে।

—এদিকে সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ সব ঠিক আছে।

কিন্তু ওর গলার শব্দ কনরাডের কানে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।

—টম, তোমার শরীর মনে হচ্ছে, ভাল নেই। কনরাড অন্ধকারে তার মুখ দেখার চেষ্টা করল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভালো আছে তো। টম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যাই চ্যাংড়াটার আবার যাবার সময় হল। কি বিলাসিতা, বাপরে! গা জ্বলে যায়।

—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তারপর আরেকবার টহল মারবো।

—আবার?

—আবার তিনটা নাগাদ। কিছু পরে।

এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে কনরাড লক্ষ্য করল, ও'ব্রায়ামের মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

—টম, তোমার শরীর তাহলে ভাল বলছ ?

—কি আশ্চর্য ! শরীর তো ভালই আছে। একটু মাথা ধরেছে, গরমে। এছাড়া কিছু হয়নি। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো ও'ব্রায়াম। এমন আবহাওয়া আমি একদম পছন্দ করি না।

আবার কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। সমস্ত বাড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

—ঝড় শুরু হল। কনরাড বলল।

ও'ব্রায়াম ঘরে ঢুকল। সিঁড়ির পাশেই একজন বন্দুক নিয়ে বসে আছে।

টমের পেছন পেছন কনরাড সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল।

—বাবা, অসহ্য গরম। একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেলাম। কনরাড রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল।

ও'ব্রায়াম চুপ করে আছে। সে ভাবছে, ফেব্রারি কি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়েছে ? এ কথা মনে পড়তেই তার মুখ কালো হয়ে গেল, গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তার যেন সর্বাঙ্গ কাঁপছে, অস্থির পা, হৃৎস্পন্দন যেন সে শুনতে পাচ্ছে।

প্যাসেজ পাহারা দিচ্ছে আর একজন গার্ড।

শুরু হল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইছে ঝোড়ো হাওয়া।

কনরাড বাইরে লক্ষ্য করল। সাদা তুষারের মত বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির দাপটে জানালাগুলো যেন কাঁপছে। বিদ্যুতের আলোয় গাছগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। মাঝে মাঝে বজ্রাঘাত হচ্ছে। কানে তালা ধরে যাওয়ার উপক্রম।

পিটের ঘরের দরজা খুলল ও'ব্রায়াম।

ড্রেসিং গাউন পরেছে পিট। কাঁধে তোয়ালে নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের দৃশ্য দেখছে।

ওর তিনজন গার্ডের মধ্যে, দুজন ঘরের কোণায় বসে একটি টেবিলে জিন রামী খেলছিল। তৃতীয় প্রহরী বন্দুক হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল, বিরক্তভরা চোখে পিটের দিকে তাকিয়েছিল।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পিট পেছন ফিরে তাকাল। যে দুজন প্রহরী খেলছিল তারা সাবধান হয়ে গেল। একজন প্রায় বন্দুক তুলে তৈরী।

—উঠতে হবে না, খেল। কনরাড বলল, রাত্রিটা কেমন লাগছে ?

—সাংঘাতিক রাত। একজন প্রহরী বলল।

পিট বার বার ও'ব্রায়ামকে দেখছে, এটা কনরাডের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। পিটের চোখে বিস্ময় আর ব্যাগ্রতা। ও'ব্রায়ামের মুখ কতটা বিবর্ণ হয়েছে, তা বুঝতে আর বাকী রইল না কনরাডের। ব্যাপারটা কি ? সে অবাক হল রীতিমত। ও'ব্রায়াম তো সহজে বিচলিত হয় না। ওর চোখে যেন পাশবিক হিংস্রতার ভাব, যা এই প্রথম সে দেখতে পাচ্ছে।

—চল, দাঁতে দাত রেখে ও'ব্রায়াম পিটকে লক্ষ্য করে শব্দ দুটি উচ্চারণ করল।

ও'ব্রায়ামকে অনুসরণ করে পিট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার গার্ড দুজন তাদের খেলায় মেতে উঠল। তৃতীয়জন বন্দুক সামনে রেখে সিগারেটের পকেটে হাত ঢুকাল।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কনরাডও পিটের পেছনে পেছনে চলে গেল।

প্যাসেজ পার হয়ে দুজনে এগিয়ে চলেছে। ও'ব্রায়ামের পেছনে পিট। তারা ফ্রানসেসের ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল। পিটের পেছনে এসে হাজির হয়েছে কনরাড।

স্নানের ঘরের সামনে এসে ও'ব্রায়াম পিটকে বলল—এখানে দাঁড়াও। তারপর ঘরের বাতিটা জেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

দরজার কাছ থেকে কনরাড ভেতরটা উঁকি মারতে লাগল। সে ও'ব্রায়ামকে দেখছে।

কনরাড তাকে লক্ষ্য করছে, সেটা খেয়াল আছে ও'ব্রায়ামের। প্রাণপণ চেষ্টা করে তার মুখের অবস্থা স্বাবাবিক রাখতে হচ্ছে।

কাবার্ডের বড় দরজাটা খুলে ফেলল ও'ব্রায়াম, উঁকি মারলো ভেতরে। তারপর এগিয়ে গেল পর্দা দিয়ে ঘেরা শাওয়ারের কাছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে।

পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে, সে জানে কনরাডের দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে আছে।

এবার শাওয়ারের পর্দাটা ফাঁক করে খোঁজ করল ভেতরটা।

সে আন্দাজ করেছিল, ঐ পর্দা ঘেরা জায়গায় ফেরারির ছোট দেহটা লুকিয়ে থাকবে। তবুও ঐ বামনটাকে হঠাৎ এক কোণায় কুঁকড়ে বসে থাকতে দেখে

ও'ব্রায়ামের পিলে চমকে গেল, আচমকা এক ধাক্কায় তার হৃৎপিণ্ড যেন মুখ থুবড়ে পড়ল।

তার পেট লক্ষ্য করে আছে ফেরারির হাতের রিভলবারের নল।

পলকের জন্য তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ও'ব্রায়াম পর্দা ছেড়ে দিল।

তারপর এগিয়ে গেল বেসিনের কাছে, হাত ধুতে লাগল।

আবার বিকট শব্দে বাজ পড়লো। বিদ্যুতের আলো এসে ঠিকরে পড়ল ছোট্ট জানালা দিয়ে। ঘরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা গেল।

কনরাডও স্নানের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—আমিও হাত ধোব। উঃ, এরকম বৃষ্টি অনেকদিন পর হলো। কি বাজ ডাকছে!

ও'ব্রায়াম সরে দাঁড়াল। সে শাওয়ারের পর্দা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু কনরাড বুঝতে পারল না।

—মনে হচ্ছে, সারারাত বৃষ্টি হবে, তাই না? তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে কনরাড বলল।

—সেই রকম দেখছি।

ও'ব্রায়ামের কণ্ঠস্বরের সেই জড়তা এখনও কাটেনি। কনরাডের বিস্ময়ের সীমা বেড়ে গেল।

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কনরাডের হঠাৎ জানালার দিকে নজর পড়ল।

—জানালায় আর দুটো গরাদ দিলে ভাল হয় না?

ও'ব্রায়াম তাকাল জানালার দিকে—ভালই হবে। পর্দার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। ওর মধ্যে দিয়ে কারোর ঢোকা সম্ভব নয়।

কনরাড দরজার কাছে একটুক্ষণ থেমে বলল—তা ঠিকই বলেছ। যাও ওয়াইনার, এখন স্নান করতে যেতে পার।

পিট স্নানের ঘরে পা বাড়াল।

ও'ব্রায়াম বেরিয়ে আসবার সময় ক্ষণেকের জন্য তাদের চোখাচোখি হল।

তার হাব-ভাব দেখে পিট অবাক হল। আজ লোকটার কি হয়েছে? সে চিন্তা করার চেষ্টা করল? ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, একটা সাংঘাতিক কিছু দেখেছে সে!

হঠাৎ একটা নিদারুণ ভয় পিটকে জড়িয়ে ধরল। যেন অশরীরী কিছু একটা তার কানে কানে বলে গেল হুঁশিয়ার! পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। এরকম ভয় জীবনে এই প্রথম সে পাচ্ছে।

চৌকাঠের বাইরে সবে একটা পা বাড়িয়েছে ও'ব্রায়াম, এমন সময় ওয়াইনারের অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল।

—দাঁড়াও। ভাবছি আজ…আজ…আর ..

পিটের শেষ কথা শোনা গেল না। বাজের শব্দে সেটা চাপা পড়ে গেল। ও'ব্রায়াম লক্ষ্য করল, পিট দারুণ ভয় পাচ্ছে, মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। পিটের শেষ কথাটুকু কি হবে, সেটা বুঝতে বাকি রইল না ও'ব্রায়ামের। পিট বলতে চাইছে—আজ আর সে স্নান করবে না।

—চটপট স্নান সেরে নাও। ও'ব্রায়াম ধমকে উঠল, পিট বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছে।—ভেবেছো কি, তোমার জন্য কি সারারাত এখানে বসে থাকব ?

পিট আবার কি বলতে যাচ্ছিল, বলা তার হল না। তার আগেই ও'ব্রায়াম দরজা বন্ধ করে দিল।

—যত্তসব ছোটলোকের দল। ও'ব্রায়াম বলল, একটু ভাল ব্যবহার করলে হয়, একেবারে ধরাকে সরা মনে করে। কনরাডকে শোনাবার জন্য একটু জোরে জোরে এবার বলল—বাবুর রোজ রাত্রে স্নান চাই। কি সৌখীনতা!

ও'ব্রায়াম দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল। মনে হল ভেতর থেকে দরজা খোলার চেষ্টা চলছে। পিট ভেতর থেকে ঠেলছে।

—দেখলেন মিস কোলম্যানকে? ও'ব্রায়াম প্রশ্ন করল।

তখনও পিট ভেতর থেকে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও'ব্রায়াম তার বিশাল বাহু দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে আছে। পিট দরজার একটা পাল্লাও একটু ফাঁক করতে পারল না।

—ওখানে ম্যাজ আছে। কনরাড সিগারেট বের করে ধরাতে লাগল। ও'ব্রায়ামের মুখের পরিবর্তন সে লক্ষ্য করল না। যাব, ওকে দেখতে যাব।

আবার বজ্রপাত, পৃথিবীও যেন সহ্য করতে পারল না এই বিকট আওয়াজ, কেঁপে উঠল ধরাতল। ঠিক সেই মুহূর্তে ও'ব্রায়াম শুনতে পেল পিটের অস্পষ্ট চীৎকার।

—কিসের একটা আওয়াজ পেলাম না? কনরাড তাকাল ও'ব্রায়ামের দিকে।

—কিসের শব্দ? বৃষ্টি অথবা বাজের শব্দ ছাড়া আর কি হতে পারে?

ততক্ষণে ভেতর থেকে দরজা ঠেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

—কেউ যেন ডাকল মনে হল। কনরাড ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

ছুটে গেল ফ্রানসেসের ঘরের সামনে। ওর বন্ধ দরজায় কান পেতে রইল কয়েক মুহূর্ত।

ও'ব্রায়াম নিশ্চল হয়ে এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন এখুনি শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, হার্টফেল করবে।

কেবল একটানা বর্ষণ হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে বাজের শব্দ, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বন্ধ দরজার আড়াল থেকে তার কানে ভেসে এল অস্পষ্ট আর্তনাদ। ও'ব্রায়ামের ঘাড়ের লোমগুলো সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কাজ শেষ। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে।

* * *

কনরাড আবার এল।

—না, ওদিকটা ঠিক আছে। দুজনে জাঁকিয়ে গল্প করছে। কনরাড তাকাল ও'ব্রায়ামের দিকে। টম, তুমি দেখছি সত্যিই অসুস্থ। যাও, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও, আমি অন্য কাউকে ডেকে নিচ্ছি।

—না না, অত উতলা হবেন না। আমি ঠিক আছি। এই ঝড়-বৃষ্টি আমার সহ্য হয় না, শরীর খারাপ হয়। থাক, বাবুর স্নান শেষ হলেই আমি একটু বিশ্রাম করে নেব।

সিগারেট প্যাকেট বের করল কনরাড, এগিয়ে দিল ও'ব্রায়ামের দিকে। ও'ব্রায়াম ধূমপান করতে রাজী নয়। কেবল সে মাথা নাড়ল।

একটানা ঝড়ের শব্দ তাদের কান সয়ে গেছে।

—টম, তোমার ছেলেটি ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, ভাল আছে। ও'ব্রায়ামের চোখে ভয়।

—সত্যি, তোমার ভাগ্যকে প্রশংসা করতে হয়। কেন বলছি, ভেবে দেখেছ?

—কেন?

—বুঝতে পারলে না? আমারও সখ একটি ছেলের, চিরকাল এই বাসনাই করে এসেছি। কিন্তু জেনীর ইচ্ছা আমার উল্টো। তার মতে দেহের গঠন নাকি নষ্ট হয়ে যাবে। এসব বাজে অভ্যেস ছাড়া কি?

—অভ্যেস নাও হতে পারে। ও'ব্রায়াম কি যে বলছে, নিজের খেয়াল নেই। জেনীর মত মেয়েরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে জড়িয়ে পড়তে চাইবে না, এটাই তো স্বাভাবিক।

—আর দুঃখ করে কি হবে। কিন্তু আমার ভীষণ সাধ একটা ছেলের, একটা মেয়েও আমি চাই।

ও'ব্রায়াম আবার রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

—আপনি তিনটের সময় বেরোবেন বললেন তো। এর মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

—আমিও ঝড়-বৃষ্টি পছন্দ করি না, এই সময় ঘুম আমার একদম হয় না। বাপরে, এ কখন ঢুকেছে, এখনও বেরোবার নাম নেই। কত সময় লাগে?

—প্রায় কুড়ি মিনিট।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোলম্যান মেয়েটা মরারকে দেখেছে। ও যদি একবার মুখ খুলত তাহলে আমাদের এত ঝামেলা পোহাতে হত না।

—খুব সম্ভব ও মুখ খুলবে না। কি করবেন ওকে দিয়ে?

—দেখা যাক। ডি. এ-র উপর নির্ভর করছে।

স্নানের ঘরের থেকে জলের শব্দ শুনতে পেল ও'ব্রায়াম, তার পিলে আবার চমকে উঠল।

—জান টম, ওয়াইনার ছেলেটাকে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। মনে হয়, ওর গালের ঐ বিশ্রী দাগটাই ওকে সঠিক পথে চালনা করবে, জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। আসলে ও দলের অন্যান্যদের মত নয়। ঠিক অসৎ প্রকৃতির নয়।

·· দুঃসাহসিক কাজ করেছে বলে ওর রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় নি। গাড়ি চুরি করা ওর আসল কাজ ছিল। ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। বুঝলাম, ওকে বাগে আনা এমন কিছু কঠিন হবে না।

—ওর বেরোবার সময় হয়নি? কনরাড ঘড়ি দেখল। কুড়ি মিনিট তো কখন হয়ে গেছে।

—লাট সাহেবের কাণ্ডটা একবার দেখুন।

—ওয়াইনার, চটপট! গলা উঁচু পর্দায় তুলে বলল কনরাড।

কনরাড বড্ড তাড়াতাড়ি করছে, ও'ব্রায়ামের এটা অসহ্য মনে হল। ফেরারি কি তার কাজ হাসিল করে চলে গেছে? কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল।

ভিতরে একেবারে নিঃশব্দ, একজন লোক যে স্নান করছে বোঝাই যাচ্ছে না।। তেমনি এক ভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। ড্রেনে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কনরাড দরজার হাতল ঘুরাল।

কপাল কুঁচকে সে বলল—ভেতর থেকে বন্ধ দেখছি।

—সে রকমই মনে হচ্ছে।

কনরাড আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

—কি হল ওয়াইনার?

কোন উত্তর নেই। কনরাড রীতিমত চিন্তায় পড়ল।

—এই ওয়াইনার!

—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ও'ব্রায়ামের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ইচ্ছে করে মনে হয় দরজা খুলছে না।

—মনে হয়।

—তা উত্তর দেবে না কেন? ব্যগ্রকণ্ঠে কনরাড জানতে চাইল।

—লাথি মেরে ওর পেট ফাটিয়ে দেব।

—ওয়াইনার, শুনতে পাচ্ছ?

কনরাড আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

নিঃশব্দ, সাড়া নেই।

—টম, চলে এস, দরজা খোলা দরকার।

—দেখি, আমি একবার হুঙ্কার দিই।

—টম, আমরা ফালতু সময় নষ্ট করছি।

এবার কনরাড জোরে লাথি মারল। দরজা খুলল না, একটু ফাঁক হল।

—দাঁড়ান, আমি একবার চেষ্টা করছি।

ও'ব্রায়ামের দৃঢ় বিশ্বাস, ফেরারি এতক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

তাই সে একটু পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারল।

দরজা খুলে গেল, ও'ব্রায়াম সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

—একি কাণ্ড! কনরাড ও'ব্রায়ামের পেছন পেছন ঢুকল। টম, তাড়াতাড়ি এদিকে এস।

দেখা গেল এক টব জলের মধ্যে পিট চিৎ হয়ে পড়ে আছে, নিশ্চল। জলের নীচে মাথাটা ডোবানো। ওর মাথা আর ঘাড়ের কাছে জলটা লালচে হয়ে আসছে।

বাথটবের ছিপিটা হাত বাড়িয়ে খুলে দিল ও'ব্রায়াম। তারপর পিটের মাথার চুল ধরে টেনে মুখটা উপর দিকে তুলল।

—লোকটা নিশ্চয়ই উন্মাদ। এত গরম জলে মানুষ স্নান করতে পারে?

পিটের মাথাটা টবে ঠেকিয়ে রাখল ও'ব্রায়াম, বুকে হাত দিয়ে স্পন্দন অনুভব করতে লাগল। না, কোন শব্দ নেই। সে মাথা নেড়ে জানাল মারা গেছে।

—নাও, পা দুটো ধর। জল থেকে তুলে ফেলি।

কনরাড এগিয়ে গিয়ে পিটের পা দুটো ধরল।

তারপর ধীরে ধীরে ওরা পিট ওয়াইনারের মৃতদেহটা মাটিতে শুইয়ে দিল।

—চল, বাইরে নিয়ে যাই।

পিটকে প্যাসেজে এনে মাটিতে শুইয়ে দিল।

যদি কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়, তাই কনরাড তার বুকে পিঠে মালিশ করতে লাগল।

পিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এল গার্ড তিনজন, পাশে এসে দাঁড়াল।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ও'ব্রায়াম দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্ত্ত তার সমস্ত শক্তি যেন পিট কেড়ে নিয়েছে, ঠিকমত দাঁড়াতে তার কষ্ট হচ্ছে।

কনরাড চুপ করে বসে নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে।

সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে, বোবার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে পিটের মৃতদেহের দিকে। মাঝে নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে মেঘের গর্জন। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে।

মিনিট পনেরো একটানা মালিশ করার পর কনরাড থামল। গোড়ালীর ওপর বসে রইল।

—মারা গেছে। উইলসন, তবু ম্যাসেজ করে দেখো, কিছু উন্নতি হয় কিনা। এইভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে দেখো।

গার্ড উইলসন তেমনিভাবে ওয়াইনারের পাশে বসে মালিশ করতে শুরু করে দিল।

আবার স্নানের ঘরে এসে ঢুকল কনরাড। ও'ব্রায়ামও তার পেছন পেছন এলো।

সারা ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল কনরাড।

—কাল রক্তের দাগ লেগে আছে। নিশ্চয় পা পিছলে গিয়ে কলে মাথা লেগেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে গরম জলে পড়ে গেছে।

—মনে হচ্ছে তাই।

কনরাড জানালার কাছে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়, দ্বিধা। সন্দেহও যে দেখা দেয়নি ঐ চোখে তাও নয়।

ও'ব্রায়ামের মেরুদণ্ড বেয়ে হিম প্রস্রবন বেড়ে গেল।

—কি দেখছেন? সে জানতে চাইল।

—ভাবছি, সত্যিই কি পা পিছলে পড়েছে। না ওরাই শেষ করে দিয়ে গেছে।

—কি বাজে বকছেন? ওদের পক্ষে সম্ভব হয় কি করে?

—সেটাই আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি। কনরাড চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বিলি কাটতে লাগলো। কেউ এখানে আগে থেকে লুকিয়ে থাকলে তোমার নজরে ঠিক পড়তো, তুমি তো আগেই দেখে নিয়েছো। জানালা দিয়ে কেউ ঢোকবার চেষ্টা করলে নিশ্চয় ওয়াইনার চেঁচাতো। কিন্তু··· কনরাড চুপ করল। তারপর আবার বলল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঐ সময় ওর অস্পষ্ট চীৎকার আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

—আপনি শুনেছেন? কোথায়, আমার কানে তো কিছু আসেনি। তাছাড়া ঐ ছোট্ট জানালা দিয়ে ঢোকা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। একজন বেঁটেখাটো লোক হলেও কষ্ট ভোগ করতে হতো। আর সেই অবসরে ওয়াইনার ঘর থেকে পালিয়ে আসতে পারতো না?

—তা অবশ্য ঠিক বলেছ। কনরাড স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল মৃতদেহের পাশে। কিছু করতে পারলে? উইলসনের উদ্দেশ্যে সে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

উইলসন মাথা নাড়ল।

—মারা গেছে স্যার। চেষ্টা করে কোন ফল পাওয়া যাবে না।

একজন গার্ড ঘর থেকে একটা কম্বল নিয়ে এল, পিটের মৃতদেহ ঢাকা দিয়ে দিল।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ফল পাওয়া গেল, বিরক্তিভরা কণ্ঠে কনরাড বলল, মরারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এত চেষ্টা করলাম, সব বৃথা হয়ে গেল। মরল কিনা দুর্ঘটনায়।

একটা আওয়াজ পেতেই কনরাড পেছন ফিরে তাকাল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রানসেস। ওয়াইনারের কম্বলে ঢাকা মৃতদেহের উপর তার দুটি চোখের তারা স্থির।

—মারা গেছে? ফ্রানসেস জানতে চাইল।

কনরাড তার কাছে এগিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, মারা গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। তুমি ঘরে যাও।

অজানা আতঙ্কে ওর মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল।

—কিভাবে? অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ফ্রানসেসের।

—পা পিছলে জলের কলে মাথা লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারপর টবের জলে পড়ে গেছে। জলটা ভীষণ গরম ছিল। ফুসফুসের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে গরম জল ঢুকে যাওয়ার ফলে মৃত্যু ঘটে।

—পা পিছলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারটাকে আপনি দুর্ঘটনা বলেন?

—হ্যাঁ, দুর্ঘটনা। যাও, তোমার ঘরে যাও।

ততক্ষণে ম্যাক্স এসে ফ্রানসেসের পাশে দাঁড়িয়েছে, বাহুতে হাত রাখল। ফ্রানসেস এক পা সরে গেল। সে অপলক নেত্রে কনরাডকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ তার চোখদুটি দপ করে জ্বলে উঠল।

—এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন করা হয়েছে। পিট জানতো ওরা ওকে খুন করবে। আমাকেও বলেছিল। ওর কথাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। ও বলেছিল, আপনারা কেউ একজন ওদের সাহায্য করবেন। তাই তো ওদের পক্ষে ওকে মারা সম্ভব হল। ও জানত, এমনি হবে। কথা বলতে বলতে ফ্রানসেস চোখের জল সামলাতে পারে না। গাল বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে থাকে। ও বলেছিল, আপনারা কেউ ওকে হত্যা করার জন্য মতলব আঁটতে পারেন।

—এ ধরণের কথা বলা তোমার ঠিক নয়। তোমাকে বলছি, এটা দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়া কিছু নয়। সারজেন্ট ও'ব্রায়াম আর আমি স্নানের ঘরের দরজার

বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। এক পা'ও নড়িনি। পা পিছলে কলের ওপর পড়ে জলের মধ্যে পড়ে যায়।

ফ্রানসেসের চোখের চাউনি একই রকম, তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে।

—সত্যি, আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

—আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। অবিশ্বাস করার মত কিছু নেই।

—হয়তো ঠিক বলেছেন। কিন্তু ওকে খুন করা হয়েছে। আপনি ওকে যেভাবে হোক ধরুন।

—কাকে?

—মরার, মরারকে! এটা মরারেরই কীর্তি। পিট আমায় বলেছিল, মরার ওকে খুন করবেই।

—তুমি হয়তো ভাবছ, এটা মরার করেছে? আসলে তা নয়। এটা একটা দুর্ঘটনা।

—না, এটা মরারের কাজ।

—মিস কোলম্যান, দেখ, মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। এসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো। তোমার কাজ নয়। ওখানে স্নানের ঘরে ওকে খুন করা সম্ভব নয়, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ফ্রানসেস তখনও একভাবে কনরাডের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাত দুটো তার মুঠো পাকানো।

—আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই, অবশেষে বড্ড বেশী কর্কশকণ্ঠে বলল ফ্রানসেস। এর পরিণাম ভোগ করতে হবে পরিণামকে। আমার যা হয় হোক ভয় করি না। আমি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব। ডেভ এণ্ডে মরারকে আমি দেখেছি। জুন আরনটকে সে হত্যা করেছে, আমি দেখেছি। আমি দেখেছি।

*　　　*　　　*

পুলিশের গাড়ী থেকে নামল চার্লস ফরেস্ট আর ক্যাপটেন ম্যাকক্যান, হানটিং লজের বারান্দায় গিয়ে দুজনে উঠল।

বৃষ্টি পড়ছিল।

ঘর থেকে বারান্দায় এল কনরাড।

পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে এল বড় লাউঞ্জে। ম্যাকক্যান তার গা থেকে বর্ষাতি খুলে রাখছিল।

কনরাড বলল—মিস কোলম্যান সাক্ষী দেবে। এবারে মরারকে আমরা ঠিক জায়গায় পেয়েছি। মিস কোলম্যান নিজের চোখে দেখেছে, জুন্‌ আরনটকে মরার খুন করেছে।

ম্যাকক্যানের বর্ষাতি তখনও খোলা হয় নি, মাঝপথে সে থেমে গেল। কনরাডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওর মাংসল মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল।

—তাহলে সে এতদিন কেন চুপ করেছিল? গর্জে উঠল ম্যাকক্যান।

—বলতে পারেন এটা একটা গল্প। কনরাড বলল, উপরে যাওয়ার আগে গড়টা আমাদের শুনে নেওয়া দরকার।

বর্ষাতিটা একটা চেয়ারের দিকে ছুঁড়ে মারল ম্যাকক্যান। তারপর আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাবল, যদি তাই হয়; তাহলে মরার যে যাবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে এটা ঠিক, নিজে একা যাবে না, আর সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর ম্যাকক্যান যে তার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নেয়, সেটাও জানাজানি হয়ে যাবে।

ম্যাকক্যান একটু বিচলিত হল।

—সে যে মিথ্যে বলছে না, তার কি প্রমাণ? সে জানতে চাইল।

—না, সত্যি বলছে। আমি নিশ্চিত, বলল কনরাড, ওর কথা শুনলে আপনারও বুঝতে পারবেন।

ফরেস্ট চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেট বের করল।

—আগে ওয়াইনারের কথা বল।

—দুর্ভাগ্য বলতে হবে। রাত্রে সে স্নান করতে ঢুকেছিল। বন্ধ দরজার বাইরে আমি আর ও'ব্রায়াম দাঁড়িয়েছিলাম। ওয়াইনার স্নানের ঘরে ঢুকবার আগে ও'ব্রায়াম ভাল করে ঘর সার্চ করেছে। তারপর কুড়ি মিনিট কেটে গেল। তখনও ও বেরিয়ে আসছে না দেখে ডাকলাম। কিন্তু সাড়া পেলাম না। দরজা ঠেললাম, দেখি দরজা বন্ধ।

....অগত্যা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি জলের মধ্যে ডুবে আছে ওয়াইনার। ডাক্তার বললেন, তার মাথার পেছনে একটা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার অনুমান, ও কোনরকমে পা পিছলে টবের মধ্যে পড়ে গেছে। আর পড়বার সময় তার আঘাত লেগেছে।

—কিন্তু টবকে সামনে করেই তো সে দাঁড়াবে, ফরেস্ট বললেন, যদি পা

তার পিছলে যায়, তাহলে বাথটবের ভেতরে পড়বে কিভাবে? পেছন দিকে তো পড়বে।

—অবশ্য সেটা বোঝা যায় নি। গিয়ে দেখি ও মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে টেনে তুললাম। কিন্তু কোন লাভ হল না।

—কেউ কিছু করেনি, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত তো পল?

—ওর মৃত্যুটা একটু আজব ধরণের, কিন্তু স্নানের ঘরে কারো ঢোকার ক্ষমতা নেই। একটা ছোট জানালাও যা আছে, তা দিয়ে কারো ঢোকার সাধ্য নেই। একটা ছোটখাটো লোকেরও ঢুকতে অনেক বেগ পেতে হবে, কম করেও তাকে দশ মিনিট সময় ব্যয় করতে হবে। আর ঐ সময়ে সে যথেষ্ট চ্যাচামেচি করতে পারত। সুতরাং এটা দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

—হুঁ, আমাদের মামলার ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল। মরারের বিরুদ্ধে সাক্ষীর একজন সমর্থক প্রয়োজন ছিল, এজন্য ওয়াইনারকে কাজে লাগত।

—আপনি মিস কোলম্যানের কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, আর সাক্ষীর সমর্থকের প্রয়োজন নেই।

—চলুন, ওর বক্তব্য শোনা যাক। ম্যাকক্যান গরগর করে উঠল। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি?

—পল, তুমি আর কিছু বলবে? ফরেস্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ। কনরাড একটা সিগারেট ধরাল। আপনার কি খেয়াল আছে, আপনি আমায় বলেছিলেন, মিস কোলম্যানের না বলার পেছনে কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে। ঠিক, আপনার ধারণাই ঠিক।

…মরারকে সে দেখেছে। কিন্তু সে জানে, এটা খবরের কাগজের মাধ্যমে জানাজানি হয়ে যাবে। এই দুর্বলতার একটি কারণ আছে। ও আমায় বলেছে, ওর নাম কোলম্যান নয়। একজন বাজে, গুণ্ডা লোকের মেয়ে হল সে। ডেভিড টেলটেলার হল ওর বাবা।

—কি বলছ হে? বোসটনের সেই ডেভিড টেলটেলার। ফরেস্ট রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন।

—হ্যাঁ, সেই লোক। আমার ধারণা, যারা নিয়মিত কাগজ পড়ে তাদের ওর কীর্তি কাহিনী সম্বন্ধে কিছুই অজানা নেই। বাচ্চা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে তাদেরকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করত সে। একদিন এ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। ওরা ডেভিড টেলটেলারকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে, চারিদিকে হৈ হৈ

পড়ে যায়। উত্তেজিত জনতা তার বাড়ি ঘেরাও করে ওর স্ত্রীকে হত্যা করে। আর ওর মেয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

…এই হচ্ছে সেই মেয়ে, যার নাম মিস ফ্রানসেস কোলম্যান। পাছে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়, তাই সে মুখ বন্ধ করে আছে। নাম পাল্টে পড়াশুনা শুরু করে সবে নতুন জীবন শুরু করেছে। কেউ তার পরিচয় জানে না। গত তুবছর ধরে সে ফ্রানসেস কোলম্যান নামেই পরিচিত। তারপর জুন আরনট খুন হয়। মরারকে সে খুন করতে দেখেছে।

…সে বুঝতে পেরেছিল, মরারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে খবরের কাগজ তাকে নিয়ে টানাটানি করবে, তার আসল পরিচয় সবাই জেনে ফেলবে। তার সর্বদা ভয়, এমন নিষ্ঠুর বাবার পরিচয় পেলে না জানি তার ভাগ্যে কি ঘটবে। এখন চিন্তা করে দেখছি, ওকে খুব বেশী দোষী বলা যায় না।

—না, দোষ দেওয়াটা ঠিক নয়? ফরেস্ট বললেন। কিন্তু হঠাৎ তার মতের পরিবর্তন হল কেন? এখন সাক্ষী দিতে চাইছেই বা কেন?

—হ্যাঁ, সাক্ষী সে দেবে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মরার ওয়াইনারকে খুন করেছে। তার ইচ্ছা, মরার এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাক।

—আবার ওদিকে মরারকে নিজে চোখে খুন করতে দেখে, ম্যাকক্যান জবাব দিল, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চায়নি। আর এখন না দেখেই সাক্ষী দেবে! এর কোন মানে নেই, আছে কি?

জুন আরনট মরেছে তো তার কি, তার লাভও নেই, ক্ষতিও নেই। কিন্তু ওয়াইনারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। ওয়াইনার তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। ওর উপর ফ্রানসেসের একটা করুণা জেগেছিল। তাই ওর মৃত্যুতে সে গভীরভাবে আঘাত পেয়েছে। অবশ্য, খুব সম্ভব মনে হয়, সাক্ষী দেবে কি, দেবে না, এরকম একটা দোটানার মধ্যে কয়েকদিন ধরে ভুগছিল।

…ওয়াইনারের মৃত্যু ওকে মন স্থির করতে খোরাক জুগিয়েছে। এ খানিকটা মনস্তাত্বিক ব্যাপারও বলতে পারেন।

—ওয়াইনারকে মরার খুন করেছে, এটা সে কি করে ভাবছে? ফরেস্ট প্রশ্ন করলেন।

কনরাড কাঁধ ঝাঁকাল।

—এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে পারব না। তবে ওয়াইনার ওকে বলেছিল মরার তাকে মেরে ফেলবে। ফ্রানসেস ওর কথা বিশ্বাস করেছিল। আমি

অনেক বুঝিয়েও ওর ঐ বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে পারিনি। সে বলতে পারবে না, কি ভাবে এটা ঘটলো তা জানবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস।

—কিন্তু এটা যে মরারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত তো?

—না, আমি জোর গলায় একথা স্বীকার করতে পারবো না। তবে সত্যিই যদি একাজ মরারের হয়ে থাকে, সেটা কি ভাবে সম্ভব হল, তা আমি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারছি না।

—আপনারা দেখছি, দুজনেই মরারকে নিয়ে মেতে উঠেছেন। এবার মেয়েটার কাছে যাওয়া যায় না।

ম্যাকক্যানের কথা বলার কায়দাটা কনরাডের পছন্দ হল না।

—দেখুন একটা কথা ভুলে যাবেন না ক্যাপ্টেন, মিস কোলম্যান একটা মামলার সাক্ষী। এখন তার দায়িত্ব আপনার নয়, আদালতের। ওকে জিজ্ঞাসা-বাদের সময় পুলিশী ধরন-ধারণ আমি একদম পছন্দ করি না। এই মামলায় পুলিশ যুক্ত আছে বলেই আপনাকে ডাকা হয়েছে। মেয়েটার উপর জুলুম করার জন্য নয়।

ম্যাকক্যান রেগে গেল, মুখ লাল হয়ে উঠল।

—এভাবে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। আমি—

—হ্যাঁ পারি, ফরেস্টের বাধা পেয়ে ম্যাকক্যান চুপ করে গেল। আমি দেখব, যাতে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়।

—ঘটনা প্রকাশ না করার জন্য আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারি, ম্যাকক্যান রাগ দমন করে বলল, অপনারা যতই ওর সম্বন্ধে মাতব্বরী করুন বা কেস করুন না কেন, ও দোষী ছাড়া আর কিছু নয়।

—এখন ছাড়ুন ওসব কথা, কনরাড় বলল। চলুন ওর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের মূল কথা হল—মরারকে আমাদের চাই। মিস কোলম্যানই ওকে ধরিয়ে দিতে পারে। আপাতত মেজাজটা ঠাণ্ডা করলে সব দিক দিয়েই ভাল হয়।

ম্যাকক্যানের হাব-ভাব দেখে কনরাডের মুহূর্তের জন্য মনে হল, ও তাকে ঘুঁষি মারবে। কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সংযত করল সে।

—বেশ, চলুন। অবশেষে সে বলল।

ওরা তিনজনে ওপরে, ফ্রানসেসের ঘরে এল।

ফ্রানসেসের চোখের কোলে কালি পড়েছে। একটা চেয়ারে চুপ করে বসেছিল সে। তারই পাশে অন্য একটি চেয়ারে ম্যাজ ফিল্ডিং বসেছিল।

—মিস কোলম্যান, কনরাড বলল, ইনি ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নী। আর ইনি পুলিশ ক্যাপ্টেন ম্যাকক্যান। ইনি মিস কোলম্যান।

ফরেস্ট এগিয়ে এসে কোলম্যানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ওদের দেখে ফ্রাসসেস উঠে দাঁড়ালো।

—মিস কোলম্যান। তুমি আমাদের সাহায্য করতে রাজী হয়েছ শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। এতদিন কেন সাক্ষী দিতে তুমি নারাজ ছিলে তাও জানতে পারলাম। তবে, তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই মামলার ব্যাপারটা যাতে রটে না যায় সেদিকে সতর্ক নজর দেবো। বা অন্য কোন ভয় যদি তোমার থাকে তা থেকেও তোমাকে আমরা নিরাপদে রাখব।

—খুব ভাল কথা। ফ্রানসেস আবার চেয়ার দখল করল।

—আচ্ছা, তোমার বক্তব্য যদি লিখে নেওয়া হয় তাহলে কি তোমার আপত্তি আছে?

—না। আমি চাই, লিখে নেওয়া হোক।

কনরাডের ইঙ্গিত পেয়ে ম্যাজ-ড্রয়ার থেকে নোট বই আর পেনসিল বের করল।

—বেশ, এবার স্বরু কর। কনরাড এসে দাঁড়াল ফ্রানসেসের কাছে।

—তোমার নাম হচ্ছে মিস ফ্রানসেস কোলম্যান, তাই তো? কনরাড প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ।

—আপাততঃ তোমার কোন ঠিকানা নেই?

—না।

—এই মাসের নয় তারিখে জুন আরনটের সঙ্গে তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে?

—আমার কোন কাজকর্ম নেই। পয়সা কড়িও কম। একবার মিস আরনটের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। একটা ছোট রোল আমাকে দেওয়া

হয়েছিল। ওর আর একটি ছবি করার কথা চলছিল। তাই আমি জানতে গিয়েছিলাম আমাকে একটা ছোট ভূমিকা দেওয়া হবে কিনা।

—তুমি তার দেখা পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—ডেভ এণ্ডে তুমি ক'টার সময় গিয়েছিলে ?

—সাতটার মিনিট দশেক আগে।

—গার্ড তোমাকে ঢুকতে দিল ? আপত্তি করলো না ?

—না। গার্ড গেট থেকে জুন আরনটকে টেলিফোন করেছিল। কে একজন টেলিফোন ধরেছিল। সে জানাল, মিস আরনট সাঁতারের পুকুরে আছে। আমি ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

—তুমি সেখানে গেলে ?

—হ্যাঁ। গেট থেকে অনেকটা রাস্তা। সেদিন বেশ গরমও পড়েছিল। মিস আরনট আমাকে বলল, আমি ইচ্ছে করলে, ওর সঙ্গে সাঁতার কাটতে পারি। বলল, পোশাক ছাড়বার ঘরে গিয়ে কসট্যুম পরে আসতে।

—তুমি গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু ও ঘর থেকে আমাকে আর বেরোতে হয়নি। জামাটা সবেমাত্র খুলছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, জুন আরনট কাকে যেন অভ্যর্থনা করে কাছে আসতে বলছে।

—তুমি তখন কি করলে ?

—জামা খোলা হয়ে গেছে। কসট্যুম বের করবো বলে কাবার্ড খুলেছি।

—তারপর ?

ফ্রানসেস যেন একটু ভয় পেল।

—প্রথমে একটু দূরে গুলির শব্দ শুনলাম। তারপর পর পর পাঁচটা কি ছটা গুলির শব্দ কানে এল।

—তুমি তখন কি করলে ?

—আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় কান পেতে রইলাম। মিস আরনট চীৎকার করে উঠল। তার সেই বীভৎস চীৎকার এখনও কানে বাজে। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে দরজার কাছ থেকে বাইরে চোখ রাখলাম।

—দেখলে কিছু ?

ফ্রানসেস কেবল মাথা নাড়ল। ওর মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

—তুমি কি দেখতে পেলে ?

—জলের ধারে ঘাসের ওপর পড়ে আছে জুন আরনট। আর তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে একজন জোয়ান লোক, পরণে তার কালো পোশাক। লোকটা জুনের গা থেকে পোশাক ছিঁড়ে ফেলল। সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল ওর ডান হাতের ছোরা। ঐ সময় মিস আরনট কিছুটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। লোকটাকে বাধা দেওয়ার জন্য দুর্বল হাত দিয়ে চেষ্টা করল। লোকটা ওকে ছোরা মারল।

—তখন তুমি চ্যাঁচালে ?

—না, আমার ঠোঁট দুটো কে যেন সেলাই করে দিয়েছিল। ভয়ে আমার শরীরের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

—তারপর ?

—আমি জানি, লোকটা ওকে মেরে ফেলল। উঃ, কি সাংঘাতিক সে দৃশ্য। ফ্রানসেস মুখ ফেরাল, তার ঠোঁট কাঁপছে। আমি এক পা-ও নড়তে পারলাম না। পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। লোকটা ওর গায়ে সজোরে লাথি মারল। ওর মুখটা আমি দেখেছি। কোন দিন ভুলতে পারব না সেই মুখ। যেন হিংস্র, লোভী কোন জানোয়ার।

কনরাড সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক গোছা ফটো বের করল।

—দেখ তো, এর মধ্যে কোন লোকটি জুন আরনটকে খুন করেছে ? চিনতে পার কিনা ?

ফ্রানসেস কম্পিত হাতে কনরাডের হাত থেকে ফটোগুলি নিল। দুটো ছবির পরেই মরারের ছবি দেখতে পেল সে। তারপর কনরাডের দিকে ফটোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এই লোকটা।

—বুঝলাম। ফটোর গোছাটা পকেটে রেখে দিল কনরাড। তারপর কি হল, মিস কোলম্যান ?

—ঐ সময়ে আর একটি লোক এল ?

আবার ছবির গোছা ফ্রানসেসের হাতে দিল কনরাড।

—দেখ দ্বিতীয় লোকটির ফটো এইখানে আছে কিনা ?

ফ্রানসেস একটার পর একটা ফটো লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর টোনি প্যারেটির ফটোটা ভাল করে দেখে সে বলল—এই যে, এই সেই লোক।

—ঠিক আছে। তারপর কি হলো বল।

—ওরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে একসময় মিস আয়নটের দেহটা ছুঁড়ে দিল জলের মধ্যে। তারপর দেখি কালো পোশাক লোকটা পোশাক ছাড়বার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। তখন তো আমার ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। কোনরকমে পর্দার পেছনে গিয়ে লুকোলাম। রক্তে ভরে আছে লোকটার হাত। তারপর বেসিনে হাত ধুতে ধুতে নিজের মনে গুনগুন করে গান গাইছিল। উঃ, কি ভয়ঙ্কর।

ফ্রানসেস অসুস্থ বোধ করল, সর্বাঙ্গ তার কাঁপতে লাগল।

ম্যাকক্যান অনেক কষ্টে এতক্ষণ মুখ বুঁজে ছিল। নিজেকে আর সংযত করতে পারল না!

—বাঃ, দারুণ গল্পটা বানিয়েছ তো। তোমার কল্পনাশক্তিকে প্রশংসা না করে পারছি না। তোমার এই গল্প সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জান? সবটাই মিথ্যে, বানানো। তুমি মরারকে দেখেছ, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। ও সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, রাগে সে গরগর করতে লাগল, তার বৃষ-স্কন্ধ ফুলে উঠেছে।

...ওয়াইনারের ওপর তোমার করুণা জন্মেছে, তাই না? দুর্বলতা? কারণ তার গালে ঐ বিশ্রী দাগটা তোমার মনকে ভিজিয়ে দিয়েছে দয়ায়। আর চমৎকার বুদ্ধি খেলিয়েছ, মরার ওয়াইনারকে খুন করেছে। তাই গল্প বানিয়েছো, তাই তো?

কনরাডের রাগে চোখ জলছে। কি বলতে গিয়ে বাধা পেল। ফরেস্ট হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু ফ্রানসেস একটুও ভয় পেল না ওর শাসানিতে।

—আপনি ভাবতে পারেন, এটা আমার মনগড়া গল্প। কিন্তু আমি জানি, যা বলছি, সত্যি কথাই বলছি।

—বুঝলাম। তাহলে এতদিন মুখ টিপে ছিলে কেন? সত্যি কথাগুলি মুখ দিয়ে বের কর নি কেন? তুমি আমায় ভড়কি দিলে কি হবে, জুরিরা কিন্তু কিছুতেই শুনবে না, বুঝেছো? ওয়াইনারের প্রতি তোমার ভালবাসা জন্মেছে, আর সেই দৌলতে তুমি মরারের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও।

আবার কনরাড কথা বলতে গিয়ে ফরেস্টের বাধা পেল।

—আপনার এতবড় সাহস, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন। মরারকে বাঁচাবার জন্য আপনি দেখছি উঠে পড়ে লেগেছেন। পিট বলেছিল, পুলিশের

কিছু লোকের থেকে মরার সাহায্য পায়। আপনি ওদের মধ্যে একজন তাই না?

ম্যাকক্যান প্রচণ্ড চটে গেল। তার গালে যদি কেউ একটা চড় মারতো তাহলে বোধহয় এত ক্ষেপে যেত না।

—হায় ঈশ্বর, সে চীৎকার করে উঠল, মুখে রক্তাভা। চুপ কর হতভাগী, এরকম ব্যবহার তুমি আমার সঙ্গে করতে পারো না। দাঁতে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ম্যাকক্যান।

—ক্যাপটেন, একটু সামলে। ফরেস্ট হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, খুব হয়েছে। রাগের মাথায় মিস কোলম্যান যা বলেছে, আসলে তা সে বোঝাতে চায় নি।

ম্যাকক্যান চুপ হয়ে গেল, কেবল রাগে হাতের মুঠো পাকাতে লাগল। একেবারে আসল জায়গায় ঘা মেরেছে, সামলানো মুশকিল। না জেনে-শুনে মেয়েটি প্রায় সত্যি কথা বলে ফেলেছে। সে এখন বুঝতে পারল, মরারের সঙ্গে অত গলাগালি করা ঠিক হয়নি।

—আমি যা বলেছি, আচমকা বলে ওঠে ফ্রানসেস, প্রমাণ দিতে পারি।

—কি ভাবে?

—মুখ মোছবার জন্য মরার বুক পকেট থেকে রুমাল বের করেছিল। ঐ সময় পকেট থেকে একটা সোনার পেন্সিল মাটিতে পড়ে যায়। আবার জুতোর ধাক্কা লেগে ওটা নর্দমায় পড়ে যায়। মরার সেটা তোলবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তার সঙ্গের লোকটি বলল, হাতে আর সময় নেই। নর্দমার মধ্যে কি পড়ে আছে না পড়ে আছে কে দেখতে যাচ্ছে? তাছাড়া ওটা বের করবারও কোন পথ নেই। তাই মরার আর কিছু বলল না।

ম্যাকক্যানকে লক্ষ্য করল ফ্রানসেস। ম্যাকক্যান পাথরের মন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রানসেস আবার বলতে শুরু করল—মরারের জুতোয় যথেষ্ট রক্তের দাগ ছিল, আমার মনে হয় পেন্সিলে রক্ত লেগে থাকতে পারে। পেন্সিলটা বের করতে পারলেই হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

কনরাড ফরেস্টের দিকে তাকাল।

—এর থেকে বেশী প্রমাণ আপনি চান, ক্যাপটেন? কনরাড প্রশ্ন করল, তার মুখে জয়ের হাসির চাপ। মাথা থেকে কেমন বার করেছে মিস কোলম্যান, প্রায় পাকা গোয়েন্দা। তাই না ক্যাপ্টেন?

দরজা ঠেলে সাইগেলের অফিসে ঢুকল ফেরারি।

টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে সে বসল।

—ও মরেছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে গলোউইজ জানতে চাইল।

ফেরারি তার দিকে তাকাল।

—আচ্ছা ঘাস কি সবুজ? ঘাস সবুজ রঙেরই, অন্য কোন রঙ হয় না। যে কাজগুলি হবেই সেগুলি নিয়ে অযথা মাথা খারাপ করে কি লাভ? আলবৎ মরেছে যে কাজ আমি করব বলি, সে কাজ করবই, এটা অবধারিত।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গলোউইজ। পকেট থেকে রুমাল বার করে বার বার মুখ মুছতে লাগল সে।

—দুর্ঘটনার যে মৃত্যু ঘটেছে, এটা সবাই বুঝতে পারবে তো?

—হ্যাঁ, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যেমন পরিকল্পনা তেমনি কাজ। ফেরারি তার থাবার মত হাতদুটি টেবিলের ওপর প্রসারিত করল, তাকাল। পুতুলের চোখে যেমন পুঁতি নড়ে না, তেমনি তার চোখ দুটি নিষ্প্রাণ। মতলব ঠিকমত আঁটতে পারলে কোন কাজই অসাধ্য থাকে না। ও মরেছে, এবার মেয়েটার পালা চিন্তা করতে হবে।

—তোমাকে ডেকে এনে ভালই করেছি দেখছি, গলোউইজ বলল, ও আমরা চিন্তাই করতে পারিনি, ওকে এত তাড়াতাড়ি সাবাড় করা যাবে।

—এক দুদিনের অভিজ্ঞতা তো নয়, সব কিছু সম্ভব আমার পক্ষে।

—এবার মেয়েটার বিষয়ে কিছু বল। সাইগেল জানতে চাইল। ওকে তুমি কিভাবে মারবে?

—আর একটা দুর্ঘটনা? ফেরারির মুখে হাসি। গলোউইজের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই চাই। তবে মনে হয় সপ্তাখানেক পরে করলে ভাল হবে! ওয়াইনারের পরেই ওর মৃত্যু ঘটলে সবার মনে সন্দেহ জাগবে। তাই না?

—উত্তম কথা। বেশী সময় পাওয়া গেলে সপ্তাখানেক দেরী করতে দোষ কি।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে নিল সাইগেল।

—হ্যালো, সাইগেল।

ফোনের অন্য প্রান্তে থেকে এক মিনিট কথা শুনল সে। ফেরারি আর

গলোউইজ লক্ষ্য করল, সাইগেলের মুখ কঠিন হয়ে উঠছে। রিসিভারটা সে গলোউইজের হাতে দিল।

ম্যাকক্যান মনে হল চটে গেছে।

—ক্যাপ্টেন ? গলোউইজ প্রশ্ন করল।

—ওয়াইনারকে যে খুন করা হবে, আমাকে জানানো হয়নি কেন ? ম্যাক্যান হুঙ্কার দিয়ে উঠল। শুনুন, মেয়েটা সব ফাঁস করে দিয়েছে।

গলোউইজের চক্ষু চড়কগাছ। তবু পাশে ফেরারি থাকায় সে একটু ধাতস্থ হল, খানিকটা নিরাপদ বোধ করল।

—বলুক। আমি ওসব কথা পরোয়া করি না। আপনি চঞ্চল হচ্ছেন কেন ?

ম্যাকক্যান অতি নিষ্ঠুরভাবে উত্তর দিল—আপনি কি পাগল হলেন ? কোলম্যান মেয়েটা বলেছে, হত্যা করার সময় সে মরারকে দেখেছে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে একথাই বলবে।

—নিকুচি করেছে সাক্ষীর। সে বলবে খুন করেছে, মরার তার উল্টে বলবে। খুন সে করেনি। মেয়েটা যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ কি ?

—প্রমান আছে তার কাছে।

কথাটা শুনে গলোউইজের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

—কি বলতে চাইছো তুমি ?

—ও বলেছে, জুনকে খুন করবার পর মরার পকেট থেকে রুমাল বের করে ছিল। ঐ সময় একটা সোনার পেন্সিল ওর পকেট থেকে গড়িয়ে পড়ে তার রক্তমাখা জুতোর ওপর, তারপর ছিটকে গিয়ে নর্দমায় পড়ে যায়। নর্দমা থেকে পেনসিলটা তোলার চেষ্টা করেছিল মরার। কিন্তু সেটার নাগাল না পেয়ে হতভাগা লোকটা পেনসিলটা ওখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে এসেছে।

...এটা লক্ষ্য করেছে কোলম্যান মেয়েটা। ডি. এ. ওখান থেকে পেনসিলটা উদ্ধার করলেই মরার কুপোকাত। বাঁচবার কোন উপাই নেই। এই পেনসিলে অবশ্যই পাওয়া যাবে রক্তের দাগ আর মরারের আঙুলের ছাপ। এমন প্রমাণে জুরিদের আর আনন্দ ধরবে না। এবার বুঝতে পারছেন, কেন আমি চঞ্চল হচ্ছি ?

গলোউইজের মুখটা হঠাৎ সবুজে নীল হয়ে গেল।

—সত্যি ? অস্পষ্ট গলায় সে প্রশ্ন করল।

—আমি নয়তো জানলাম কি করে? এইমাত্র ফরেস্টকে সে এসব কথা বলছিল, আমি সামনে ছিলাম। ওরা নিশ্চয় যাবে পেনসিল আনতে। তখনই সত্যি মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে।

গলোউইজের মাথা দ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে। তাহলে মরারের জন্য ইলেকট্রিক চেয়ার তো পাতাই আছে।

—ঐ নর্দমাটা কোথায়?

—পুকুরের পাশে কাপড় ছাড়বার ঘরে।

—ডি. এ. কি লোক পাঠাচ্ছে?

—এখুনি কনরাড, ও'ব্রায়াম আর একদল পুলিশ নিয়ে ডেভ-এণ্ড-এ যাচ্ছে।

—ওরা কি বেরিয়ে পড়েছে?

—না, বেরোয়নি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা বেরোবে।

—ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। আমি ব্যবস্থা করছি।

রিসিভার নামিয়ে রাখল গলোউইজ। তার চোখের তারা ঘুরে গেল সাইগেলের দিকে।

—স্নানের পুকুরের পাশে কাপড় ছাড়বার ঘরে মরার একটা সোনার পেনসিল ফেলে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করার সময় পেনসিলটা তার জুতোর ওপর পড়ে যায়। তারপর জুতার ধাক্কা খেয়ে পেনসিল গড়িয়ে নর্দমার মধ্যে পড়ে যায়। পেনসিলটার খোঁজে তিন চারজন পুলিশ যাচ্ছে। তুমি এখুনি যাও, পেনসিলটা নিয়ে এসো। আমার ওটা চাই।

এ কাজের দায়িত্ব পেয়ে সাইগেল খুশী হল। ওয়াইনারের ব্যাপারে কিছু করতে না পারায় সে একটু দমে গিয়েছিল। ফেরারি আসায় আরও নানা রকম চিন্তা এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। এই কাজটা ঠিক মত করতে পারলে আত্মসম্মান কিছুটা বাঁচবে।

—বেশ, আমি ব্যবস্থা করছি। সাইগেল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফেরারি চেয়ার থেকে নেমে পড়ল, হাতদুটো টান টান করল।

—ভাবছি শুতে যাবো। বিছানায় দেহ স্পর্শ করানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা কাজ করতে শুরু করে। মরার কি নিজেই মেয়ে মানুষটাকে মেরেছে?

গলোউইজ কাঁধ ঝাঁকুনী দিল।

—জানি না। আমার প্রয়োজন নেই।

পেছনে হাতের ওপর হাত রেখে ফেরারি একটু পায়চারি করল।

—এই সমস্ত ব্যক্তিগত খুন সিনডিকেট একদম বরদাস্ত করে না।

গলোউইজ চুপ করে রইল।

—মরারের ওপর সিনডিকেট সন্তুষ্ট নয়। সম্প্রতি বড় বেশী স্বাধীন হয়ে উঠেছে।

আচমকা একটা ঠাণ্ডা পরশ গলোউইজ অনুভব করল সর্বাঙ্গে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

—চিন্তার কিছু নেই। সিনডিকেট সব ব্যবস্থা করতে পারবে। সাইগেল লোকটা কেমন? এখানে থাকবার উপযুক্ত?

—সাইগেলকে দিয়ে কাজ চলবে। গলোউইজ অতি সন্তর্পণে উত্তর দিল। ওয়াইনারের বেলায় সে কিছু করতে পারেনি ঠিক কথা, কিন্তু ওকে নিয়ে কোন সময় কোন ঝামেলায় জড়াতে হয়নি।

ফেরারি ঘাড় নাড়ল।

—একটা কাজের অক্ষমতাই যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্ততঃ সিনডিকেটের তাই মত। যাক ওসব কথা, আপনারা বুঝবেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফেরারি। প্যাসেজ পার হয়ে বার-এ-এসে প্রবেশ করল সে। মদ খাওয়ার লোভ হল তার। কখন কখন সে মদ খায়। কিন্তু একটা খুঁতহীন খুনের পর একটু হুইস্কী খাওয়া তার অভ্যাস।

এই সময়ে অন্য দরজা দিয়ে বার-এ এসে ঢুকল ডলোরাস।

কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ডলোরাস, বারটেনডারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ফেরারি পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে এসেছে। ডলোরাসের মনে হল, একটা সাপ যেন তার গায়ের কাছে এসে পড়েছে। হিমশীতল রক্ত যেন বইছে তার সর্বাঙ্গে। সে ফেরারিকে লক্ষ্য করল। ওর দৃষ্টিতে যেন প্রাণ নেই, শীতল। ডলোরাস সত্যিই কেঁপে উঠল।

—কি খাবে? ফেরারি জানতে চাইল, এসো, এক সঙ্গে খাওয়া যাক। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের একা থাকা নিরাপদ নয়।

লোকটা সাংঘাতিক, ডলোরাসের সন্দেহ হল। সে অনুভব করল, ঐ লোকটার একরকম ক্ষমতাও আছে, যেটা সে ঠিকমত বুঝতে পারল না। এই রকম বামন চেহারার লোককে সে পছন্দই করত না, কিন্তু এই লোকটা—

—আমি একটা মার্টিনি খাব। ডলোরাস বলল, তুমি এখানে নতুন এসেছ, তাই না?

—আমি ভিটো ফেরারি।

ডলোরাসের মুখের রক্ত এক পরতা হালকা হয়ে গেল। এই পরিবর্তন ফেরারির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। সে একটু হাসল, মনে মনে খুশী হল।

—তুমি কি শুনতে পেয়েছ আমার কথা?

—হ্যাঁ।

বার-এর কাছে কয়েকটা চাপড় মারল ফেরারি।

ইঙ্গিত পেয়ে বারটেনডার ছুটে এল।

একটা টুলের ওপর ফেরারি উঠে বসল।

—এই মহিলার জন্যে একটা মার্টিনি আন, আর আমার একটা হুইস্কি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওদের মদ এল।

গেলাস তুলে নিল ফেরারি, একটা চুমুক দিয়ে বলল—খাও। তারপর পকেট থেকে বের করল সিগারেট কেস, এগিয়ে দিল ডলোরাসের দিকে।

ডলোরাস হাত বাড়াতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য থামল। কেসটার দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এমন সুন্দর কাজ করা জিনিস সে এই প্রথম দেখল।

সিগারেট কেসটা সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে মোড়া। ভেতরে অসংখ্য হীরে লাগানো। এক একটা আলপিনের মাথার চেয়ে একটু বড়। ওর তাকানোর ভঙ্গি দেখে ফেরারি কেসটা বন্ধ করে ডলোরাসের হাতে দিল। একটা চুনি জ্বলজ্বল করছে কেসের মাঝখানে, আর পেছনে পান্না দিয়ে তৈরী তার নামের প্রথম অক্ষর।

—তোমার পছন্দ কেসটা? ফেরারি প্রশ্ন করল।

ডলোরাস অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

—আগে এরকম জিনিস দেখিনি, ভারি চমৎকার।

—আমি একজন রাজার কাছ থেকে এটা উপহার পেয়েছিলাম। ফেরারির কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ, তাঁর একটা ছোট কাজ করে দিয়েছিলাম। ভিটোর হাত থেকে কেসটা নিয়ে কয়েকবার জামার হাতায় ঘসলো সে, নেড়েচেড়ে দেখল। এমন জিনিষের আমার অভাব নেই। হীরে তোমার ভাল লাগে?

—হীরে কে না পছন্দ করে? এবারে যেন নতুন চোখে ডলোরাস তাকাল

ওর দিকে। হয়তো এমন জিনিস মরার আর গলোউইজ চোখেই দেখেনি। এই বেঁটেখাটো লোকটাকে দেখলেই ভয় করে, কিন্তু অর্থ আর ক্ষমতা তার যথেষ্ট আছে। লোকটা কি গলোউইজের চাইতে ক্ষমতাশালী? জানতে পারলে ভাল হত।

—আমার হীরের কলারটা দেখলে তুমি খুশি হবে। ডলোরাসের দিকে তাকিয়ে সে গেলাসে চুমুক দিল। গলোউইজের সঙ্গে তোমার হৃদ্যতা আছে না?

এমন প্রশ্ন ডলোরাস আশা করতে পারিনি, সে একটু হকচকিয়ে গেল।

—ও জ্যাকের বন্ধু। জ্যাকের বন্ধু মানে আমারও বন্ধু।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু ওর ওপর খুব বেশী নির্ভর করা ঠিক হবে না।

ডলোরাস ফেরারির দিকে তাকাল, মনে মনে সে একথাটা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে। খবরটা তার কাছে খুবই মূল্যবান মনে হল আর ঠিক সময়ে জানার জন্য তার ভয়টা দূর হল।

—হ্যাঁ, তুমি তো জানবেই। সে বলল।

—ফেরারির ঠোঁটে হাসি।

—হ্যাঁ, আমি জানি।

—তুমি নিশ্চয় এটাও জান, আমার স্বামীর অবর্তমানে এখানে কে বসবে?

ফেরারি মাথা নাড়ল।

—আমার জানা কর্তব্য। বুকে একটা টোকা মারল সে। আমি বলছি না যে তোমার স্বামীর একটা কিছু হবেই। কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু যদি ঘটে, তুমি কি খুব বেশী দুঃখিত হবে?

ডলোরাসের মনে হল, এই সময়ে ফেরারির কাছে কোন কিছু চাপা না রাখাই যুক্তিসম্পন্ন।

মাথা নাড়ল সে।

—মোটামুটি।

ফেরারি একই ভাবে মাথা নাড়ল।

—আমারও একটু ফুর্তি দরকার। একটুক্ষণ থেমে আবার সে বলল, জীবনে তো অনেক দেখলাম। এই শহরে কি সুন্দরী মেয়ের অভাব আছে? কিন্তু সব চেয়ে যে ভাল তাকেই আমার পছন্দ। তবে আমার তেমন ব্যস্ততা

নেই। এখুনি না হলে চলবে না, তা নয়। আমি অপেক্ষা করতে পারি। টুল থেকে লাফ দিয়ে নামল সে।

...হীরের কলারটা আমার ওপরের ঘরে আছে। দেখবে না কি? পরে দেখতে পার। মন চাইলে একটা পেতেও পার।

ডলোরাস স্থির, একভাবে তাকিয়ে রইল ফেব্রারির দিকে। ও জানে, শুধু হীরে দেখানো নয়, এর পেছনে আরও কিছু কারণ আছে।

—তাছাড়া, যার দিকে তাকিয়ে আছি, সে সত্যিই আসল না নকল সোনা, সেটা যাচাই করে দেখার ক্ষমতা আছে। অবশ্য আমার ঘরে তোমার যেতে যদি আপত্তি থাকে, তাহলে আসার প্রয়োজন নেই। তুমি কি আমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছ না, কি ধাঁধাঁয় ভুগছো?

হঠাৎ তার মনটা দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এই সাংঘাতিক লোকটা যে তাকে স্পর্শ করবে, সেটাও জানে। গলোউইজের তৈলাক্ত, মেদবহুল দেহের চেয়ে কি খারাপ?

—তুমি দেখতে চাও, আসল সোনা কিনা? নিরাশ হয়ো না। তুমি কোন ঘরে থাক? আমাকে একটু হুঁশিয়ার হতে হবে, তুমি যাও। কয়েক মিনিট পরেই আমি যাচ্ছি।

*　　　　*　　　　*

পোশাক ছাড়বার ঘরের সামনে এসে কনরাড দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলল।

বাতির সুইচের জন্য দেওয়ালের দিকে হাত বাড়াল। তার পেছনে ও'ব্রায়ামের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

—সুইচটা তো পাচ্ছি না, গেল কোথায়? এখনও সুইচ খুঁজছে কনরাড। ও'ব্রায়াম টর্চ জেলে আলোটা ঘরের চারপাশে একচক্কর ঘুরিয়ে দেখাল।

—ঐ তো, আর একটু বাঁদিকে।

বাতি জেলে ঘরের মাঝখানে এল কনরাড। সৌখিন ঘর, আসবাবে সাজানো। সামনেই কয়েকটি শাওয়ার ক্যাবিনেট। প্রত্যেকটির সঙ্গে ওয়াড্রোব লাগানো, চেয়ার আর শাওয়ার। ঘরের কোনায় কালো পর্দা। ফ্রানসেস ওরই পেছনে লুকিয়েছিল।

মেলরী একজন পুলিশ ফটোগ্রাফার। ঘরে ঢুকে ঠিক জায়গায় ক্যামেরা বসাল।

ও'ব্রায়াম দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে, ড্রেনের মুখে একটা ছু-ইঞ্চি গ্রীল লাগানো—ঐ দিকে আঙুল তুলে বলল—এটাই হবে।

কনরাড সেদিকে এগিয়ে গেল। গ্রীলের ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখবার চেষ্টা করল ও'ব্রায়াম। কিছু শুকনো খড়কুটো ড্রেনের নিচে জমে আছে। হয়তো হাওয়া বাতাসে কখন উড়ে এসে পড়ে।

—দেখা যাচ্ছে, ড্রেন বেশ কিছুদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি, কনরাড বলল —পেনসিল ওর মধ্যেই আছে।

নিচু হয়ে ও'ব্রায়াম ড্রেনটা পরীক্ষা করল।

—সিমেণ্ট দিয়ে চারদিক আটকানো। সে বলল, এর মধ্যে থেকে মরার কিভাবে পেনসিল বের করবে? মেলরী, যন্ত্রপাতি আছে।

—বাইরে গাড়ীতে আছে নিয়ে আসছি।

পায়ের গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে কনরাড বসল, একটা সিগারেট ধরাল।

—পেনসিল ওখানে থাকলে বের করে নেওয়া যাবে।

—দাঁড়াও, আগে বের করা হোক। এখনও হাতে তো আসেনি।

—যাবে। প্রায় অবিশ্বাস্য, বুঝলে ও'ব্রায়াম। গুণ্ডাটাকে ধরবার জন্য অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি।

—সারজেণ্ট। মেলরী চেঁচিয়ে উঠল।

ছুজনেই তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—মনে হচ্ছে বাইরে কেউ এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মেলরী বলল।

একটা গুলি এসে বিঁধলো মেলরীর বাহুতে, চেপে ধরল সে, সবাই তারা আশঙ্কায় ছুলছে।

ও'ব্রায়াম এক লাফে এগিয়ে গেল সুইচের দিকে, নিবিয়ে দিল বাতি। মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

—লেগেছে মেলরী? দরজার কাছ থেকে টেনে আনল মেলরীকে, দেওয়ালের কাছে দাঁড় করাল ও'ব্রায়াম।

—লেগেছে হাতে, মেলরী মাটিতে বসে পড়ল।

কনরাড দরজার কাছে এগিয়ে এসে বাইরের দিকে উঁকি মারল। কিন্তু চোখে তার কিছুই ধরা পড়ল না।

—মরারের লোক। কনরাড বলল। পকেট থেকে রিভলবার বের করল।

দেখ তো টম, টেলিফোনে লাইন পাও কিনা। হেড কোয়ার্টারে খবর দিয়ে কিছু লোক পাঠিয়ে দিতে বল।

দরজাটা বন্ধ করে দিল ও'ব্রায়াম।

—সাবধানে টর্চ জ্বালবে টম। তোমার বাঁ দিকে টেলিফোন দেখছি মনে হচ্ছে।

ও'ব্রায়াম টর্চ জেলে টেলিফোন দেখল।

আবার গুলির শব্দ অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে এল। অন্ধকারকে বার বার চিরে দিচ্ছে হলদে আলোর শিখা। জানালায় গুলি লাগতে কাঁচ চুরমার হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ওদের গায়েও এসে লাগলো কাঁচের টুকরো। দেওয়াল থেকে খসে পড়ল প্লাস্টার।

—উঃ, কী জ্বালা রে বাবা! দাঁতে দাঁত রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও'ব্রায়াম। মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল।

যেখানে হলদে আলোর রেখা দেখা গিয়েছিল, সে দিকটা লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়ল।

ওপাশ থেকে গোটা কয়েক বন্দুক এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, গর্জন শোনা গেল। ভাঙ্গা জানালা ভেদ করে ঘরের মধ্যে বুলেট আসছে।

—খুব সম্ভব এক দল এসেছে। কনরাড বলল। আর দেরী করা ঠিক হবে না, টম।

মাটিতে টেলিফোন নামিয়ে নিল ও'ব্রায়াম। ডায়াল ঘোরানোর শব্দ কনরাড শুনতে পাচ্ছে।

ওদের আসতে মিনিট পনেরো লাগবে। তবে হতভাগাগুলো যদি গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে……

হামাগুড়ি দিয়ে কনরাড মেলরীর কাছে এগিয়ে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে মেলরী।

—রক্ত পড়েছে?

—অল্প। চামড়া কেটে গেছে। যদি একটা বন্দুক পেতাম।

সেই সময় কনরাড লক্ষ্য করল, কে একজন জানালার কাছে এগিয়ে এসেছে। দ্বিরুক্তি না করে সোজা গুলি ছুঁড়ল সে। লোকটাকে আর দেখা গেল না, মাটিতে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

—শেষ হল একজন। কনরাড বলল।

মেশিনগানের হুঙ্কারে বাতাস কেঁপে উঠেছে বারবার। ওদের গায়ের ওপর পড়েছে খসে পড়া প্লাস্টার। কাঁচ আর কাঠের টুকরো ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে।

—টিউনিশিয়ার কথা মনে হচ্ছে। মেলরী বলল। কনরাডের পাশে উপুড় হয়ে শুয়েছে সে। টিউনিশিয়ার লড়াই করছে সে।

—হেড কোয়াটার্সের লাইন পেলে টম?

—অনেক কষ্টে। ফোন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু খবরটা দিয়ে দিতে পেরেছি।

—এসো, দরজার কাছে। এক সঙ্গে ওরা এগিয়ে এলে আমাদের রুখতে হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে কনরাড দরজার কাছে এগিয়ে এল। পুকুরের পাড দিয়ে একটা লোককে দৌড়ে আসতে দেখেই ও'ব্রায়াম গুলি ছুঁড়ল। একটা চীৎকার, তারপর সব শেষ। লোকটাকে আর দেখা গেল না।

—মোটামুটি ভালই হচ্ছে, কি বল? অন্ধকারে কনরাডের মুখে হাসি ফুটে উঠল, দুটোর মৃত্যু ঘটল।

—কিন্তু পেন্সিলটা বের করতে হবে তো, ও'ব্রায়াম বলল, একটা যন্ত্র হলে হতো।

—এই! সাবধান! কনরাড বলল, একটু পরে।

কনরাডের কথা গ্রাহ্য করল না ও'ব্রায়াম, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। ওর মাথা আর কাঁধ প্রায় দরজায় মাঝখানে এসে পড়েছে। যন্ত্রের ব্যাগটা টেনে নিল। ওর মাথার ওপর দিয়ে বুলেট ছুটে গেল। ধীরে ধীরে সে পেছোতে লাগল।

—পেয়েছি, অন্ধকারে মেলরীকে সে বলল। নাও দেখ, গ্রীলটা ভাঙতে পার কিনা।

আবার মেশিনগান থেকে গুলি ছুটে আসছে। ওরা তিনজন প্রায় মেঝের সঙ্গে লেপ্টে গেল। মেশিনগানের গুলিতে ঘরের দেওয়ালগুলিতে অজস্র ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

—হুঁশিয়ার। কনরাড বলল, দুটো লোক ছুটে আসছে, হাতে বন্দুক।

ও'ব্রায়াম আর কনরাডের রিভলবার এক সঙ্গে গর্জে উঠল। একজন হুম

করে পড়ে গেল পুকুরে। অন্যজন শূন্যে বন্দুক তুলে কয়েক পা এগিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

—আমার রিভলবারে আর চারটে গুলি আছে। তোমার কটা? কনরাড জানতে চাইল।

—কয়েকটা আছে। ও'ব্রায়াম বলল, আপনি আর গুলি ছুঁড়বেন না। আমি দেখছি।

দরজার দিকে আবার সে সাপের মত বুকে ভর দিয়ে এগোতে লাগল।

—শালার পেন্সিল, মেলরী বলল, বেরোবে না। এবার বের করছি।

—দেখ, চেষ্টা করে। পার কিনা বের করতে। কনরাড বলল।

পরপর দু'বার ও'ব্রায়ামের রিভলবার গর্জে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো মেশিনগান দরজা তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলকানি চারিদিকে ঠিকরে পড়ল। ঐ সময়ে কনরাড লক্ষ্য করল, ও'ব্রায়ামের শরীরটা যেন ঢেউয়ের মত দুলে উঠল।

—মেলরী, ওর হাত থেকে রিভলবারটা নিতে পার কিনা দেখ। দরজাটা সামলাও। বলেই কনরাড হামাগুড়ি দিয়ে ও'ব্রায়ামের কাছে গেল। ওর গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ল, অন্ধকারে দেখবার চেষ্টা করল।

—লেগেছে টম? কনরাড জানে এ প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না।

কনরাড ছোট টর্চ বের করে কোট দিয়ে আড়াল করে নিয়ে জ্বালাল।

আলো আঁধারির মধ্যে ও'ব্রায়াম তার দিকে তাকাল, দুটি চোখ খোলা। যন্ত্রণায় বিবর্ণ, পরিবর্তন হয়েছে তার মুখের চেহারায়।

—ওটা দুর্ঘটনা নয়, পল। নিঃশ্বাস টানবার চেষ্টা করল সে। গলার ভিতরে ঘড়ঘড় শব্দ।

ওর মাথাটা কনরাড তুলে ধরল।

—চুপ কর টম, জোর করে কিছু বলতে হবে না।

—ফেরারি···আমার···ছেলেটা—ব্যস সব শেষ। তার মাথাটা ঢলে পড়ল কনরাডের হাতের উপর।

কনরাড তাকে ধীরে ধীরে মেঝেতে শুইয়ে দিল।

ঠিক সময়ে কনরাড লক্ষ্য করল, মাথা নিচু করে তিনটে লোক একসঙ্গে ছুটে আসছে।

মেলরী গুলি ছুঁড়ল, লাগলো একজনের। মাথা ঘুরে পড়ল মাটিতে।

কনরাড গুলি ছুঁড়ল। মেলরীর মাথার পাশ ঘেঁসে তার গুলি চলে গেল।

পেটে হাত দিয়ে আরেকজন বসে পড়ল।

তৃতীয় লোকটি একটুও ঘাবড়ায়নি, সামনে গুলি চালাচ্ছে সে, দরজা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

দরজার কাছ থেকে মেলরীকে টেনে নিয়ে এল কনরাড। দুজনে দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে নানা জায়গায় বৃষ্টির মত গুলি এসে পড়ছে।

এবারে একসঙ্গে অনেকগুলি গুলির শব্দ শোনা গেল পুকুরের ওপার থেকে। রিভলবার আর টমসন থেকে মুহুর্মুহু গুলি ছুটে আসছে। যে লোকটা দৌড়ে আসছিল, তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

—খুব সম্ভব, আমাদের লোক এসে পড়েছে। কনরাডের গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

হঠাৎ গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে কেবল শূন্যতা।

অন্ধকারে একটা মোটা লোক খুব সন্তর্পনে এগিয়ে আসছে। লোকটা যে লেফটেনান্ট বার্ডিন, চিনতে আর দেরী হলো না।

—পল?

—এখানে। কনরাড বাইরে এল। ওঃ, রীতিমত একটা ঝড় বয়ে গেল বুঝলে।

—পেলে পেনসিল?

—এখনও জিজ্ঞেস করার ফুরসৎ পায়নি। বেচারা টমের মরণ হয়েছে।

—তাই নাকি? বার্ডিন টর্চের আলো দিয়ে চারদিক ভাল করে দেখতে লাগল, দেখছি গোটা রাখেনি কিছুই। গুনে দেখলাম, ময়ারের পাঁচটা গুণ্ডা পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দুটো প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে।

—পেনসিলটা পেয়েছে, মেলরী?

—অবশ্যই। শালাকে বের করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

কালো ক্যাডিলাক বড় রাস্তা থেকে ঢুকল একটা গলিতে প্যারাডাইস ক্লাবের পেছন দিকে থামাল। গেট বন্ধ, ভেতরে দুজন প্রহরী পাহারারত। গাড়ির হেডলাইট দুবার জ্বলল, দুবার নিভল।

গার্ড দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল গাড়ি। গাড়ির মধ্যে উঁকি মেরেই সোজা হয়ে দাঁড়লে গার্ড, স্যালুট করল।

ঘুরপথ দিয়ে গাড়ি দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল। পেছনের দরজার কাছে থামল।

কালো পোশাক পরা একজন লোক নামল গাড়ি থেকে।

গার্ড দরজা খুলল, পরমুহূর্তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে স্যালুট করল—মিঃ মরার—

—চোপ, মরার গর্জে উঠল, কথা বলতে হবে না। এমন কিছু দামী কথা তুমি বলবে না। গলোউইজ কোথায়?

—মিঃ সাইগেলের অফিসে আছে। সে কয়েক পা পেছনে সরে গেল।

মরার ক্ষেপে গেছে, মুখে তার রক্তাভা, চোখে খুনের ইশারা।

প্যাসেজ পেরিয়ে সে সাইগেলের অফিসের সামনে এলো, দরজা বন্ধ, এক মুহূর্ত থামল। ভেতর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কথাবার্তা। মরারের মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল। হাতল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল।

তামাকের ধোঁয়ায় সারাঘর ভরপুর। টেবিলের তিনদিকে তিনটি চেয়ারে তিনজন বসে আছে—ম্যাকক্যান, ফেরারি আর সাইগেল। অন্যদিকে বসেছে গলোউইজ, তার মোটা আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট।

মরারকে দেখে চারজনই বিস্ময় বোধ করল।

কেবল ফেরারির মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। যেন ভূত দেখেছে, এমনই ভাবে বাকি তিনজন মরারকে দেখতে লাগল।

একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে গলোউইজ বলল—জ্যাক, তুমি কেন—হায় ঈশ্বর! তোমার আসবার—

দরজাটা বন্ধ করে দিল মরার, পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। কোটের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে সে ফেরারিকে লক্ষ্য করতে লাগল। এখানে কি করতে এসেছে? সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে জিজ্ঞেস করল সে।

—জ্যাক, তোমার এখানে আসা কিছুতেই ঠিক হয়নি। গলোউইজ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যদি কোনক্রমে কারো নজরে পড়ে যাও। তুমি কি জান তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে?

—ও ওখানে কি করছে? গলোউইজের কথা যেন মরার শুনতেই পায়নি। ফেরারিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—ওকে ? ওকে কোলম্যান মেয়েটার জন্য আনা হয়েছে, গলোউইজ উত্তর দিল, ব্যবস্থা করবে।

—কে আনিয়েছে ওকে ? তুমি ?

—সিনডিকেট।

—সিনডিকেট ? তুমি আনিয়েছ।

—আর কোন উপায় ছিল কি আমার ? গলোউইজ অস্পষ্ট স্বরে বলল, আতঙ্কে হকচকিয়ে গেল, হয়তো মরার এখুনি তাকে গুলি করবে। ওয়াইনার আর মেয়েটাকে সাবাড় করার জন্য ওকে আনা হয়েছে। একাজে উপযুক্ত লোক একমাত্র ও-ই।

রাগে মরারের সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

—যত্তসব আহাম্মক। সামান্য এই কাজ করবার ক্ষমতা নেই তোমার। বাইরে থেকে লোক আনতে হল ?

—আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

—মিঃ মরার অত উতলা হবার কিছু নেই, ম্যাকক্যান উত্তর দিল। আপনার এখনো আসা ঠিক হয়নি। শহরের প্রত্যেকটি পুলিশ আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আপনার বিরুদ্ধে ফরেস্ট অকাট্য মামলা তৈরী করেছে।

—বুঝলাম, মরার বলল, আপনারা তিনজনে মিলে যে গোলমালটা সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। নিজেই ব্যবস্থা করব বলে এসেছি আমি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা এই কর্ম করতে পেরেছ।

—শক্তিতে যতটুকু কুলিয়েছে, ততটুকুই করেছি। না, আর গুলি করার সম্ভাবনা নেই। গলোউইজ বলতে থাকে, ওয়াইনারকে সাবাড় করা হয়েছে। এবার মেয়েটার পালা, ওটাকে শেষ করতে পারলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে জ্যাক, কিন্তু তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না। তুমি পালিয়ে যাও।

—না, আমি এখানেই থাকব।

মরার টেবিল ঘুরে গলোউইজের চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঐ চেয়ারে বসল মরার, আরেকটা চেয়ার টেনে গলোউইজ বসল। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হঠাৎ সমস্ত

কর্তৃত্ব আর আধিপত্য তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মরার যেন তাকে ধাক্কা মেরে দূরে ফেলে দিল। মনে মনে সে ভাবছিল, বেশ বিনা প্রতিবাদে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করতে পারবে। আর রাজধানী তো আগেই তৈরী। সে দারুণ আঘাত পেল, এমনি।

মরারকে লক্ষ্য করছিল ফেরারি। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হল। সাইগেল বুদ্ধিমান লোক, সে মরারের চোখে ভয়ের আভাস দেখতে পেল। ফেরারি নির্বাক, এই সব সামান্য ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলানোর পক্ষপাতী নয়।

—হ্যালো, মরার! ফেরারি বলল।

—হ্যালো, ফেরারি। উত্তর দিল মরার।

—তোমাকে বিগ জো শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মরার ঘাড় নাড়ল, এটা যেন তার পাওনা। ফেরারির প্রকৃতি যে কি বিভীষিকাময় তা মরারের অজানা নয়। ওকে প্যারাডাইস ক্লাবে দেখে কিছুতেই মরার শান্তি পাচ্ছে না।

— তোমরা তিনজনে কি ছেলেমানুষি খেলা খেলছ? মরার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সাইগেলকে লক্ষ্য করে। মেয়েটার এখনও কিছু করতে পারনি কেন? আমি তিন সপ্তাহ বাইরে ছিলাম। এর মধ্যেই ওকে মারা উচিত ছিল।

—খুবই শক্ত কাজ। সাইগেল বলল, ওকে যে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তাই জানলাম না।

—যখন টের পেলে তখন কি করছিলে?

—প্রথমে ওয়াইনাকে সাবাড় করা হয়েছে, এবার উত্তর দিল গলোউইজ। কারণ ওটা মেয়েটার থেকে সোজা ছিল।

—সোজা! মেয়েটার দিক থেকেই বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী। তোমাদের অজানা ছিল একা ওয়াইনারের সাক্ষীতে ওরা এমন কিছু সুবিধা করতে পারত না।

গলোউইজ তার ভুল ধরতে পেরেছে। সে জানে, আগে ফ্রানসেসকে গুম করা উচিত ছিল। বিরাট ভুল। মরারের মগজে যে এটা চট করে ধরা পড়ে যাবে, সেটা ধারণা করতে পারেনি গলোউইজ।

—ফ্রানসেস সব ফাঁস করে দিয়েছে, মিঃ মরার। এবার মুখ খুলল ম্যাকক্যান। সে নাকি আপনাকে খুন করতে দেখেছে। এজন্যই আপনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা করা হয়েছে।

মুহূর্ত খানেকের জন্য মরারের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। কিন্তু চট করে সামলে নিল নিজেকে।

—ও মিথ্যে বলেছে। আমি জুন আরনটকে স্পর্শ করিনি।

—ওদের কাছে প্রমাণ আছে, ম্যাকক্যান বলল, একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যা চট করে জুরিরা বিশ্বাস করবে।

মরার গলোউইজের দিকে তাকিয়ে বলল—কি সেই প্রমাণ?

ফ্রানসেসের বক্তব্য সব শোনাল গলোউইজ, বলল পেনসিলের কথা।

—পেনসিলটি আমরা আনবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের ওরা হারিয়ে দিল।

—হারিয়ে দিল মানে? মরারের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

—ছ'জনকে সঙ্গে নিয়ে সাইগেল নিজে গিয়েছিল। কনরাড পেনসিল খুঁজতে আরও দুজনকে নিয়ে গিয়েছিল। দুদিক থেকে গুলি চলল। এর মধ্যে এক গাড়ি পুলিশ গিয়ে হাজির হল, পেছন থেকে তারা আক্রমণ করল। পাঁচটি ছেলে মারা গেছে।

মরার তাকাল। সে ভীষণ চটে গেছে, যেন বোমার মত ফেটে পড়বে।

—অনেক প্যাঁচের মধ্যে এটাও একটা প্যাঁচ, তাই না এ্যাবি? মরার কাঁপছে। তোমার মত বুদ্ধিহীন কেউ নাই, একেবারে অপদার্থ। আমি কি ন্যাকা নাকি? পেনসিল ফেলে এসেছি জানি না? এর জন্য গল্পও আমি তৈরি করে রেখেছিলাম। পাঁচটি লোক মারা গেছে। তুমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছ।

গলোউইজ যেন চেয়ারে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। মুখ তার বিবর্ণ। ফেরারি তাকে লক্ষ্য করছে, সেটা সে অনুভব করতে পারল। সে যে অকর্মণ্য, তার এই ব্যর্থতার কাহিনী খুব শীগ্‌গিরই সিনডিকেটের কানে গিয়ে পৌছোবে।

—পাঁচটি লোক মরার কারণ হলে তুমি, মরার বলল এর জন্যে তুমিই দায়ী। পেনসিলের কথা কানে আসতেই তুমি ঘাবড়ে গেলে? উঃ, মাথায় যদি কিছু থাকত জুনের মৃত্যুর দু'দিন আগে আমি ওখানে পেনসিল ফেলে এসেছি। ওটা কোট থেকে পড়ে গিয়েছিল, আর তুলতে পারিনী।

—পেনসিল যে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। ম্যাকক্যান জবাব দিল।

—হ্যাঁ আমারই রক্ত। বোতলের কাঁচে আঙুল কেটে গিয়েছিল। রুমালে আঙুল মুছতে গিয়ে পেনসিল আঙুলে লেগে মাটিতে পড়ে যায়, তারপর ড্রেনে।

—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওসব বানানো গল্পে আর কাজ হবে না।

ম্যাকক্যান বলল। দুঃখিত। পেনসিলের রক্ত আর জুন আয়রনটের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একই গ্রুপের রক্ত। আর এই গ্রুপের রক্ত খুব কম দেখা যায়।

—কোন গ্রুপ শুনি?

—বি গ্রুপ।

—ক্যাপ্টেন যদি শোনেন আমার রক্তও বি গ্রুপের, তাহলে কি অবাক হবেন? কয়েক বছর আগে আমি ওয়াসারম্যান পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেছিল, আমার বি গ্রুপের রক্ত। এবারে কি গল্পটা চলবে মনে হয়? তারপর গলোউইজের দিকে তাকাল মরার, এ্যাবি, তুমি যদি নিজের বুদ্ধিটা এতটা প্রকাশ না করতে চাইতে, তাহলে মামলায় ওদের একটা চমক লাগিয়ে দিতাম।

গলোউইজ পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো। হঠাৎ যেন সে অসুস্থ বোধ করল, মুহূর্তের মধ্যে বার্ধক্য যেন এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

—আমার জানা ছিল না। সে বলল।

মরার একবার তাকে ঘৃণাভরা চোখে দেখল।

—মেয়েটা কোথায়? ম্যাকক্যানের কাছে জানতে চাইল সে।

—জানতে পারলে তো ভালই হত। ফরেস্ট যে ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কেউ জানে না।

—আপনিও জানেন না? মরার ধমকে উঠল। জাহান্নামে গেছে সব। আপনি কি আর পুলিশ ক্যাপ্টেন নন?

—ওসব কথার কোন মানে হয় না। একমাত্র ডি. এ. জানে, মেয়েটা কোথায় আছে। এছাড়া কেউ জানে না। স্বয়ং কনরাড কুড়ি জন লোক নিয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। ওয়াইনার মারা যাবার পরদিনই কনরাড তাকে নিয়ে গেছে। এমন কি ফরেস্ট আমাকেও জানায় নি।

মরার ঘুষি মারল টেবিলে।

—ওকে যেভাবেই হোক বের করে খতম করে ফেলতে হবে। সাইগেলের দিকে তাকাল মরার। তোমার ওপর একাজের ভার দেওয়া হল। কোথায় ওরা ওকে লুকিয়ে রেখেছে, সেটাই তুমি খোঁজ নেবে, বুঝেছ? আমি এটা জানতে চাই। একাজ যদি করতে অক্ষম হও তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। পৃথিবীর আলো দেখাও তোমার এই শেষ মনে করবে।

সাইগেল একটা ক্ষীণ আপত্তি করতে গিয়েও চুপ করে গেল। লক্ষ্য করল

মরারের চোখ দুটি রক্তের মত লাল বর্ণে পরিণত হয়েছে। সাইগেল নিজেকে সামলে নিল। সে যেন ভীষণ বিপদে পড়েছে, রক্তশূন্য সাদা মুখে তাকাল গলোউইজের দিকে একটু সাহায্যের আশায়।

কিন্তু গলোউইজ নিজের জ্বালায় অস্থির পঞ্চম। তাকে কি সাহায্য করবে। সাইগেলকে সে লক্ষ্যই করল না।

—ঠিক আছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মরার। সাইগেলের কাছ থেকে খবরটা শোনার অপেক্ষায় আমরা থাকব। আপাততঃ কিছু করার নেই। আবার আমরা পরশু এগোরোটার সময় আলোচনায় বসব, তখন ভেবে ঠিক করা যাবে; কিভাবে মেয়েটাকে খতম করা যাবে।

—তোমরা ওর হদিস পাবে না। ম্যাকক্যান বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। ওকে লুকিয়ে রাখার গুরুত্ব ওরা জানে। আমি কম খুঁজছি নাকি? যেন মন্ত্রবলে ওকে অদৃশ্য করা হয়েছে। তবে খুব সম্ভব মেয়েটাকে ওরা শহরের বাইরে কোথাও পাচার করে দিয়েছে।

—ওকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব সাইগেলের। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। না হলে—

শেষের কথাটা আর বলল না মরার। কিন্তু এতে সাইগেলের কিছু যায় আসে না। কারণ সে জানে, না হলে কি দুর্দশা হবে।

—কিন্তু, আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি মিঃ মরার, যদি কোন লোকের হাতে আপনি ধরা পড়েন, তখন কিন্তু আমি নিরুপায়; কিছুই করতে পারব না।

—আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেব।

ম্যাকক্যান ঘর থেকে চলে গেল, তার পেছন পেছন সাইগেলও। ভয়ে, আশংকায় তার বুকের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেছে।

ফেরারি নির্বাক, চেয়ারে বসে আছে স্থির হয়ে। উৎসুক দুটি চোখের দৃষ্টি ফেলে মাঝে মাঝে মরারকে লক্ষ্য করছে।

—ফেরারি, নরম শান্ত গলায় বলতে লাগল মরার, ওয়াইনারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। মেয়েটার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না। ওর ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। নিউইয়র্কে তুমি ফিরে যেতে পার। তারপর গলোউইজের দিকে তাকিয়ে বলল—ওর পয়সা-কড়ি শোধ করা হয়েছে?

গলোউইজ ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, শোধ করা হয়েছে।

—ঠিক আছে, ফেরারি, বিগ জো-কে আমার কথা জানিও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফেরারি। মাথার ওপর হাত দুটো টান টান করে হাই তুলল। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একসময়ে সে দাঁড়াল।

—আর দু-একটা দিন কাটিয়ে যাব, ভাবছি। বলা যায় না, আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে।

—না, তোমাকে আর দরকার নেই। মরার বলল।

—বলা যায় না কিন্তু, সে আবার বলল, কাজ শেষ করে এখান থেকে যাওয়া বিগ জো-র হুকুম। তবুও যদি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাও, তাহলে বিগ জো-র সঙ্গে কথা বলে নাও।

এবার মরারের চোখে ফুটে উঠল রাগ!

—বেশ তো। তোমার যদি সময় অপচয় করতে ভাল লাগে তো উত্তম কথা। কিন্তু জেনে রাখো, এ কাজের জন্য তোমার সাহায্য দরকার হবে না।

—হ্যাঁ, দু-একদিন কাটাচ্ছি। তার মুখে দেখা দিল হাসি। ঘর থেকে চুপ করে বেরিয়ে গেল।

—তুমি সন্তুষ্ট এ্যাবি? গলোউইজকে প্রশ্ন করল মরার। ঐ সরীসৃপটাকে এখানে ঢুকতে দিয়ে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছ। হাতে কর্তৃত্ব পেয়ে শেষ পর্যন্ত এই করলে? কাজটা ভাল করেছো বলে মনে হয়?

গলোউইজ নীরব। একভাবে মেঝেতে পাতা গালিচার দিকে তাকিয়ে রইল, কোলের ওপর রাখা হাটু দুটো কচলাতে লাগলো।

—তোমার কি ধারণা, সিনডিকেটের কাছে তোমার যথেষ্ট মূল্য আছে? তোমার ওপর বিশেষ আমল দেয় ওরা? এমন বোকার মত ছেলেমানুষী কাজ আর কেউ করতে পারত? তুমি যে কাজে হাত দিয়েছ, সেটাই মাটি হয়ে গেছে। আমি জানি, তোমার ইচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তা হয়ে বসার। ডলোরাসকে সঙ্গী করার তোমার প্রবল ইচ্ছা। তুমি কি মনে করেছ আমি কানা? দেখতে পাই না?

...সামান্য একটা মাছির সার্কাস চালাবার মত যোগ্যতা পর্যন্ত তোমার নেই। তবে ডলোরাসকে নিতে চাইলে অতি সহজেই পাবে। কোন বাধা বিপত্তি ভোগ করতে হবে না। আমি আর ওকে চাই না, প্রয়োজন নেই আমার।

টেবিলের ওপর হাতের কনুইয়ের ভর দিয়ে সে ঝুঁকল একটু। হঠাৎ গলার

স্বর উঁচু পর্দায় তুলে আবার ময়ার বলতে শুরু করে, তুমি একটি মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, কাপুরুষ। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

গলোউইজ উঠে দাঁড়াল। পা দুটো যেন ভারী বোঝা হয়ে গেছে।

কোনরকমে পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগোল। নিজেকে তার অপরাধী মনে হল। ঘর থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

ময়ার আবার ধুম করে চেয়ারে বসে পড়ল। সে জানে, মাথার ওপর ঝুলছে খাঁড়ার ত্রাণ। এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার ওপর। যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে কোন ভয় নেই। নতুবা, সিনডিকেট তাকে তাড়িয়ে দেবে। না এখনও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়নি সে। ফেরারি কেন যেতে চাইছে না, এটা তার অজানা। সে কি সিনডিকেটের হুকুমের অপেক্ষা করছে!

তার এই দুরন্ত, দয়া মায়াহীন হৃদয়টা কোন দিন কিছু ভয় পায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে সে জীবনে প্রথম ভয় পেল।

সবদিন উন্মাদের মত ভেবেছে সাইগেল, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারেনি। পরদিন বিকেলে ওর মনে পড়ে গেল জেনী কনরাডকে।

ফ্রানসেসকে খুঁজে বের করতে না পারলে তার যে মৃত্যু অবধারিত, সেটা সে ভালমতই জানে। চারদিকে লোক পাঠিয়েছে, আশার ক্ষীণ আলোও লক্ষ্য করা যায় না। ওরা কোন হদিশ পাবে না।

এমনই যখন তার অবস্থা তখন হঠাৎ তার মনে পড়ল জেনীর কথা। হায় ঈশ্বর, এতক্ষণ সে কেবল চিন্তা করেছে, একবারও মনে পড়েনি জেনীকে। নিজেকে সে অভিশাপ দিল।

প্রায় দু হপ্তা হল জেনীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কারণ জেনীকে তার অপছন্দ। জেনী এমন কোন সুন্দরী আকর্ষণীয় নয়, যার জন্য কাজ কর্ম ফেলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য জেনী এইরকমই চায়। জেনীর চেয়েও অনেক সুরৎ আছে, যারা তাকে খুশী করতে একপায়ে খাড়া।

এমনও হতে পারে, ফ্রানসেসের কথা কনরাড তাকে বলতে পারে। কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, একথা জেনী জানতেও পারে। জেনীর সঙ্গে এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ না করার জন্য সাইগেল নিজেই অনুতপ্ত হল।

কিন্তু রাত্রি পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ তার আগে ওর সঙ্গে দেখা করা বিপজ্জনক। অবশ্য সন্ধ্যার পর তাকে যদি বাড়িতে পাওয়া যায়।

টেলিফোন ও করতে চায় না, তাহলে জেনী চটে যাবে। এইসময়ে সে ওর সঙ্গে মন কষাকষি করতে চায় না।

সাইগেল একজন চর পাঠিয়ে দিল কনরাডের বাড়ীর ওপর নজর রাখার জন্য। যদিও বা জেনী বাড়ী থেকে বেরোয়, তাহলে সে ওকে অনুসরণ করবে, লক্ষ্য করবে কোথায় যায় এবং ওকে টেলিফোনে জানাবে।

সন্ধ্যার পর সাইগেল টেলিফোন পেল। জানতে পারল জেনী বাড়ীতেই আছে।

কনরাডের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি দাঁড় করাল সাইগেল। বাকি পথটুকু হেঁটে গেল।

সারা বাড়ি অন্ধকার। কেবল দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

দরজার পাশে বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগল সাইগেল। যদি জেনী একা থাকে ভালই হয়। ঝি চাকর থাকলে অবশ্য একটু অসুবিধা হতে পারে। দেখা যাক।

ভেতরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি দিয়ে কেউ নিচে নামছে।

দরজা খুলে দিল জেনী, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পাতলা হলদে রঙের ড্রেসিং গাউন পরেছে জেনী। আলগা চুলের গোছা নেমেছে ঘাড় পর্যন্ত। ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কিন্তু সাইগেলের মনে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হল না।

—হ্যালো, বেবি। সাইগেল বলল।

জেনীর উত্তরের অপেক্ষা না করে সাইগেল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রাগে জেনীর সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। সে একটুও নড়ল না।

এভাবে তোমার এখানে আসা ঠিক নয়। তুমি কি পাগল হলে?

—কেন আসতে পারি না? তুমি তো একা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি বল। তোমায় একবার না দেখে থাকতে পারলাম না, বেবি।

—না, এখানে থাকতে পারবে না। এখুনি চলে যাও।

—তুমি কি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে? সাইগেল হাসল। সম্ভবমত মিষ্টি মধুর করে তুলল সেই হাসি। এ হাসি আজ পর্যন্ত তার বিফলে যায়নি। অমন করো না, সব ঠিক আছে। আমাকে কেউ ঢুকতে দেখেনি।

—না, সব ঠিক নেই।

সাইগেল তার কথা গ্রাহ্য করল না। তাকে পাশ কাটিয়ে বসবার ঘরে এলো, আলো জ্বালাল।

—বাঃ, দারুণ! এমন পরিবেশে তুমি একা? আমাকে কি তোমার ক্ষনেকের জন্যও মনে পড়েনি?

জেনী বসবার ঘরে এসে ঢুকল। লোকটার বাড়াবাড়ি তার একদম সহ্য হচ্ছে না।

যদি পল এসে পড়ে···

—কেন এসে পড়বে? সাইগেল নিশ্চিন্তে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, চিন্তা কি। মিঃ কনরাড তো এখানে নেই তাই না?

—নেই ঠিকই। কিন্তু এসে পড়তে কতক্ষণ? তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না, লুই।

জেনীর একটা হাত খপ করে ধরে ফেলল সাইগেল।

—তোমার স্বামী কোথায় গেছে। সাইগেল ওকে নিজের গায়ের কাছে টেনে আনল। জেনী আপত্তি করল। কিন্তু ওর বাধা অগ্রাহ্য করে আরও নিবিড় করে তাকে কাছে টেনে নিল। জোর করে তার হাঁটুর উপর বসলে।

—এই তো বেশ। সত্যি, কি আমার লাগছে, তোমাকে কতদিন কাছে পাইনি, বলতো। আমাকে কি তোমার একবারও মনে পড়েনি ডারলিং?

—এসব মনে পড়া, আর না পড়া কথা বলে কি লাভ?

সাইগেল ঠোঁটে সেই অব্যর্থ হাসি ফুটিয়ে তুলল।

—তুমি মনে করছ, আমি তোমায় ছেড়ে দিয়েছি, তাই না? বল, সত্যি বলেছি না?

—ভাবলেও আমার কিছু যায় আসে না। সমুদ্রে সর্বদা মাছ পাওয়া যায়।

—তা অবশ্য ঠিক। সর্বদা পাওয়া যায়।

জেনীর মেরুদণ্ডে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল সাইগেল।

উত্তেজনায় জেনীর সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠল।

—কি হচ্ছে? জেনী বলল।

—কিছুই হচ্ছে না। তবে হবে পরে, অনেক কিছুই হবে।

—না, কিচ্ছু হবে না। তুমি চলে যাও।

জেনী ওর কোল থেকে এক লাফে উঠে পড়ল।

—বেশ, তোমার কথা রইল। তবে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

রাস্তায় আমার গাড়ি দাঁড় করানো আছে। চল দুজনে হ্যাকস বার-এ যাই। খুব মজা করে ভাল খাবার আর শ্যাম্পেন খাওয়া যাবে।

—না।

—যাও, সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরে এসো। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

—না।

সাইগেল উঠে দাঁড়াল।

—তুমি কি চাও তোমায় আমি জোর করে দোতলায় নিয়ে যাই?

—না। তুমি সেসব কিছুই করবে না।

—তুমি এটা রাগের কথা বলছ।

আচমকা সাইগেল তাকে কোলে তুলে নিল।

জেনী নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

—নামিয়ে দাও, এখুনি আমায় নামিয়ে দাও।

সাইগেল তার কথা কানেও নিল না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

—এক্ষুণি নামিয়ে দাও।

—ওপরে যাচ্ছি আমরা।

—লুই, আমি ভীষণ রেগে যাচ্ছি। নামাও বলছি।

—ঘাবড়াচ্ছো কেন। ঠিক সময়ে নামিয়ে দেব।

ওপরের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সাইগেল পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকল। জেনীকে নামিয়ে দিল।

শোবার ঘর।

পাশাপাশি দুটো, পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটা বিছানায় কিছু পোশাক জড়ো করা রয়েছে।

জেনিকে নামিয়ে দিলে কি হবে, তখনও সাইগেলের বাহুডোরে জেনী আবদ্ধ, জেনীর নিঃশ্বাস এসে পড়েছে সাইগেলের বুকে।

—যাও, চলে যাও। আমি আর তোমার এসব পাগলামী কিছুতেই সহ্য করব না।

সাইগেল চটে গেল। কিন্তু ভেবে-চিন্তে নিজেকে খুব জোর সংযত করল। কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত এরকম ব্যবহার সে পায়নি। এভাবে কথা

বলতে তারা সাহস পায়নি। কিন্তু এখনও কয়েক মিনিট তাকে রাগ সংবরণ করে থাকতে হবে।

—তোমাকে রাগলে ভারি সুন্দর দেখায়। সখি। আরও রাগিয়ে দেব তোমায়।

জেনী চিরকালেই প্রশংসা পেলে আর কিছু চায় না। ও একটু শান্ত হল।

—প্লীজ, লুই, নীচে যাও। যদি এখন পল এসে পড়ে……

সাইগেল বিছানায় চুপ করে বসে পড়ল।

—তোমার স্বামী কোথায় গেছে?

—অত জেনে তোমার দরকার কি? নিচে গিয়ে অপেক্ষা করো আমি এক্ষুণি পোশাক পাল্টে আসছি।

—তুমি তাহলে জান না, সে কোথায় গেছে?

—জানব না কেন। জানি—কিন্তু তোমার জেনে কাজ কি?

সাইগেলের ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিল।

—না, জানতে চাইছিলাম, আজ রাত্রে কি ও আসবে?

—সম্ভব না। তবে নির্দিষ্ট করে কি বলা যায়? তুমি এখন যাও।

সাইগেল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জেনীর কাছে গিয়ে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল।

—প্লীজ জেনী, একটা চুমো দাও।

জেনী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর সাইগেলের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট স্থাপন করল। সাইগেল তাকে নিবিড় ভাবে অনেকক্ষণ বুকের ওপর চেপে ধরল। কঠিন আলিঙ্গনে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

জেনী নিজেকে ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করল। অবশ্য তাকে ধরে রাখতে সাইগেলকে বেগ পেতে হলো না। সে জানে, জেনী ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে।

—ওহ, লুই···। জেনী নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর গায়ের ওপর মুখ ঠেকিয়ে ঝুঁকে রইল।

বিছানার কাছে তাকে নিয়ে গেল সাইগেল। জেনী মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল ঠিকই, কিন্তু সেই বাধার মধ্যে এতটুকু আগ্রহ নেই।

বিছানায় গা এলিয়ে দিল জেনী।

—না না, লুই, এটা উচিত হবে না

তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল লুই। প্রশ্ন করল—সে কোথায়?

—কে? কে কোথায়?

মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনার আচ্ছন্নতা গেল কেটে। জেনীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হল, মাথা থেকে দূর হল অস্পষ্টতা।

—তোমার স্বামী। কোথায়?

—হঠাৎ এ খবর জানতে চাইছ কেন? এ বিষয়ে এত উৎসাহ-ই বা কেন? জেনী চট করে উঠে বসল। সাইগেলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল—ইস, আমি কি বোকা! এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারিনি।

—কি বুঝেছ?

—আমাকে হঠাৎ এত ভাল লেগে যাওয়ার কারণ। জেনীর চোখের তারা দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। তুমি বুঝি সেই কোলম্যান মেয়েটার খোঁজে এসেছ। নিশ্চয়ই তাই। তোমার কীর্তির কথা পলের কাছ থেকে শুনেছি। তুমিও মরারের একজন পেশাদার গুণ্ডা। সত্যি, কি নির্বোধ আমি।

এক লাফে বিছানা থেকে মাটিতে এসে দাঁড়াল জেনী—যাও, শীগগির বেরিয়ে যাও! নয়তো পুলিশ ডাকব।

সাইগেলের ঠোঁটে নেই সেই মধু মাখা হাসি। এক ফুৎকারে উড়ে গেল সেই পালিশ করা লালিত্য। পরিবর্তে ফুটে উঠল নির্মম, হিংস্র চোখের দৃষ্টি। তার এই মুখের অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে জেনী ভয় পেল। দাসীটাও আজ ছুটি নিয়েছে। বাড়ীতে সে একা।

—এত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে কোন লাভ নেই। শান্ত ধীর গলায় বলল সাইগেল। এমন কিছু করে বোসো না, যা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে না। কনরাড কোথায় আছে তুমি জান। তোমাকে বলতেই হবে। নয়তো মার লাগাবো। বল, কোথায় সে?

জেনী ভয়ে পেছনে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। দিশেহারা হয়ে গেল, এই মুহূর্তে কি যে করবে বুঝতে পারল না।

—আমি জানি না। তুমি যাও, না হলে—

সাইগেল দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। জেনী চিৎকার করার জন্য যেই মুখ খুলতে যাবে অমনি সাইগেলের একটা চড় তাকে আক্রমণ করলো। জেনীর মাথা ঘুরে গেল। হাঁটুতে আর হাতে ভর দিয়ে সে বসে পড়ল।

সাইগেল নীচু হয়ে ওকে টেনে তুলল। কয়েকবার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

পেনডুলানের মত ঘুরতে লাগল জেনীর মাথা।

—কোথায়? জেনীকে সে সজোরে ধাক্কা দিল।

চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল জেনী। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। মুখ দিয়ে একটা কথা বলার ক্ষমতা তার নেই।

সাইগেল তার দিকে দ্রুত কয়েক পা এল, শক্ত করে তার কব্জি চেপে ধরল, বলল, বল কোথায় কনরাড? হাতে ধীরে ধীরে মোচড় দিতে লাগল, জেনী উপুড় হয়ে গেল। সাইগেল তার পিঠের ওপর হাত ঘোরাতে লাগল।

জেনীর হাত লোকটা ভেঙে ফেলেছে। সে প্রাণপণ জোরে চ্যাঁচাতে লাগল।

অন্য হাতে গুণ্ডাটা জেনীর মাথা বিছানার ওপর চেপে ধরল যাতে ওর মুখ দিয়ে একদম আওয়াজ না বেরোয়।

—কোথায় সে?

জেনী আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না, বোধ হয় এক্ষুনি জ্ঞান হারাবে। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

—মা, আর না। আঃ, ভীষণ লাগছে। ছেড়ে দাও, বলছি ছেড়ে দাও।

—আগে বলতে হবে ও কোথায় আছে?

—জায়গাটা আমায় বলেনি। তবে টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে। জেনী কেঁদে বলল।

সাইগেল হাত ছেড়ে দিল, ওকে সোজা হতে সাহায্য করল। তার মুখের চেহারা পাল্টে একটা ফ্যাকাসে বীভৎস মুখে পরিণত হয়েছে।

—নম্বরটা শুনি।

—বার উড ৯৯৭৮০।

—যদি মিথ্যে হয় তাহলে জীবনে আর বাঁচতে হবে না জেনো।

—উঃ। জেনী কাঁপছে। তুমি আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছো জন্তু কোথাকার।

—চল নীচে। টেলিফোনে তুমি ওকে ডাকবে, বলবে, তুমি একা বোধ করছ বা কিছু খবর নিচ্ছ। তোমার যা ইচ্ছে বলতে পার। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি সত্যি কথা বলছ না মিথ্যা কথা বলছ।

—চল, যাচ্ছি।

তখুনি সাইগেল বুঝতে পারল, জেনী সত্যি কথা বলছে।

—চটপট এস।

জেনী বিছানা থেকে উঠল, পা তার টলমল করছে, কোনরকমে দরজার কাছে গেল। নিজের দেহের ভার সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, সাইগেল তাকে ধরে ফেলল।

সিঁড়ির কাছে গেল জেনী, সাইগেল তার পেছনে।

প্রথম ধাপে পা দেবার জন্য যেই না এগিয়েছে জেনী, অমনি সাইগেল পা তুলে তার পিঠে এক লাথি মারল যত সম্ভব জোর দিয়ে।

জেনী যেন শূন্যে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত উঁচুতে তুলে চীৎকার করে উঠল। তার কান ফাটানো চীৎকারে গোটা বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। সাইগেল সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে গেল।

প্রথমে উপুড় হয়ে পড়ল জেনী, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ল একেবারে নীচে। তালগোল পাকানো একটা মাংসপিণ্ড, সারা শরীরে রক্তের ছাপ।

মুহূর্তের মধ্যে সব চুপচাপ হয়ে গেল। স্পন্দনহীন, অনড়।

॥ দশ ॥

জেনী মারা গেছে, দশদিন কেটে গেছে। কনরাড প্রথমে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তারপর সামলে নিয়েছিল নিজেকে। প্রথম প্রথম কনরাডের বিশ্বাসই হত না, জেনী মারা গেছে, সে নেই। তারপর তার অনুপস্থিতি তাও ধীরে ধীরে সইয়ে নিচ্ছে।

দুর্ঘটনায় জেনীর মৃত্যু ঘটেছে, এটা কনরাডের বিশ্বাস। ড্রেসিং গাউনের সঙ্গে জুতোর উঁচু হীল আটকে গিয়েই সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে সে।

কনরাড জেনীর শেষ কাজটা করে নি। জেনীর বাবার ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে কনরাড চলে আসে। ফ্রানসেসের কাছে কাটালো ফ্রানসেসের নতুন লুকানো জায়গায়। তার জন্য কিছু করার নেই।

ও'ব্রায়াম মৃত্যুর আগে মুহূর্তে যে কথাগুলি বলে গিয়েছিল, সেগুলো এখনও কনরাডের মাথা থেকে সরে যায় নি। ওটা দুর্ঘটনা নয়। "ফেরারি···আমার ছেলে···"

ভিটো ফেরারির কথা জানে না, এমন কোন পুলিশ নেই। তবে কি ওয়াইনারের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নি? ভিটো ফেরারি কি তাকে খুন করেছে?

এ বিষয়ে কনরাড সাবধান করে দিয়েছিল ম্যাকক্যানকে। হয়তো এ কাজের জন্য ফেরারি এ শহরে হাজির থাকতে পারে, পুলিশ যেন তাকে খোঁজ করে। ম্যাকক্যানের কাছ থেকে জানা গেছে, এ তল্লাটে সিনডিকেটের খুনীর কোন চিহ্ন নেই।

চিন্তার কথা। যদি ওয়াইনারের মৃত্যুর জন্য ফেরারি দায়ী হয়, তাহলে ফ্রানসেসের সাংঘাতিক বিপদ। অবশ্য, কনরাড সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্যাসিফিক সিটি থেকে পনেরো মাইল দূরে ছোট শহর বারউড। বারউড ওশান হোটেলে রয়েছে ফ্রানসেস। দশতলা এই বাড়ি পাহাড়ের ওপর তৈরী। সামনেই সমুদ্র।

হোটেলের সম্পূর্ণ ওপরটায় ব্যবস্থা করেছেন ফরেস্ট। এখানে ঢুকতে হলে বিশেষ একটা ইস্পাতের দরজা পার হয়ে যেতে হবে। কুড়িজন অতি বুদ্ধিমান লোক রাতদিন উপরে-নীচে পাহারা দিচ্ছে।

যতরকম সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, ধীরে ধীরে সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। আপাতত কনরাড নিশ্চিন্ত, ফ্রানসেস এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে! তার বিপদ ঘটানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ফ্রানসেসকে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে ম্যাজ ফিলডিং আর দুজন স্ত্রী পুলিশ। মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কারণেই ঘরের বাইরে আসা তার নিষেধ।

কনরাড প্রায় দিনই ফ্রানসেসের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটায়। নানারকম গল্প করে, তাকে সাহস যোগায়, উৎসাহ দেয়। কনরাড যত ওর সংস্পর্শে আসে ততই বেশী ভাল লাগছে তাকে। ক্রমে ক্রমে ফ্রানসেসেরও মনে জেগেছে আশা। যতক্ষণ কনরাড না আসে ততক্ষণ সে তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। বিশেষ কোন কারণে কনরাডের অনুপস্থিতি তার মনে এনে দেয় চাঞ্চল্য, বিপন্ন হয় সে।

তবু ওরা পরস্পর অনুভব করে একটা সূক্ষ্ম অন্তরায়, একান্ত কাছের মানুষ হবার। কিন্তু ফ্রানসেসের বাবার ভয়াবহ অতীত হল বাধা। কনরাড এই বাধা অতিক্রম করে আরও অন্তরঙ্গ হতে চায়।

ফ্রানসেস জেনীর মৃত্যুর কথা ম্যাজের কাছ থেকে শুনেছে। সে ভীষণ দুঃখিত হয়েছে। কনরাডকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা সে করেছে।

—হ্যাঁ, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত, কনরাড তাকে বলেছিল, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ জেনী আর আমার মধ্যে বনিবনা ছিল না। একদিন না একদিন দুজনেই পরস্পরকে ছাড়তে বাধ্য হতাম। কিন্তু তবু আমি ওর জন্য দুঃখ বোধ করি, ভীষণভাবে দুঃখিত। জীবনকে সে ভালোবেসেছিল।

প্যাসিফিক সিটিতে একটা মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়েছিল কনরাড। সেখানে দুদিন তাকে থাকতে হয়েছে। ঐ দুদিন তার হয়ে অফিস চালাচ্ছে ভ্যান রোশ।

হোটেলে পৌঁছেই ফ্রানসেসের সঙ্গে দেখা করার জন্য কনরাড গেল তার ঘরে।

দরজার কাছে ম্যাজকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল—সব ঠিক তো?

—হ্যাঁ, সব ঠিক। কিন্তু মনে হয় মন খারাপ। যত দিন যাচ্ছে তত যেন ভেঙে পড়ছে। ভয় পাচ্ছে!

—ভয় পাচ্ছে ?

—সেরকমই তো দেখছি। অবশ্য চুপচাপ আছে। তোমাকে না দেখতে পেয়ে আরও যেন মনমরা হয়ে আছে। দরজায় একটু আওয়াজ পেলেই লাফিয়ে ওঠে। সর্বদাই কি যেন ভাবছে। যেন দিন দিন নিরাশ হয়ে পড়ছে।

একটা সিগারেট ধরাল কনরাড।

—বিচলিত হবার কারণ, সে বলল, বিশেষ করে ওয়াইনারের মৃত্যু। যে ঝড় তাকে রুখতে হয়েছে, তার ওপর এখনও সে মাথা ঠিক রাখতে পেরেছে এই অনেক।

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখন এত চঞ্চল হবার কি কারণ বুঝতে পারছি না। তবে ওয়াইনারের মৃত্যুর জন্যও কিছুটা হতে পারে। এখনও সে মনে ঠাঁই দিতে পারছে না, দুর্ঘটনায় ওয়াইনারের মৃত্যু হয়েছে।

—আমি তো মনে করেছিলাম, এ ধারণা তার মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

—না যায়নি।

—দেখি কথা বলে।

আজ ওর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলবে। কনরাড স্থির করল, মনে আজ কোন সংশয় রাখবে না। তাহলে হয়তো ওর মন সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, মন থেকে দূর হবে আশংকা।

করিডোরে চারজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। কনরাড তাদেরকে একবার লক্ষ্য করে ভেতরে ঢুকল।

সামনের ঘর পেরিয়ে একটি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টোকা মারল বন্ধ দরজায়।

একজন স্ত্রী-পুলিশ এসে দরজা খুলে দিল। অন্যজন ফ্রানসেসকে উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছিল।

কনরাড ঘরে ঢুকল, ফ্রানসেস মুখ তুলে তাকে দেখল। বই বন্ধ করে মেয়েটি ঘরের বাইরে এল।

—এস, জানালায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখি। কনরাড বলল।

ফ্রানসেস রাজী।

দুজনে জানালার কাছে পাশাপাশি দাঁলাল। অনেক নিচে সমুদ্রের কিনারা। বালির ওপর হোটেলের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

—সাঁতার কাটতে নিশ্চয়ই সখ হচ্ছে, তাই না? কনরাড প্রশ্ন করল,

এমনভাবে ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছ, আমার নিজেরই বিশ্রী লাগছে। নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছ ?

ফ্রানসেস মাথা নেড়ে বলল—না, বিশেষ খারাপ লাগছে না।

কনরাড লক্ষ্য করল, তার কণ্ঠস্বর নীরস, সেখানে উৎসাহের অভাব।

—ফ্রানসেস, তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। মামলা চুকে গেলে কি করবে ? কিছু স্থির করেছ ?

—এখন ওসব চিন্তা করার কোন মানে হয় কি ? শান্ত কণ্ঠস্বর ফ্রানসেসের।

—এ কথা বলার কারণ ?

—ভাবব কেন বলুন ? পিট বলেছিল, ওরা আমাকে কিছুতেই সাক্ষী দিতে দেবে না। সুতরাং কি করতে এখন থেকে ভবিষ্যতের কথা ভাবব ?

কনরাড তাকে কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করল।

—ফ্রানসেস। তোমার এত নিরাশ হওয়ার কোন মানে হয় না। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ! তোমার কাছে আসার ক্ষমতা কারো হবে না। মামলার সময়েও তাই। কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

—স্পর্শ করতে পারবে না ? নিরাপদ, তাই না ? আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, পিটও নিরাপদ। দেখলেন তো পিট মারা গেল।

—যদি কিছু মাত্র সন্দেহ থাকত, তাহলে তোমায় আমি এমন করে আশ্বাস দিতাম না।

চারপাশ লক্ষ্য করে ফ্রানসেস তাকাল কনরাডের দিকে।

—বুঝতে পারছি না ……

—বুঝতে পারার কথাও নয়। তবে এটুকু আস্থা রাখতে পার, তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি কথা দিচ্ছি, কেউ তোমায় এখানে ছুঁতে পারবে না। কোন পথ নেই।

কনরাড পায়চারী করতে শুরু করেছে। জানালার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল ফ্রানসেস। কনরাডের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

—তোমার বিশ্বাস, মরার একটা কি না কি অতিকায় মানব। এই ধারণাটা তোমার মন থেকে দূর করতে হবে ফ্রানসেস। তবে এটাও আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না, সে চেষ্টা করবে না। কিন্তু এটুকুও বলতে পারি, এখানে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। এখানে দিন-রাত্রি পাহারা দিচ্ছে। সবরকম ব্যবস্থাই

নেওয়া হয়েছে। তুমি কল্পনা করতে পারবেনা, এরজন্য আমাদের কত চিন্তা করতে হয়েছে। এত কিছু করার পরও তুমি নিরাপদ মনে করো না?

—না।

—কেন?

—আমার সর্বদা মনে পড়ছে পিটের কথা।

সে ধুম করে চেয়ারে বসে পড়ল। পিট বলেছিল মরারের কথা, আমি যদি বলি, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে। আর বলেছিল, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। দেখলাম তো। ফ্রানসেসের কণ্ঠস্বর কাঁপছে। 'ও বলেছিল, ও আর বাঁচবে না।' আমারও ঠিক তাই, বাঁচবো না। পিট বলেছিল, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অতি সহজে কাজ হাসিল করা যায়। আমার যে দু'জন মেয়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, তারা যে মরারের কাছ থেকে টাকা খায়নি, এটা আপনি হলফ করে বলতে পারেন?

ফ্রানসেসের মন কিভাবে কাজ করছে তার ইঙ্গিত পেয়ে কনরাড সত্যি চমকে উঠল।

—না না, ফ্রানসেস এ ধরণের কথাবার্তা তোমার বলা উচিত না, বন্ধ করতে হবে। কনরাড তার কাছে এগিয়ে গেল। অতি অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিল।

·শোন, লক্ষ্মী ফ্র্যাঙ্কী। আমার দিকে তাকাও। তোমায় আমি ভালবাসি? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি তোমায় ভালবাসি? বুঝতে পার না? আমি তোমায় বলছি, নিশ্চিন্তে থাকো। কোন ভয় নেই এখানে।

ফ্রানসেস তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় মুখ খুলল।

—আমায় আপনি ভালবাসেন? · আমি কোনদিন ভাবিনি · আমি জানতাম না।

—তোমার তো জানবার কথা নয়। তোমাকে আমি বলতে চাইনি। তোমাকে বিরাপদে না রেখে আমি তো স্থির থাকতে পারি না। আমার কাছে তোমার দাম অনেক, মূল্যবান। ম্যাজ বা অন্য দু'জন নারী পুলিশকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, ভয় পাবার কিছু নেই।

—আপনি তো আমার ব্যাপারে সবই জানেন। কি করে আপনি আমাকে ভালবাসতে পারেন?

—দেখ ফ্র্যাঙ্কী, ওসব আজে-বাজে কথা তোমার বলা চলবে না। তোমার বাবা যে কাজই করে থাকুন, তার জন্য তুমি তো দোষী নও।

ফ্রানসেস বিমর্ষ চোখে আবার দেখল কনরাডকে।

—বলা যায় অনেক কিছু। কোন তো অসুবিধা হয় না, তাই না? আপনি তো জানেন না, লোক যখন ঘৃণার চোখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তখন আপনার মনের অবস্থা কি হবে। ওরা কানাকানি করবে, বাচ্চাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেবে। যেদিন আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলল, সে রাত আজও আমার মনে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে আছে।

.. আমাকে মারবার জন্য পিছু নিল। এখন এতদিন পরে এইসব কথা জানাবার পর শুরু হবে নতুন করে অত্যাচার। আপনারা তো আমার সব কথাই জানেন, বলেছি সব।

ওর হাত তুটো নিজের হাতে তুলে নিল কনরাড।

—শোনো ফ্র্যাঙ্কী, তোমার সম্বন্ধে আমি সব কিছু ভেবে রেখেছি। অবশ্য তুমি যদি রাজী থাক, আমি তোমার ভার নিতে পারি। আমরা তু'জন নতুন করে জীবন শুরু করব। তোমাকে আমি বিয়ে করবো। তোমার আগের পরিচয় কেউ জানতে পারবে না। কোথায় আমরা যাব, সেটাও সবার কাছে থাকবে অজানা। আমরা ইংলণ্ডে যেতে পারি। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, সে আমাকে এসব ব্যাপারে সাহায্য করবে। একটা ছোট্ট বাড়ি নেব ঐ গ্রামের দিকে। আমার ওপরে তোমার সব ভার দিয়ে দাও। তোমার জন্য তৈরী করব নতুন ভবিষ্যৎ।

—ভবিষ্যৎ? আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমি আর বাঁচবো না পল। আমি জানি আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই!

* * *

এমনভাবে কাজ শেষ করতে হবে, যাতে মনে হয় তুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, বুঝেছ জ্যাক। গলোউইজ বলছে, যদি কোনরকমে সন্দেহ জাগে, তাহলে আমাদের অবস্থা শোচনীয়।

ওরা তখন চারিদিকে এমন হৈ-চৈ শুরু করে দেবে, তখন আমাদের ব্যবসা গুটানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। চাপ পড়লেই কেউ না কেউ মুখ খুলবে। তুমি জোর দিয়ে বলতে পার না। তাই তুর্ঘটনায় মৃত্যু—এটাই মনে হওয়া দরকার।

টেবিলের ওপর মরারের হাত দুটো প্রসারিত, ঝুঁকে বসেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে হাতীর মত চোখ দুটো তার রাগে জ্বলছে। কিভাবে ফ্রানসেস কোলম্যানকে হত্যা করা হায়, কিছুতেই মাথায় বুদ্ধি আসছে না। একটানা দশদিন ভেবে ভেবেও কোন মতলব বের করতে পারেনি। তার অনুচরই নয়, স্বয়ং মরারও সেই জায়গায় গিয়ে দেখে এসেছে, ওখানো ঢোকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

—কিন্তু ওকে মারতেই হবে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল মরার, একটা মাত্র পথ আছে সারা হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। তখন ওরা প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমরা ঐ সময় আক্রমণ করব। ফ্রানসেসের সঙ্গে যদি দু' একটা প্রাণ যায় তাতে কিছু যায় আসে কি ?

গলোউইজ তার মোটা হাত দুটি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল।

—ওতে কাজ হবে না। আমাদের অন্য মতলব আঁটতে হবে। ওখানে কুড়ি পঁচিশ জন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। যদি তেমন দরকার হয়, যে কোন মুহূর্তেই আরও শ'খানেক পুলিশ ওরা নিয়ে আসতে পারে।

মরার উতলা হয়ে উঠছে, সে আর বসে থাকতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে পায়চারী করতে লাগল।

—আর কি মতলব তুমি বার করবে ? আর কি উপায় আছে ? আগুন লাগাতে পারলে ও ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা হবে, তাই না ? কি করে তুমি ওখানে দুর্ঘটনা ঘটাবে ? আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছল গলোউইজ। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় গত দশটা দিন কেটেছে। নিজের বাড়িতেই সে বসেছিল। মরার তাকে একরকম বিদেয় করে দিয়েছিল। আবার তাকে ডেকে এনেছে। বলেছে, তার মাথার ঠিক ছিল না বলে কড়া কথা বলে ফেলেছে। এখন মতলব বের করা যাক, ফ্রানসেস মেয়েটাকে কিভাবে খুন করা যায়। গলোউইজ অবশ্য জানত, এ কাজ করা মরারের প্ল্যানে সম্ভব নয়, তার ক্ষমতায় কুলোবে না।

—একাজ হাসিল করতে একমাত্র ফেরারিই পারবে। গলোউইজ তার মত প্রকাশ করল। ওকে ডাকা হোক।

মরার তার পায়চারী করা বন্ধ করল, গলোউইজের দিকে তাকাল।

—ও চলে যায় নি ?

গলোউইজ ভেবেছিল, এখুনি মরার চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না বলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—এই কিছুক্ষণ আগে ওকে বার এ আমি দেখেছি। গলোউইজ বলল।

—কিন্তু এটা বুঝতে পারছ তো, আমরা ওর কাছে হেরে যাচ্ছি?

—কি আর করা যাবে? আমাদের যদি বুদ্ধিতে কুলোতো তাহলে ওকে ডেকে আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এর জন্য তুমি আমাকে দোষী করেছ বটে, কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। এখনও কি আমরা কিছু উপায় বের করতে পারলাম? আমার বিশ্বাস, যদি কেউ কিছু করতে পারে, সেটা ফেরারিই পারবে।

মরার আবার চেয়ারে এসে বসল। কপালে তার কুঞ্চন রেখা, ছোট চোখ। কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর রিসিভার তুলে নিল, সাইগেলকে ডাকল।

—লুই, ফেরারিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও। সম্ভবত এখন ও বার-এ আছে।

অনেকক্ষণ পর গলোউইজ শান্তি অনুভব করল, একটু আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এটা যেন তার ব্যক্তিগত জয়। বেশ মজা লাগছে তার। অবশেষে মরারকে তার কাছে হার স্বীকার করতে হল।

—তুমি ঠিকই করেছ, জ্যাক। গলোউইজ যেন তার পিঠে চাপড় মেরে দিল। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

মরার তাকাল। পিঠ চাপড়ানিটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারল না।

—তুমি মনে করেছো, তোমার প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছি? ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই না? তোমার কথায় নয়, আমার নিজের বুদ্ধি বুঝেই। ফেরারি মেয়েটাকে খুন করবে আর আমার হাতে মারা পড়বে ফেরারি। আর একটা দুর্ঘটনা। এবার লক্ষ্য করতে পারছ, তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্যটা কোথায়? হো! হো! ঘর ভাঙ্গা হাসিতে ফেটে পড়ল মরার।

মুহূর্তের মধ্যে দূর হল গলোউইজের মনে জয়ের আনন্দ, কঠিন হয়ে গেল তার মুখ। সোজা হয়ে বসল সে।

—কি বলছ তুমি? ফেরারিকে খুন করবে।

মরার দাঁত বের করে আবার হেসে উঠল। যেন নেকড়ের হিংস্র হাসি।

—ব্যস্ত হয়ো না এ্যাবি, উপযুক্ত সময়ে দেখতে পাবে।

সম্মোহনের ভঙ্গিতে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

কেটে গেল দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত।

দরজা খুলে গেল, প্রবেশ করল ফেব্রারি। চুপচাপ হেঁটে এসে একটা চেয়ারে উঠে বসল সে।

—কি ব্যাপার! ফেব্রারির কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা।

—মেয়েটার কথা বলছি। মরার বলল, কি করব কিছুই স্থির করতে পারলাম না। এ্যাবির ধারণা তুমি নিকাশ করতে পারবে। পারবে কি?

ফেব্রারি ভুরু কুঁচকে চোখ বাঁকিয়ে বলল, নিশ্চয়। পারাই তো আমার কাজ।

মরার কাঁধ ঝাঁকাল।

—বেশ, একাজের জন্য দশ হাজার টাকা পাবে।

ফেব্রারি আপত্তি করল।

—অত যদি সোজা হত তাহলে যে কেউ করত, তোমরাও পারতে।

—তোমার দাম শুনি।

—বিশ হাজার।

—আচ্ছা, তাই পাবে। কিন্তু তোমার বিশ্বাস এত দৃঢ় হল কি করে যে একাজ তুমি পারবেই?

—আমি সবসময় সব কাজে কৃতকার্য হই এক্ষেত্রেই সফল হবো না কেন? তোমরা আগে থেকেই অসুবিধাগুলো ভাবো। তাই অসুবিধাগুলোই চোখে পড়ে চট করে আর আমি ভাবি কি জান—সাফল্য।

—তবে দুর্ঘটনা হওয়া চাই!

ফেব্রারি মাথা নাড়ল।

—নিশ্চয় দুর্ঘটনা। তবে বারবার আমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোন দরকার নেই। ওর কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার ব্যঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে।

মরারের মুখ রক্তের মত লাল হয়ে উঠল।

—তুমি জান না মেয়েটা কোথায় আছে। এমনভাবে তুমি কি করে কথা বলছ আমি ভেবে পাচ্ছি না।

বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ফেব্রারির মুখে। হাসির দমকে তার ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল।

—আমি জানি, ও কোথায় আছে। বারউড ওশান হোটেলের একেবারে ওপরতলায় ফ্রানসেস আছে। পাঁচজন লোক নীচে পাহারা দেয়, পাঁচজন উপর তলায়, আর পাঁচজন মেয়েটার ঘরের আশেপাশে। এছাড়া আরও পাঁচজন

প্রহরী রয়েছে অফ ডিউটির জন্য। মোট কুড়িজন গার্ড ওকে দিনরাত্রি পাহারা দিচ্ছে।

····হোটেলে ঢুকতে হলে নীচে সিকিউরিটি অফিসে নিজের নাম ধাম এবং কাজ উল্লেখ করতে হবে। নচেৎ কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। কড়া হুকুম। লিফটে করে ন'তলা পর্যন্ত যাওয়া যায় তারপর বন্ধ। দিনরাত তিনজন মেয়ে পুলিশ ওকে চোখে চোখে রেখেছে। স্নানের ঘরে ঢুকলে দরজা খোলা থাকে, একজন মেয়ে পুলিশ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নজর রাখে। কোন কারণেই ওকে ঘরের বাইরে আসতে দেওয়া হয় না।

····ওর ঘরের জানালার নিচেও পাহারা দিচ্ছে গার্ড। অতএব জানলায় ওঠা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর ছাদ বেয়ে ওঠাও দুষ্কর। পাহাড়ের চূড়ার মত সোজা উঠে গেছে। একটি মাত্র স্কাইলাইট চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। এখন বল আমি কিছু জানি না বলে মনে হচ্ছে ?

মরারের বুকের রক্ত শীতল হয়ে গেল। ফেরারির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ মানুষটা যেন একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপে পরিণত হয়েছে।

—ফেরারি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না, মিথ্যে বলছ তুমি। তুমি এত খবর জানতে পার না। বাড়িটার আশেপাশে দূরে দশদিন ঘুরেছে আমার লোকেরা। ঐ বাড়ির কোন ঘরে মেয়েটা রয়েছে, তা-ই জানতে পারল না।

ফেরারি হাসল।

—তোমার অভিজ্ঞতা এখন নতুন আর আমি একজন পেশাদার লোক।

মরার ভীষণ অপমানিত বোধ করল, কিন্তু সেটা সহ্য করে নিল।

—কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

—আমি দশতলায় উঠেছি। দেখেছি, শুনেছি ফ্রানসেসকেও আমি দেখেছি।

মরারের বিস্ময় ক্রমশ বাড়তে থাকে।

—দশতলায় উঠেছিলে ? কিভাবে ?

—ওটা বলা যাবে না, গোপনীয়।

দুজনেই নীরব, কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কেবল শুধু চোখাচোখি।

তারপর একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে মরার বলল—এবার বল, কি করে তুমি দুর্ঘটনা ঘটাবে।

ফেরারি একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা তুলে হাত দুটো কোলের ওপর রেখে আরাম করে বসল।

—এ একটা সমস্যা, মজার সমস্যা। কিন্তু সম্ভব। খুবই শক্ত। আমি মনে করি, পৃথিবীতে আমিই একমাত্র লোক যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

...সত্যি ? পারবে তুমি ?

—দেখতেই পাবে। আমি কিভাবে কাজ করব, এসব নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করি না। তবে প্রথমেই বলি, একাজ সফল করতে হলে দুটো জিনিস প্রয়োজন। অত ঝামেলা করার ধৈর্য আমার নেই। তবে জেনে রাখতে পার, এ কাজ আমাকে দিয়েই হবে। কাজ যদি না হয় তাহলে তো পয়সা দিচ্ছ না। কিন্তু পয়সা তোমাদের খরচ করতেই হবে। কারণ আমি কৃতকার্য হবই।

—দুটো জিনিস কি কি ?

—একটা এরোপ্লেন আর একজন পাকা খেলোয়াড় পাইলট। বিভিন্ন খেলা দেখাতে সে অভ্যস্ত।

মরারের ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত হল।

—তুমি কি ছাদে নামবে ?

ফেরারি আবার তাচ্ছিল্যের হাঁসি হাসল।

—না না, ছাদে নামব না। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। ও কেবল খেলা দেখিয়ে সকলকে অন্যমনস্ক করে দেবে। প্লেন যদি আকাশে ডিগবাজি খায়, তাহলে সবাই সেদিকেই তাকাবে, তাই না ? তখন কি কাজের কথা কারোর মনে থাকবে ? পাইলট কেবল বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় খেলা দেখিয়ে যাবে। আমি ঐ সুযোগে আমার কাজ শেষ করব।

—বেশ। দুটো জিনিসই পাবে। কবে চাই ?

—আজ বুধবার। শুক্রবার কেমন ? পাইলটের সঙ্গে দেখা করে কতকগুলি ব্যাপার আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—কখন মারবে ?

—শনিবার রাত্রে। ঐ দিনটাই শুভদিন। ঐ দিন রাত্রে ধোপার কাপড় ডেলিভারী দেওয়া হয়। ফেরারি টপ করে চেয়ার থেকে নেমে পড়ল। এই একটা ছোট অথচ প্রয়োজনীয় জিনিস আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

—ধোপার কাপড় ? ব্যাপারটা কি ? বুঝলাম না। মরার অবাক হয়ে জানতে চাইল এই খুন করার সঙ্গে ধোপার কাপড়ের কি যোগাযোগ আছে ?

—যোগাযোগ দারুণ। ফেরারি আর একটা কথা না বলে এগিয়ে এল দরজার কাছে। তারপর মুখ ফেরাল। আবার শনিবার সকালবেলা দেখা হবে।

দরজা বন্ধ করে ফেরারি চলে গেল।

মরার জোরে একটা নিঃশ্বাস টানল।

—ও কি ঠিকমত কাজ করবে, এ্যাবি?

—ঠিক করবে। গলোউইজ বলল।

মরার ঘাড় নাড়ল।

—আমারও সেই ধারণা। একটা বিষাক্ত সাপ, তাই না? মরার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, লুইকে একবার আসতে বলবে, কিছু কাজ আছে?

গলোউইজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। কিন্তু মুখের চেহারা দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে মরার পায়চারি করছে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল, ঘরে ঢুকল সাইগেল।

—আপনি আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, বোসো।

লুই বসল, ভয়-ভরা চোখে মরারকে লক্ষ্য করল।

—একটা ছোট্ট কাজের ভার দেব তোমাকে। শনিবার রাত্রে ওশান হোটেলে ফেরারি যাচ্ছে। তুমিও ওখানে উপস্থিত থাকবে, বুঝেছ? কাজ শেষ করে ফেরবার পথে ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে। তারপর ওকে খতম করতে হবে।

হুকুম শুনে সাইগেল রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। চোখে তার অবিশ্বাস, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল মরারের দিকে।

—ফেরারি?

—হ্যাঁ, ফেরারি।

—ওকে খতম করতে হবে?

—হ্যাঁ?

—ঈশ্বর! মিঃ মরার……

—তোমাকে তাই করতে হবে। হয় ফেরারি মরবে, নয় তুমি, বুঝতে পারলে?

ছুটির দিন।

ওখান হোটেলে সর্বদা লোকে জমজমাট।

শনিবার বিকেল থেকে লোক আসতে শুরু করে। স্নানের পুকুরে আর খোলা লন-এ জায়গা আর কুলোয় না। সানফ্রানসিসকো, লস এঞ্জেলস্ প্রভৃতি জায়গা থেকে সদলবলে লোক এসেছে উইক এণ্ড কাটাতে।

কনরাড একটা গাছতলায় বসে লোকের ভিড় দেখছিল। ফরেস্ট আসার কথা। তাই সে গাড়ী ঢুকবার লম্বা পথের দিকে তাকিয়েছিল।

সাড়ে চারটে নাগাদ গাড়ি এসে থামল, ফরেস্টকে দেখে সে হাত নাড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন ফরেস্ট। শোফারকে কি বলে লন পেরিয়ে কনরাডের কাছে এলেন, হোটেলের দিকে গাড়ী চলে গেল।

—হ্যালো, পল। ফরেস্ট বললেন। বা, দারুণ জায়গায় বসেছ তো। এখানে তো প্রচুর সুন্দরী মেয়ের আনাগোনা।

—হ্যাঁ, অনেক। একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে কনরাড বলল, বসুন। গার্ডরা এত ভিড় সামলাতে পারছে না, প্রত্যেকের ওপর নজর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

—লক্ষ্য রাখছে ওরা ?

—তা যতদূর সম্ভব রাখছে। কিন্তু এখন অসম্ভব ব্যাপার। তবে সিকিউরিটি অফিস প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে।

ফরেস্ট বসলেন।

—অন্য সব খবর কি ?

—ফ্রানসেস ঠিকই আছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন মুষড়ে পড়ছে। অবশ্য এর জন্য দায়ী ওয়াইনারের মৃত্যু। তাছাড়া, ফ্রানসেস তার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছে। সে সব ভেবে আরও বেশী মনমরা হয়ে আছে।

তার ওপর, ওর বাবার কথা বলে আরও বেশী বিব্রত বোধ করছে। মনে করছে, না বললেই বোধ হয় ভাল হত। ওকে নিয়ে পরে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে। আমার এমনও আশঙ্কা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সাক্ষী দিতে গিয়ে হয়তো পেছিয়ে আসবে।

—ও যে বিবৃতি দিয়েছে, সেটা সই করে নিয়েছ ?

কনরাড মাথা নাড়ল।

—না, সই সে করতে চাইছে না। ওর বিশ্বাস সই না করলে মরার তার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না। এই ধারণা কিভাবে ওর মাথায় ঢুকেছে বলতে পারি না। বরং মরার যদি কিছু করতে পারে তো, সই করবার আগেই করবে, পরে নয়। এ কথা ওকে বোঝাতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে গেছি। আমার কথাটা বোঝবার মত মনই ওর নেই।

…কেবলই এক কথা বলছে, ওর দিন ফুরিয়ে আসছে। আমি তো আর পারলাম না। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

ফরেস্ট একবার চট করে আড়চোখে কনরাডকে দেখে নিলেন।

—পল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—নিশ্চয়ই।

—মেয়েটির উপর তোমার কি আসক্তি জন্মেছে ?

—আপনি দেখছি, বেশ মতলব খাটিয়েছেন, স্যার। কনরাড হাসল। গভীর টান। বলতে পারেন ভালবাসা। সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওকে আমি বলেছি, আমি বিয়ে করব।

মাথা থেকে টুপি খুললেন ফরেস্ট, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন।

—তার কি তোমার প্রতি সমান টান ?

—মনে হয় না। আমার কথা ভাববার তার অবসর কোথায়। একটা কথাই কেবল ভাবছে, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

কিছু দূরে এক দীর্ঘদেহী, অল্পবয়েসী তরুণী শুয়ে আছে। সাদা সাঁতারের পোষাক তার গায়ে। ফরেস্ট সেইদিকে তাকালেন।

—পল, যদি বিয়েই করতে হয়, সুন্দরী মেয়ের কি অভাব ? তুমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে, এটা আমার একদম পছন্দ নয়। মিস কোলম্যানকে উপযুক্ত মনে করি না।

—আপনি কি ওর বাবার কথা ভেবে একথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, ওর বাবার জন্যই আমি আপত্তি করছি। পল, তুমি একটা উঁচুস্তরের লোক। আমার পরে তুমিই হবে ডি. এ.। তাই এমন মেয়েকে স্ত্রীর আসনে বসালে তোমার পক্ষে সুবিধা হবে না।

কনরাড বিব্রত বোধ করল।

—স্যার, আমি জানি, আমার কথা আপনি ভাববেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে এটাও ঠিক, চাকরিই সর্বদা জীবনের সব কিছু না।

ধীরে ধীরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফরেস্ট। একটা চুরুট বের করে অগ্নিসংযোগ করলেন।

—কি করবে, না করবে, সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করছে পল। বিয়ের পর কোথায় যাবে? ভেবেছি কিছু?

—না, বিশেষ কিছু ভাবিনি। তবে ইচ্ছা আছে, মামলা চুকে গেলে ওকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাব। ফ্রানসেসকেও একথা জানিয়েছি। কিন্তু ও আমার কথার আমলই দেয় না। বর্তমান তার কাছে সব। ভবিষ্যৎ নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। মনে কেবল পুষে রেখেছে একটা কথা, ও আর বেশীদিন বাঁচবে না।

—তাকে খুব একটা দোষারোপ করা যায় না। ফরেস্ট বললেন। শহরের এক ক্ষমতাবান গুণ্ডা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে। তার এই সাক্ষ্য, ঐ প্রতিষ্ঠানকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা ওদের, সামান্য কথা নয়। এতবড় একটা রাজ্যের রাজত্ব মরার চট করে ছাড়তে চাইবে না। এটা কেউ-ই চায় না।

…অতএব মরার যতক্ষণ পারবে, যেভাবে পারে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। ওরা যে এখানেও হানা দেবে না, এমন কি কথা আছে?

কনরাড হাতের মুঠো পাকাল।

—এখানে সে নিরাপদ। তাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। যখন ওকে আদালতে যেতে হবেই তখনই সত্যিকারের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

—মিস কোলম্যান এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, একথা তুমি জোর গলায় বলতে পার?

—নিশ্চয়। সে এখানে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। মিস কোলম্যান কোথায় আছে, এ খবর ওদের অজানা।

—এ সম্বন্ধে তুমি হলফ করে বলতে পার?

এবারে কনরাড একটু দমে গেল, তেমন বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিতে পারলো না। ফরেস্টের দিকে সে তাকাল।

—স্যার, আপনার কি ধারণা? আপনি কি মনে করেন, ওর খোঁজ ওরা পেয়ে গেছে?

—সঠিক বলতে পারছি না। তবে মনে রেখো, মরার খুব চতুর লোক। আচ্ছা পল, জেনী কি এই হোটেলের কথা জানত?

—জেনী? হঠাৎ জেনীর কথা বলছেন কেন?

—জেনী কি জানত?

—হ্যাঁ, টেলিফোন নাম্বারটা ও জানত। ও তো সম্পূর্ণ একাই ছিল। ভাবছিলাম, যদি কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে টেলিফোনে পারে। তাই নম্বরটা বলে এসেছিলাম। আর এটাও তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, এ খবর যেন দ্বিতীয় কেউ না জানতে পারে, অত্যন্ত গোপনীয় নাম্বার।

—টেলিফোন করলেই তো জানা যায় বারউড ওশান হোটেল। চুরুট টেনে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ফরেস্ট।

—আপনি কি মনে করছেন, জেনী কাউকে বলে দিয়েছে? কিন্তু আমি তা ভাবতে পারছি না। জানি, জেনীর অনেক দোষ আছে। কিন্তু আমি যেখানে নিষেধ করেছি, সে কাজ সে করবে না। আমার বিশ্বাস হয় না কিছুতেই।

—অবিশ্বাস্য হতে পারে। কিন্তু কারো সম্বন্ধেই জোর করে কিছু বলা যায় না। আবার আমার মতে, কোন অনুমানের ওপর জোর দেওয়া ঠিক নয়, তুমি যদি তাকে নিরাপদে রাখতে পার।

……তোমার কি মনে আছে, তোমার স্ত্রীর প্যারাডাইস ক্লাবে আনাগোনা ছিল? মরারের প্রধান আড্ডা হল ঐ ক্লাব। মিস কোলম্যানের খোঁজ সে জানত, হঠাৎ সে মারা গেল।

……হয় তো একটার সঙ্গে অন্যটার কোন সম্পর্ক নেই, আমি হয়তো ভুল-ভাল বলতে পারি, কিন্তু থাকতেও পারে। তাই অনুমানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, নিরাপদে আছি একথা মনে ঠাঁই না দেওয়া উচিত। যতদিন বাঁচবে ততদিন কিছুই নিরাপদ নয়।

—সেটা অবশ্য ঠিক। বিপদ চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জেনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাকে এই প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিতে পারেন। তার মৃত্যু আকস্মিক। ওর ঐ লম্বা ড্রেসিং গাউন পরে সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা-নামা একদম পছন্দ করতাম না। কতদিন ওকে সাবধান করে দিয়েছি।

……না না, জেনী কাউকে ওশান হোটেলের কথা বলতেই পারে না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মরারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ফ্রানসেসের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এর থেকে কি করা যেতে পারে? আপনি ওপরে উঠে দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি তেমন কিছু করার প্রয়োজন মনে করেন তো করা যাবে।

ফরেস্টের ঠোঁটে চুরুট। সে দেখল, একটা বড় সাদা ভ্যান এগিয়ে আসছে। ক্রেনমিয়াম অক্ষরে ভ্যানের গায়ে লেখা—বারউড হাইজিনিক লণ্ড্রী সারভিস।

—তুমি যদি মনে কর, সব ঠিক আছে, তাহলে তো কোন কথাই নেই। এখন মেয়েটার সাক্ষীর ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। মরারকে আমরা এতদিন পর এই প্রথম বাগে পেয়েছি। দেখা যাক, কে জেতে, কে হারে।

ফরেস্ট ঐ সাদা ভ্যানটির দিকে তাকিয়ে আছে, কনরাডও সেই দিকে তাকাল। রাস্তার মোড় ঘুরে ভ্যান হোটেলের দিকে যাচ্ছে।

—মরারকে ধরতে আমরা অনেক সময় নিচ্ছি, তাই না? কনরাড বলল। ও বাইরে থাকা পর্যন্ত ফ্রানসেসকে এখানেই রাখতে হবে।

—ওর ইয়াট লক্ষ্য করার জন্য সমুদ্রে প্রত্যেকটি জাহাজে হুঁশিয়ারী পাঠানো হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ বোট ওর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পল, সমুদ্র একটুখানি জায়গা নয়, বিরাট। তবে ওকে খাবারের খোঁজে তীরে থামতেই হবে। সে আজ হোক অথবা দুদিন পরেই হোক। তখনই তাকে ধরব। ফরেস্ট দাঁড়ালেন। চল পল, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে আসি, যদি কোন খুঁত পাই।

দুজনে হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন।

সাড়ে ছ'টা।

ওশান হোটেলের রান্নাঘর, প্যাসেজ, আশে-পাশের ঘরে লোকের ব্যস্ততা আরও বাড়ছে। প্রায় পাঁচশ লোক খাবে, তাদেরই ডিনার তৈরী হচ্ছে।

কাছেই স্টাফ কোয়ার্টার, খালি আর অন্ধকার। রান্নাঘরে রাঁধুনি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, গরমে তারা ঘামছে। রান্নাঘরের বাইরে বড় বারান্দা। সেখানে রাশি রাশি ধোপার কাপড় স্তূপীকৃত হচ্ছে। বড় বড় তাকে রাশি রাশি কাপড় ঠাসা। কাল সকালে এখান থেকে সব বোর্ডারদের ঘরে যাবে। বারান্দার একটা পাশ প্রায় পাহাড়ের মত উঁচু হয়েছে।

ভিটো ফেরারি তার বামন চেহারাটি নিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে উঁচু র‍্যাকে কাপড়ের আড়ালে, অনড়। তার কানে এসে পৌঁছচ্ছে জনতার কোলাহল আর ব্যস্ততা।

আর আধ ঘণ্টা বাকি। তারপর প্রায় সব লোকই হাজির হবে রেস্তোরাঁয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার সাজানো শুরু হবে। ফেরারি চুপ করে একভাবে পড়ে আছে। ঠিকমত নিঃশ্বাসও সে নিতে পারছে না।

এমনভাবে শরীরকে গুটিয়ে নিয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকতে ফেরারির একদম কষ্ট হয় না। একজন পেশাদার খুনির সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ধৈর্য্য। ধৈর্য্যই হল তার মহৎ গুণ। এই গুণটির অভাব নেই ফেরারির মধ্যে।

ভ্যান থেকে র‍্যাকে চালান হবার জন্য কুড়ি ডলার খরচ করতে হয়েছে। অবশ্য সে আরও বেশী খরচ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আর লাগেনি। ঘুষ হিসেবে কুড়ি ডলারই যথেষ্ট।

লণ্ড্রী ভ্যানের লোকটার মনে বিশ্বাস যোগাবার জন্য ফেররিকে গল্প ফাঁদতে হয়েছে। সে বলেছে, হেড রাঁধুনীর স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রেম হয়েছে, একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। সে কি তাকে এইটুকু সুবিধা করে দেবে না?

ডেলিভারীর লোকটা বামন আকৃতির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে। এক সময় প্রকাশ করে বলল—আহারে, বেচারা! হেড রাঁধুনীর স্ত্রীর কি করুণা। নয় তো এমন একটা বামনের প্রেমে পড়তে পারে? হয় কৃপা করেছে, নতুবা বাঁদর নাচাচ্ছে। কত আর ওজন হবে লোকটার? খুব বেশী হলে নব্বই পাউণ্ড। ওঠো বাপু ওঠো, আমাকে এর চেয়ে বেশী ওজন বইতে হয়।

ফেরারি পাথরের মত অনড় হয়ে পড়ে আছে।

অপেক্ষা করছে। বার-বার হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। সময় টিক-টিক করে বয়ে যাচ্ছে।

সাতটা বাজল।

এখন অত ব্যস্ততা নেই, কমে এসেছে।

সাড়ে সাতটার পর ফেরারি আর কোন সাড়া শব্দ পেল না। পোশাকের ফাঁকে চোখ রাখল, দেখল প্যাসেজে কেউ নেই। বারান্দা থেকেও হাঁটা চলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার ফেরারি আর একটু গলা বাড়াল। কিন্তু খুব সন্তর্পণে। না, নীরব চারিদিক। তবে মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে দু'একটা কথা শোনা যাচ্ছে।

এই তো স্বর্ণ সুযোগ।

কাপড়ের স্তূপ সরিয়ে ধীরে ধীরে নেমে পড়ল ফেরারি। একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। প্যাসেজে এসে দু'দিক আগে দেখে নিল, জনশূন্য। স্টোর রুমের দিকে এগোল সে। রুমের পাশেই

স্টাফদের ব্যবহারের জন্য লিফট। প্যাসেজের একবারে শেষ প্রান্তে হাজির হল সে, তারপর একটা বড় ট্রলী। তার মধ্যে রাশি রাশি বীয়ারের বাক্স।

লিফট নামছে।

ফেরারি দ্রুতপায়ে বাক্সের পেছনে আত্মগোপন করল।

লিফট নীচে নমাবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ওয়েটার একটা ট্রলী ঠেলে বার করল তারা ট্রলী নিয়ে প্যাসেজের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফেরারি লিফটের দরজা বন্ধ করে ন-তলার সুইচ টিপে দিল। শব্দহীন লিফট আপন পথে এগোতে লাগল।

লিফটের গায়ে আরামে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ফেরারি। পকেট থেকে বের করল একটা কাঠি। পরম নিশ্চিন্তে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগল।

এ পৃথিবীতে আর কারুর চিন্তা থাকে তো থাক, কিন্তু ফেরারির এখন কোন ভাবনা নেই। সে এখন নিশ্চিন্ত, পরম নিশ্চিন্ত।

লিফট এসে থামল ন-তলায়।

এইবার তার বিপদের মুহূর্ত শুরু হল। লিফট থেকে বেরিয়েই যদি কারোর নজরে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই। তাহলে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তা সত্ত্বেও তাকে এগোতে হবে, কোন উপায় নেই। যে কোন পরিকল্পনাতে দু'একটা অব্যর্থ ঝুঁকি থাকবেই, কেউ তা এড়াতে পারে না। এ পর্যন্ত ভাগ্য তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, এবারে দেখা যাক। এ মুহূর্তে ভাগ্যের কাছ থেকে কিছুই পাবে না, তাকে ঠকাবে ?

সে মনস্থির করল।

লিফট থেকে বেরোবার আগে কোটের পকেটে রিভলবারের হাতলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

করিডোর ফাঁকা।

খানিকটা এগোল সে, জানালায় পর্দা ঝুলেছে। এই জানালা সমুদ্রের দিকে। পর্দার আড়ালে লুকাল সে। একজন আসছে। তার মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠল, ভাগ্য তার সঙ্গে এখনও আছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল সে। দেখল একটা লম্বা-চওড়া ইয়া-চেহারার লোক ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। তার গায়ে লেখা পুলিশ। জানালার পাশ দিয়ে এগিয়ে করিডোরে মোড় নিল, তারপর তার লম্বা দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতি সন্তর্পণে ফেরারি পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলো।

প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেল। আর একটা পর্দা দেখতে পেয়ে লুকাল তার পেছনে। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দু'দিকে নজর দিতে লাগল।

হঠাৎ একটা ঘরের দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। নিচু গলার ইভিনিং গাউন তার পরণে। ফেরারি তাকে দেখতে লাগল। মেয়েটির অর্ধাবৃত বুক আর কাঁধের দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল সে। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল, কিন্তু চাবি আটকাতে ভুলে গেল, সেটা দরজার গায়েই রয়ে গেল।

সেই গার্ডটি আবার আসছে। মেয়েটির পাশ দিয়ে যাবার সময় টুপীতে হাত ঠেকাল। মেয়েটির ঠোঁটে খেলে গেল একটুকরো মিষ্টি হাসি। গার্ড পেছনে আর না তাকিয়ে চলে গেল।

লিফটের সুইচ টিপে অপেক্ষা করতে লাগল মেয়েটি। কিছুক্ষণ পর সে খাঁচায় ঢুকে পড়ল। লিফট নীচে নামতে লাগল।

ফেরারী আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে।

যে ঘর থেকে মেয়েটি বেরিয়েছিল, সেই ঘরে ফেরারি নিঃসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল, চাবিটা নিতে ভুলল না।

অন্ধকার ঘর। খিল আটকে দিয়ে বাতির সুইচ টিপল।

বেশ বড় ঘর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাতি নিভিয়ে দিল, জানালার কাছে এগিয়ে এসে পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিল।

নীচের দিকে লক্ষ্য করল সে। চোখে পড়ল সাঁতারের পুকুর, লন। চারিদিকে বাতি জ্বলছে। পুকুরে অনেকেই সাঁতার কাটছে। ওয়েটারদের হাতে মদের ট্রে, তারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এর ঠিক উল্টো দিকে দশতলায় ফ্রানসেসের ঘর, ফেরারি জানে। তাই প্রথমে তাকে ছাদে উঠতে হবে। তারপর যে কোনভাবে তার জানালার ওপর কার্নিশে নামতে হবে।

ছাদে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়, তার ওপর বিপজ্জনক। এরকম বিপজ্জনক আরোহণ তার জীবনে ক'টা হয়েছে আঙুল গুণে বলে দিতে পারবে। শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে সে এই ছাদ দীর্ঘক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেছে।

পর্দা সরিয়ে জানালার ওপর বসল সে, তাকাল নীচের দিকে। তখনও লোকের

ভীড় কমেনি। সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে। তাই একটু একটু আলোর রেশ রয়ে গেছে। আর আধঘন্টা পরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ ওপরে কেউ তাকায় দেখতে পাবে না।

ফেরারি নিঃশব্দে বসে রইল। সাঁতারের পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে। জলে আলো এসে পড়েছে, চিকচিক করছে। সে নির্ভাবনায় আছে, খুবই স্বাভাবিক কায়দায় সে বসে আছে, শরীরে কোন আড়ষ্ট ভাব নেই। ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে।

ক্রমে অন্ধকার নেমে এল। নটা নাগাদ চারিদিকে ঘন অন্ধকার।

সযত্নে নিয়ে আসা লম্বা, সরু সিল্কের দড়ি সে ধীরে ধীরে কোটের নীচ থেকে বার করল। শরীরের সঙ্গে পাক দিয়ে দিয়ে দড়িটা রেখেছিল। দড়ির একদিকে রবার জড়ানো বঁড়শী, আর অন্যদিকে প্যাড লাগানো রিং।

এবার সে জানালার বাইরে দাঁড়াল, ওপর দিকে তাকাল। তার মাথার ঠিক ওপরে দশতলার একটা ঘরে ঝুলবারান্দা। দড়ি ছুঁড়ল। ঝুলবারান্দার রেলিংয়ে গিয়ে আটকালো রবার জড়ানো বঁড়শী। ভালমত আটকেছে কিনা দেখার জন্য জোরে টান দিল।

মহানন্দে বাঁদরের মত দড়ি বেয়ে বেয়ে ফেরারি ওপরে উঠে গেল। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঝুলবারান্দায় লাফিয়ে পড়ল।

দড়িটা গুটিয়ে হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে চোখ দিল। ঘর শূন্য। কেউ তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা দেখার জন্য বারান্দায় ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল। না, সব যে যার তালে আছে। সে নিশ্চিন্ত হল।

ঝুলবারান্দার ছাদে উঠে পড়ল সে। তাকাল মাথা উঁচু করে। একেবারে খাড়া ছাদ, প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু হবে খুব কম করেও। ছাদ বেয়ে নেমে এসেছে পুরু নর্দমা, বৃষ্টির জল ঠিকমত যাওয়ার জন্যই এই বন্দোবস্ত। নর্দমার মুখ লক্ষ্য করে সে দড়ি ছুঁড়ল, কিন্তু আটকালো না।

আবার দড়ি ছুঁড়ল। না, এবারেও আটকালো না। এই কারবারের পর বঁড়শী গিয়ে আটকাল নর্দমার মুখে। প্রাণপণ জোরে টান দিয়ে দেখল সে, দড়ি আটকে রইল।

আস্তে, অতি সাবধানে উপরে উঠতে লাগল ফেরারি।

তার শরীরটা রীতিমত শূন্যে ঝুলছে। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে উঠতে লাগল। কতদিনের পুরণো নর্দমা কে জানে।

এক সময়ে হাজির হল নর্দমার শেষ প্রান্তে। থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল নর্দমার মুখ।

দু'হাতে ভর দিয়ে কোমর পর্যন্ত উঁচু করল, শরীরটা নর্দমার ওপরে। তারপর প্রথমে একটা পা তুলে দিয়ে ভার ঠিক করল। কয়েক মুহূর্ত!

মাথার ওপর খাড়া ছাদ। অনেক নিচে আলোর ফুলঝুরি। অত ওপর থেকে গাড়িগুলোকে খেলনার মত দেখাল।

সামনের দিকে সম্ভব মত ঝুঁকে আর একটা পা সে ওপরে তুলল। কিন্তু তখনও দুটো হাত শরীরের সম্পূর্ণ ওজন বহন করছে। একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষে নেই, একেবারে তালগোল পাকিয়ে নীচে পড়বে।

বিপদটা সে জানে। কিন্তু তবুও সে শান্ত, চাঞ্চল্য নেই এতটুকু।

সে মরারকে বলেছিল পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই এ কাজ করতে পারে। সত্যিই সে তাই বিশ্বাস করে বলেছিল। না, ফেরারির মনে সাহস আছে। ক্ষণিকের জন্য তার মনে হল, সে কি নিজের ওপর খুব বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছে?

হাঁটু দুটো ধীরে ধীরে বুকের কাছে আনতে লাগল। হঠাৎ শরীরটা পেছন দিকে চলে গেল, এক মুহূর্তেরও কম সময়ের জন্য।

নর্দমার মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ফেরারি, বুকের কাছে মাথাটা নুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ভারটাই শরীরকে ঠিক করে দিল। আরও একটু সামনের দিকে ঝুঁকল।

ফেরারি নিঃশব্দে বসে রইল প্রায় এক মিনিট। শুধু তার নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা সে অনুভব করতে পারছে। কপাল থেকে ঘাম ঝড়ে পড়ছে কানে, গালে চোখে। এবারে সে হাঁপাতে লাগল।

মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তার মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে চলে গেল। এই সময় যদিও সে নীরব, কিন্তু নির্বিকার থাকতে পারল না।

সামনের দিকে যতটা ঝোঁকা যায়, ঝুঁকে আবার বুকের কাছে পা টানতে লাগল। তার শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে হাড়ভাঙ্গা 'দ' এর মত হয়ে গেল। হাঁটু দুটো এসে মিশেছে তার চিবুকের কাছে। এমনভাবে সে ঝুলছে, মনে হয় নর্দমার ধারে একটা কালো বল আশ্চর্যভাবে ঝুলছে। নিশ্বাস বন্ধ করে এক লাফে সে ওপরে উঠে গেল। টালির ছাদের ওপর একমুহূর্ত কাত হয়ে পড়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে নর্দমার ধারে পা রেখে ছাদে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এল, ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল।

গলা থেকে জড়ানো দড়িটা খুলে ফেলল। ছুঁচলো কোণায় বঁড়শী আটকানোর জন্যে দড়ি ছুঁড়ল।

কয়েকবার ছুঁড়বার পর আটকাল ঠিক। যেটুকু নিরাশ হয়েছিল, আবার আশা ফিরে এল। বুঝতে পারল, সে ভয় পেয়েছে। এবার ভয়ের হাত থেকে মুক্তি। অত্যন্ত সাহসে ভর করে সে ছাদের গায়ে পা রেখে রেখে চূড়ায় উঠে এল। তারপর দুদিকে দুটো পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল।

এবার সে সমুদ্র লক্ষ্য করল। দু'শ ফুট দূরত্বে সে রয়েছে। বালির চড়ায় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। এবারে নিচে নামার পালা। তাহলেই ফ্রানসেসের জানালার কার্নিশে পৌঁছাবে সে।

নিচের জানালা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে। কানে আসছে রেডিওর বাজনা।

তেমনি দড়ি ধরে নামতে লাগল ফেরারি। নামতে তার কোন অসুবিধাই হচ্ছে না, টালিতে সাবধানে পা রেখে রেখে নামছে। এদিকের ছাদ তত খাড়া নয়।

জানালার কার্নিশে এসে হাজির হল। শুয়ে পড়ল। কেবল মাথাটা উঁচু করে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

তাজ্জব ব্যাপার! মুহূর্তের জন্য ফেরারি অবাক হয়ে গেল। সে কি চোখে সরষের ফুল দেখছে? ভাল করে চোখ দুটো রগড়ে নিল। না, ঠিকই দেখছে। ঘরে রয়েছে ফ্রানসেস আর দুজন মেয়ে পুলিশ।

ঘরের মাঝখানে চেয়ারে বসে আছে পুলিশ দু'জন। একজন বই পড়ছে, অন্যজন সোয়েটার বুনছে।

আর ফ্রানসেস?

সে পরম নিশ্চিন্তে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

উপুড় হয়ে ফেরারি সব লক্ষ্য করতে লাগল। এখন ফ্রানসেস চিরুনী রেখে উঠে দাঁড়াল। নীল রঙের পোশাক পরায় তাকে আরও ফর্সা লাগছে। জানালার প্রায় কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল সে।

এখন আর কিছু করার নেই। তাই সে মাথা সরিয়ে একভাবে পড়ে রইল।

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল, সাড়ে নটা। তার মানে আরও তিরিশ মিনিট তাকে এইভাবে থাকতে হবে।

ফেরারি সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষায় রইল।

*　　　*　　　*

ফরেস্ট ঘরে ঢুকলেন, কনরাড মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

নিচে ডিনার শেষ করে হোটেলের চারপাশ দিয়ে একবার টহল দিয়েছে।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলেন ফরেস্ট।

—ডিনারটা খারাপ হয় নি। বেশ আয়োজন করে এরা, না?

—হ্যাঁ, ভাল। কনরাড বলল। তারা দুজনে একসঙ্গেই খেয়েছে। কিন্তু কি কি খেয়েছে, কনরাড তা খেয়াল করেনি। ফ্রানসেসের সঙ্গে দেখা করলেন?

—খুব ভাল মেয়ে, চমৎকার দেখতে। ফরেস্ট পা ছড়িয়ে দিলেন। অনেক সময় ধরে ওর সঙ্গে কথা বললাম। কথাবার্তা শুনে মনে হল এবার সে সই করবে। কিন্তু মরার নামে অতি-মানবটি তার মন সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে। ওয়াইনারই তার মনে এই ভয়টা ঢুকিয়ে দিয়েছে। কথা দিয়েছে, কাল আমাকে সঠিক করে বলবে। তোমার কথা বললাম।

—তাই নাকি? কনরাডের ঠোঁটে হাসি। কেমন মনে হল?

—তুমি ওকে বিয়ে করবে শুনে বেশ যেন অবাক হয়ে গেছে। আসলে ওর মধ্যে অনেক রকম চিন্তা দানা বেঁধেছে। পল, তোমার ধৈর্য হারালে চলবে না। বেশী সময় লাগবে।

…আমি ওকে জানিয়েছি, সে যদি তার বিবৃতিতে সই করতে রাজী হয় তাহলে মামলা চুকে গেলে ওকে আমরা ইউরোপে পাঠিয়ে দেব। তুমিও ওর সঙ্গে যাবে। আমার এই প্রস্তাব শুনে মনে হল খুশী হয়েছে।

—খুশী হয়েছে? বাঃ, আপনি একটা দারুণ কাজ করছেন। অবশ্য কিছু খরচ হবে। তা হোক, ছুটি পাওয়া যাবে তো?

—হ্যাঁ, ছুটি মিলবে। তুমি দু'মাসের ছুটি পাবে।

—কোথায় যেতে চায়, বলেছে কিছু?

—আমি বললাম, প্রথমে তার ভেনিস দেখা দরকার। চমৎকার জায়গা, আর প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। আর পল, তুমি যদি গনডোলায় খানিকটা রোমান্স তৈরী করতে পার, তাহলে বুঝবো তুমি কাজের। তুমি কি ভেনিস গিয়েছ?

হনিমুন করতে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

—বেশ তো, ভেনিসেই প্রথমে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। মামলার সময় আমাদের খুবই হুশিয়ার থাকতে হবে। এখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন লাগল ?

—চমৎকার। আমার আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওকে কি ভাবে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে, এবার সেটাও স্থির করতে হবে। পল, তুমি কি কিছু ভেবেছ ? প্লেনের শব্দ পাচ্ছি মনে হয় ? ফরেস্ট জানালায় বাইরে তাকাল। মনে হচ্ছে খুব নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

তাই ইঞ্জিনের এত কর্কশ শব্দ। ওরা দুজনেই চমকে উঠল।

—এদিক দিয়ে রোজই একটা প্লেন যায়। কনরাড বলল, প্যাসিফিক সিটি থেকে লস এন্জেলসের দিকে যায়। ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, দশটা বাজে। এই সময়েই যায়।

···আচ্ছা—ওকে সাঁজোয়া গাড়িতে করে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? সামনে পেছনে মোটর সাইকেলে গার্ড থাকবে। একবার সেখানে পৌছতে পারলে হয়, তারপর না হয় কোর্ট হাউসেই থাকবে। ওপরে ঘর আছে। তবে তেমন আরামদায়ক না হলেও অসুবিধা হবে না। খুব সম্ভব এক সপ্তাহ বা দশদিনের বেশী লাগবে না মামলা শেষ হতে।

—বুঝলাম। ফরেস্ট বললেন, কিন্তু তার আগে মরারকে ধরতে হবে।

—কোন খবর পেয়েছেন কি ?

—তোমায় বলা হয়নি, বার্ডিন আধ ঘণ্টা আগে টেলিফোন করেছিল। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, বার্ডিন লোক পাঠিয়েছে।

কনরাড চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

—ফিরে এসেছে ? কে একথা প্রচার করল ?

—মনে হচ্ছে প্লেনটা আবার এদিকে আসছে।

প্রায় জানালার পাশ দিয়ে উড়ে গেল প্লেন ঘরের বাতাস কাঁপিয়ে।

চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন ফরেস্ট। —পল দেখবে এসো।

কনরাড উঠে এল, ফরেস্টের পাশে দাঁড়াল।

সমুদ্রের ওপর গোল হয়ে উড়ছে একটি প্লেন। অনেকগুলো লাল নিয়ন

বাতি জ্বলছে প্লেনের গায়ে। হঠাৎ নজরে পড়লে মনে হবে স্বর্গ থেকে যেন নেমে এসেছে কোন এক আশ্চর্য পাখি।

একটা পাক দিয়ে প্লেন আবার উড়ে আসছে হোটেলের দিকে।

—কোন বিজ্ঞাপন বোধ হয়। কনরাড বলল। তার প্লেনের দিকে নজর নেই। সে কেবল ফ্রানসেসের কথা চিন্তা করছে। ভেনিসে গনডোলার কথা তার মনের বাসনাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

—লোকটার বাহাদুরির প্রশংসা করতে হয়। ফরেস্ট একটু জোরেই বললেন।

ততক্ষণে প্লেনটা হোটেলের চারপাশে পাক দিয়ে সাঁ করে ছুটল সমুদ্রের দিকে।

—কিসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। এই পল, এসো না, দেখ।

ফরেস্টের এই ছেলেমানুষি কৌতূহল কনরাডের পছন্দ হ'ল না। তাই খোলা জানালায় এসে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

প্লেনটা যেমন তীরবেগে ওপরে উঠেছিল, তেমনি আবার চিলের মত একেবারে নিচে নেমে গেছে। প্লেনের একটি পাখার ওপর একটি লোক দাঁড়িয়ে, গায়ে তার নীল বাতি। প্লেন আবার হোটেলের দিকে উড়ে আসছে। লোকটি হাত নাড়ছে।

—কোন কিছুকে ভয় করে না এরা, বোকা। কনরাড মন্তব্য করল, পয়সার জন্য সব কিছু করতে রাজী।

—জান পল, আমি যখন ছোট ছিলাম, ফরেস্ট বলতে থাকে, তখন এমনই উদ্ভট সখ ছিল, উড়ন্ত প্লেনের পাখায় হাঁটব। লোকটার কি সাহস দেখ।

হোটেলের কাছাকাছি প্লেন ঘুরপাক খাচ্ছে। হাতের উপর ভর দিয়ে পা দুটি শূন্যে তুলে দিয়েছে লোকটি।

নিচেও হৈ চৈ হচ্ছে। অস্পষ্ট আনন্দ কোলাহল কনরাডের কানে এল। সবাই ওপরে তাকিয়ে আছে, হাত নাড়ছে প্লেনের উদ্দেশ্যে।

—আবার আসছে, ফরেস্ট বললেন, তিনি জানালার বাইরে ঝুঁকে পড়েছেন, এবারে একটা হাতের ওপর…

হঠাৎ কনরাডের মনে হল, পায়ের নিচ থেকে গালিচা সরে যাচ্ছে। লক্ষ্য করল, ফরেস্টের শরীরটা জানালার বাইরে চলে গেছে, কিছু একটা ধরবার জন্যে হাত তুলেছেন তিনি।

কনরাড দ্রুত হাতে ওঁর কোট টেনে ধরল। মনে হল, কোটের কাপড়

হাতের মুঠো থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি জানালায় না ঠেকিয়ে ফরেস্টকে ঘরের মধ্যে টেনে আনল কনরাড।

—হায় ঈশ্বর! কনরাড অস্ফুটে বলে উঠল।

ফরেস্টের সর্বাঙ্গ কাঁপছে, হঠাৎ মৃত্যুর ভয়ে মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

—পল, তোমায় অজস্র ধন্যবাদ। ফরেস্ট প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন। আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলাম। খুব সম্ভব, গালিচাটা পিছলে যাচ্ছিল। ধন্যবাদ।

কনরাড যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। হতভম্ব হয়ে গেল। তার মুখটাও সাদা।

প্লেনটা উড়ছে। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর, বীভৎস চীৎকার তাদের কানে ভেসে এল, প্লেনের শব্দের চেয়েও জোরালো। ক্ষণেকের মধ্যে দুজনের রক্ত হিম হয়ে গেল।

—কি হল? হল কি? ফরেস্ট চেঁচিয়ে উঠলেন।

কনরাড আর দেরী না করে দরজাটা একটানে খুলে ছুটল। লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডোর পেরিয়ে ফ্রানসেসের ঘরে ঢুকল। দেখল, দুজন গার্ড পুলিশ দুদিক থেকে দৌড়ে আসছে।

দুজন মহিলা পুলিশ নির্বাক হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক দুটি স্ট্যাচু। ম্যাজ দু-হাত কচলাচ্ছে, যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে পাগল করে তুলেছে।

ঘরে ফ্রানসেস নেই।

—ম্যাজ, কি হল? কোথায়—কনরাড আৎকে উঠল।

—ও পড়ে গেছে, ম্যাজ কাতরে উঠল। ও জানলার বাইরে ঝুঁকে প্লেন দেখছিল, হঠাৎ বীভৎস চীৎকার। আমি দৌড়ে গিয়েও ধরতে পারলাম না। মনে হল, কে যেন ওকে জানালা দিয়ে সজোরে টেনে বের করে নিল। একটু চেষ্টা করেছিল, মনে হল পায়ের তলা থেকে গালিচাটা সরে যাচ্ছে। তারপরেই তাকে আর দেখা গেল না।

ফরেস্ট তাড়াতাড়ি কনরাডকে সরিয়ে জানালার কাছে গেলেন। তাকালেন নীচের দিকে।

বালির ওপর, প্রায় দুশ ফুট নিচে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে ফ্রানসেস, যেন একটা হাত পা ভাঙা পুতুল।

ফরেস্ট একভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে। তারপর এক সময় জানলার কাছ থেকে সরে এলেন।

কনরাড অসুস্থ বোধ করল, তার পা টলছে। কয়েক পা এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

—শেষ পর্যন্ত ফলাফল এই দাঁড়াল। জড়ানো গলায় বললেন ফরেস্ট, সব গেল ভেস্তে, মরারের বিরুদ্ধে মামলা গেল উচ্ছন্নে—কিছু আর করার নেই—মেয়েটার মত।

হোটেলের কাছে আরও একবার নেমে এল প্লেনটা। তারপর ওর নিয়ন বাতি গেল নিভে। তারপর পলকের মধ্যে দূর আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ এগারো ॥

পরদিন সকালবেলা।

দশটা নাগাদ নীল আর রূপালী রঙের ক্যাডিলাক সিটি হল-এর সামনে এসে থামল।

গাড়ী থেকে নামল জ্যাক মরার আর তার এ্যাটর্নী এ্যাবি গলোউইজ। সঙ্গে তার চারজন বডিগার্ড।

অল্প কিছুক্ষণ আগে প্রায় সব কাগজে প্রচার হয়েছে ডিসস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নীর কাছে মরার আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। তাই সিটি হল এর সামনে রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, টেলিভিশন ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরার ভিড়। সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

মরারের ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে আছে, সবাইকে সে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল। সে আবার টেলিভিশন খুব পছন্দ করে। অজস্র লোক টেলিভিশনের পর্দায় তাকে দেখবে ভেবে খুশীতে সে উথলে উঠল।

রিপোর্টাররা তাকে কাছে আসতে চায়, কথা বলতে চায়। কিন্তু চারজন বডিগার্ড তাদের দমিয়ে রেখেছে।

—বন্ধুগণ, একটু অপেক্ষা কর, মরার তাদের উদ্দেশ্যে বলল, আগে আমি হল থেকে বেরিয়ে আসি, তখন তোমাদের কিছু বলব। ধৈর্য্য ধর, ডি. এ.-র সঙ্গে কথা বলে নিই।

—আপনি কি ভাবছেন হল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন? পেছন থেকে একজন রিপোর্টারের আওয়াজ শোনা গেল। মরার মুক্তি পাবে; যেন তার কল্পনার অতীত।

মরার নিরুত্তর। কথার পরিবর্তে তার মুখে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গতা ভরা হাসি। বডি গার্ডদের নিয়ে সিটি হলের মধ্যে সে প্রবেশ করল।

—হারামজাদা কোথাকার, রিপোর্টারটি বলল, বাবু ফিরে এসে কথা বলবেন। এবার ওরা মক্কেলকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

—কিন্তু তোমার ধারণা ভুল। প্যাসিফিক হেরাল্ডের রিপোর্টার জবাব

দিল, তুমি কি মনে কর মরারের মত একজন বেজন্মা এখানে থেকে যাবে বলে এসেছে। ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে? আমি দশ ডলার বাজি রাখছি, এল বলে।

—ভায়া, দশ ডলার তোমার গেল। অন্য একজন মন্তব্য করল। আমি জানি, ফরেস্ট ওর বিরুদ্ধে কিসের চার্জ আনবে।

—জানি। খবর রাখ, একমাত্র সাক্ষী কাল রাত্রে জানালার বাইরে পড়ে খতম হয়ে গেছে? চেন মরারকে? ভেবেছ, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ও কাউকে রক্ষে রাখবে? সাক্ষী দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত কেউ জীবিত আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাল রাতের ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা। আমি এ বিষয়ে কনরাডের সঙ্গে কথা বলেছি। ওর কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। আচমকা জানালা গলে নিচে পড়ে যায় মেয়েটি।

—যেমন, স্নানের ঘরে বাথ-টবে ডুবে গিয়ে ওয়াইনারের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে, তেমনি, তাই না? যতসব আজে বাজে গল্প। তোমরা বিশ্বাস কর এইসব গোঁজামিল দেওয়া গল্প? যদি তাই হয়, তাহলে তুমিও কনরাডের পর্যায়ভুক্ত।

মিনিট পনেরো কেটে গেল।

মরার তার চারজন বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল, মুখে তার জয়ের হাসি। তখনও সমানে চলছে তর্ক।

মরার হঠাৎ থমকে গেল তাদের কথায়।

সিঁড়ির ওপরে সে দাঁড়াল। নিচে রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানের উদ্দেশ্যে হাসল।

তার পাশে দাঁড়িয়েছে এ্যাবি গলোউইজ। ক্লান্ত। ঝরা ফুলের মত শুকনো মুখ। চোখ দুটিতে আর আশার চিহ্ন নেই, ভবিষ্যৎও অনুজ্জ্বল।

—এই যে। মরার বলল—এঁরা একটু ভুল করে ফেলেছিলেন।

—থামুন, থামুন মিঃ মরার। টেলিভিশনের লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এদিকে আসুন। মাইকে কিছু বলুন।

—নিশ্চয়ই, মরার বলল, কথা দিয়েছিলাম কিছু বলব।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মরার। যেদিকে চোখ দেওয়া যায়, কেবল নজরে পড়ে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা।

সামনের একটা মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়াল মরার। বলল—আমার

বন্ধু আর হিতৈষীদের ধন্যবাদ জানাবার এই হল উপযুক্ত সময়। এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁরা দুঃখ পেয়েছেন, এমন অপ্রিয়, অবাঞ্ছনীয় ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে দেখে তাঁরা মনে মনে আঘাত পেয়েছেন। মানুষ মাত্রই ভুল হয়, আর সন্দেহ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এরকম একটা ছোট্ট ভুল এঁরাও করেছিলেন। মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করেছেন এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

…মিস জুন আরনটকে হত্যার অভিযোগে এঁরা আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছিল, আপনারা হয়ত শুনেছেন। জুন আরনট আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

এই মুহূর্তে মুখের হাসি বজায় রাখা মরারের পক্ষে খুব কঠিন হল। কয়েকজন রিপোর্টারের চোখে মুখে স্পষ্ট বিদ্রূপ, মরারের দৃষ্টিকে তারা ফাঁকি দিতে পারল না। অনেকের মুখে ঘৃণা। মরার এই মুখগুলো ভুলবে না। খুব তাড়াতাড়ি এরা ধোলাই খাবে, হাসপাতালে গিয়ে বিছানা নিতে হবে।

—ডিস্‌ট্রিক্ট এ্যাটর্নীকে আমি প্রশংসা করি, উনি একজন সৎ ব্যক্তি। চারিদিকে শাসন বিভাগে ছড়িয়ে আছে রাশিকৃত নোংরামি, চুরি জোচ্চুরি। উনি হলেন সব কিছুর ওপরে। উনি বিশ্বাস করেছিলেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি। আমি সহজ ভাবে বলতে পারি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা করে তিনি তাঁর কর্তব্যই পালন করেছেন।

মরার গলার স্বরটা একটু আস্তে করল। হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখ। সে চারিদিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে সে টেলিভিশন ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই ক্যামেরাই তো তাকে হাজির করবে হাজার হাজার বোকা, অপদার্থ লোকের চোখের সামনে। যাদের অনেকেই যায় তার ক্লাবে জুয়া খেলতে আর মদ খেতে, সঙ্গে থাকে পেশাদার স্ত্রীলোক। তারা জল মেশানো মদ গিলবে আর তার মনোনীত লোককে নির্বাচনে ভোট দিয়ে জেতাবে। তার জন্য যারা এতখানি করে, তাদের জন্য একটু হাসি বিক্রি করতে হবে বৈকি!

…ডি. এ পুলিশের কাছ থেকে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন, তাতে ওয়ারেন্ট বার করতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু যখন ওগুলি বিশেষভাবে যাচাই করলেন তখন বুঝলেন ওগুলো কোন প্রমাণ নয়। মরার তার মোটা হাতটা এমনভাবে নাড়ল, যেন সব প্রমাণ মিথ্যে বাতিল হয়ে গেল। আপনারা কখনই ভাববেন না ডিস্‌ট্রিক্ট এ্যাটর্নী একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি প্রমাণ

তাঁর কাছে হাজির করা হয়েছিল ঠিকই। আমি মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলাম, এখানে ছিলাম না। যদি এখানে থাকতাম, তাহলে ডি. এ -কে বুঝিয়ে বলতাম, তাহলে ওয়ারেন্ট কখনই বেরোত না। ঠিক এইমাত্র যেমন বলে এলাম। টেলিভিশন ক্যামেরায় হাসল মরার।

আমি প্রথমেই বলেছি জুন আরনট আমার বিশেষ বান্ধবী ছিল। সত্যিই, তার কোন ক্ষতি করার কথা আমি মনেও আনতে পারি না। ওয়ারেন্টের খবর শোনা মাত্রই আমি চলে এলাম। জুনের মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। ডি এ.-র সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে সব বুঝিয়ে বললাম। আপনারা দয়া করে শুনুন, ডি. এ. তাঁর অভিযোগ তুলে নিয়েছেন। আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য, এমন কি তিনি আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন।

—এটা কি সত্যি নয়, হেরাল্ড রিপোর্টার চেঁচিয়ে উঠল, ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নী দাঁড় করাতে পারেন নি তার কারণ দুজন সাক্ষীই ঠিক সময়ে সুবিধাজনক ভাবে আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

মরার তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, বিষণ্ণ তার মুখ। হতভাগা বড্ড বাড় বেড়েছে, এর মধ্যেই ওর মৃতদেহ সমুদ্রের নীচ থেকে ভেসে উঠবে।

·· ওসব তথ্য মিঃ ফরেস্ট তো আমাকে জানান নি আর জানাবার কথাও নয়। বাস্তবিকই আমি ওদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। খবরের কাগজ পড়ে যতটুকু জে নছি। ওঁরা আমাকে বলেছেন, আমার একটা সোনার পেন্সিল জুন আরনটের সাঁতারের পুকুরের পাশ থেকে উদ্ধার করা হসেছে। পেন্সিলে রক্তের দাগ এবং পরীক্ষা করে দেখেছেন, মিস আরনটের আর আমার রক্ত একই গ্রুপের। এই সব ভিত্তিহীন প্রমাণের উপর নির্ভর করে পুলিশ আমার বিরুদ্ধে মামলা তৈরী করেছিল।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আগের দিন আমি জুন আরনটের কাছে গিয়েছিলাম। ছুরি দিয়ে নখ কাটয়ত গিয়ে আঙুল কেটে যায়। পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে পেন্সিলটা আঙুলে লেগে ড্রেনে পড়ে যায়। ঐ সময় পেন্সিলে রক্ত লাগে। মরার একবার বিদ্রুপ ভরা হাসি হাসল। যদি আমার রক্ত আর মিস আরমটের রক্ত একই গ্রুপের হয়ে থাকে, তাহলে বলুন আমি কিছু করতে পারি ?

মরারের ইঙ্গিতে বডিগার্ড চারজন এগিয়ে এল। দুহাত দিয়ে ভীড় সরিয়ে

রাস্তা করে দিল। মরার চটপট গাড়ীতে উঠে বসল। গলোউইজ আগেই উঠে বসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করল।

কিছুটা রাস্তা আসার পর মরার গদিতে গা ডুবিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

—এ্যাবি, তুমি যখন ফরেস্ট ছোকরাটাকে এক হাত নিচ্ছিলে তখন ওর মুখটা ভীষণ ভাল লাগছিল, ভেবে ভারি মজা লাগছে। মরার থাপ্পড় মারল গলোউইজের মোটা থপথপে উরুতে। এবারে কাজের কথায় আসা যাক। তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। আমার যেখানে যত টাকা আর সিকিউরিটি দলিল আছে, সেগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা তালিকা করে ফেল। আমার নামে যত স্টক আর বণ্ড আছে, সব কিছুর বর্তমান দাম ফেলে হিসেব কর!

গলোউইজের চোখ দুটি বিস্ফারিত হল, অবাক চোখে তাকাল মরারের দিকে।

—কি ব্যাপার জ্যাক?

—ব্যাপার কিছুই না। খুব সম্ভব আমি এখানে আর থাকব না। জীবনে আশা করি টাকার অভাব কোনদিন হবে না। সিনডিকেটের ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। শুধু প্যাসিফিক সিটি কেন, তারা যদি সমস্ত ক্যালিফোর্নিয়া অধিকার করতে চায়, স্বচ্ছন্দে করতে পারে, আমি বাধা দেব না।

—মনে করেছিলাম, তুমি ফেরারির একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।

মরার হাসল। তার চোখের তারা দুটি নিথর ও নিশ্চল।

—ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু সাইগেল সব মাটি করে দিল। মনে তো করেছিলাম ওকে দিয়েই কাজ হবে। এখন দেখছি লোকটা কেবল মেয়েমানুষকে বশে আনতে ওস্তাদ, আর কোন মুরোদ নেই। লোকটা যে কাজে হাত দেয়, সব পণ্ড হয়ে যায়।

গলোউইজের চোখে সন্দেহ স্পষ্ট।

—ওর কি হল?

—জানো তো, ফেরারি ওর চেয়ে অনেক দ্রুত আর ক্ষিপ্র। অতএব যা হবার তাই ঘটেছে। বলতে পার, জুয়া খেলায় হেরে গেলাম। বিগ জো-র সঙ্গে কথা বলেছি। আমি বলেছি, এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার. আমার সঙ্গে

কোন যোগাযোগ নেই। ফেরারিকে সাবাড় করার চেষ্টা করেছে শুনে তিনি ভারী অবাক হয়েছেন, কৌতুক বোধ করেছেনও যথেষ্ট।

খোলা গেট দিয়ে বড় ক্যাডিলাক এবার এসে প্রবেশ করল মরার রাজ্যে।

বেশ কিছু লোককে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখে গলোউইজ কৌতূহল বোধ করল।

—ওরা কারা? সে জানতে চাইল।

—জান তো, সাবধানের মার নেই। মরার হাসল। ঝক্কি ঝামেলা আমি একদম পছন্দ করি না। ফেরারিকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। যদি বেশী চালাকি ফলাতে যায়, তাহলে ফলটা খুবই খারাপ হবে।

গলোউইজ উত্তর দিল না। কেবল একটা ভয় অনেকক্ষণ ধরে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। ধীরে ধীরে শরীরটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মরার কি সত্যিই বিশ্বাস করে, ফেরারি মারতে এলে এই লোকগুলো তাকে উদ্ধার করতে পারবে? মরার কি এতই বোকা আর উদ্ধত?

দরজার কাছে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

—তাহলে এ্যাবি, যা বললাম তালিকাটি চটপট তৈরী করে ফেল। আর লাঞ্চের সময় এসো। হয়তো আজ রাত্রেই আমার ইয়াট সমুদ্রে ভেসে পড়বে।

মরার গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে বাধা পেল।

—কিন্তু জ্যাক, গলোউইজের মিনতি ভরা কণ্ঠস্বর, তুমি চলে গেলে আমার অবস্থা কি হবে?

মরার ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেন ওর কথাগুলি কানে যায় নি।

—তুমি? কপাল কুঁচকাল মরার। তোমার আবার ভাবনা কি, ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। হয়তো বিগ জো-ই তোমার একটা হিল্লে করে দেবেন। এখানকার দায়িত্ব তুমি পেয়ে যেতে পার। আরে বাবা, তুমি হলে চালাক লোক। বিপদে পড়বে নাকি? একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। তারপর খ্যাক খ্যাক করে নেকড়ের মত হেসে উঠল সে। লাঞ্চে এলে আমিও হয়তো দু-একটা মতলব দিতে পারি।

গাড়ি থেকে নেমে মরার ভেতরে পা বাড়াল।

গলোউইজ তার মোটা দেহটি নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে রইল, অসহায় নেত্রে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে।

আহারে বেচারা !

*　　　　*　　　　*

হলঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে তিনজন দুর্দান্ত লোক। মরারকে দেখে প্রত্যেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—সব ঠিক তো ? মরার বসল, সর্বদা চোখ দুটো সজাগ রাখবে।

—নিশ্চয়, বস। কোন গণ্ডগোল হবে না। একজন উত্তর দিল।

হল পেরিয়ে মরার এলো প্রশস্ত লাউঞ্জে।

সেখানে খোলা জানালার পাশে বসেছিল মরার গিন্নী ডলোরাস। পরণে একটা সাধারণ কালো পোশাক। এতেই ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে তাকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, মুখটা বিষণ্ণ।

—হ্যালো, জ্যাক।

—এই যে, ডলী। আমায় একটা ড্রিংক তৈরী করে দেবে ?

তার পাশে এসে দাঁড়াল মরার। বাগানের দিকে তাকাল। টেরাসের দুদিকে বগলে রাইফেল নিয়ে গার্ড পাহারা দিচ্ছে।

--ফেরারিকে মারতে গিয়েছিল সাইগেল। একটা চেয়ারে বসল মরার। সাইগেল কিছু করার আগেই ফেরারি তার বুকে আমূল ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। তাই ফেরারি যতক্ষণ না এখান থেকে চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমার এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

ডলোরাস উঠে গিয়ে ড্রিংক তৈরি করে নিয়ে এল। মরারের পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর গ্লাসটা রেখে সে চেয়ারে বসল।

—তুমি একটা নিয়ে বসো। শোন ডলি, তোমার সঙ্গে ড্রিংক করা আজই শেষ। আমি শহর ছেড়ে আজই চলে যাচ্ছি।

ডলোরাসের চোখে রাজ্যের বিস্ময় !

—সত্যি ?

—সত্যি। ফ্লোরিডা যাচ্ছি। তাই সিনডিকেটের উদ্দেশ্যে দিয়ে গেলাম আমার শেষ চুম্বন। ওখানে আমার মত লোকের কোন অসুবিধা হবে না। আমার যথেষ্ট বুদ্ধি, টাকা ও সামর্থ আছে। তাই দিয়ে খুব বেশী হলেও দু সপ্তাহের মধ্যে একটা ব্যবসা খুলতে পারব। আপাততঃ ভাবছি, তোমাকে নিয়ে কি করা যায় ?

—আমার জন্য তোমাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না।

কয়েক হাত দূরে ড্রিংক তৈরী করতে চলে গেল ডলোরাস।

—মাথা আমি ঘামাচ্ছি না ডলি। মরার হাসল। আমার ধারণা, এ্যাবি তোমার স্বামী হওয়ার অনুপযুক্ত। ওর সব গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। খুব সম্ভব, তাজই ওর একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। তুমি এর জন্যে দুঃখিত ?

—না।

—আমার ধারণা ছিল, তুমি শেষ পর্যন্ত ওর কাছেই যাবে।

—তোমার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কি, ভেবে পাচ্ছি না।

জানালার বাইরে চোখ রাখল ডলোরাস। টেরাসের সিঁড়ি পেরিয়ে ফেরারি আসছে। পরণে কালো পোশাক, মাথায় কালো টুপী। খুবই স্বাভাবিক তার হাঁটা, কিছুমাত্র তাড়া নেই। পকেটে হাত দুটো ঢুকানো। জানালার কাছে যেখানে মরার হেলান দিয়ে বসেছে, সেই দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দুজন গার্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছে।

পাশ কাটিয়ে চলে এল একজন গার্ডকে। তারপর আর একজন। তাদের পা দুটো যেন শিকল দিয়ে কষা। নিঃশব্দ, স্বচ্ছন্দ পায়ে ছায়া মূর্তির মত সে এগিয়ে আসছে।

—বলছ আমার ভুল হয়েছে ? মরার বলল, তাহলে কি সাইগেল ?

… না। শেষ পর্যন্ত আমায় তুমি সঙ্গে নেবে না স্থির করলে ?

মরার তার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তার দিকে তাকাল।

—না ডলি, তুমি কোথাও যাচ্ছ না। কোথাও নয়।

এবারে ডলোরাস তার দিকে তাকাল, যেন খুবই চিন্তায় পড়েছে। মরার লক্ষ্য করল, ঐ মুখে নেই ভয়, চোখদুটি শঙ্কাহীন।

—বেশ। কিছুই করার নেই।

লাউঞ্জ থেকে ধীরে ধীরে পা ফেলে ডলোরাস বেরিয়ে এল। হলঘরে কোন গার্ড নেই।

হল পেরিয়ে ডলোরাস সিঁড়িতে পা রাখল, ওপরে যাবে। এমন সময় তার ভাবনা যেন বিগ জো কখন রাতারাতি এই প্রতিষ্ঠানের ভার নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এরপর ?

অবশেষে কি ফেরারিকেই তাকে বরণ করে নিতে হবে ?

শোবার ঘরে এসে ঢুকল সে। যে বিছানায় মরারের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে চারটি বছর, সেই বিছানায় সে বসল। চার বছর মরারের সঙ্গে সে কাটিয়েছে,

তার উপহার অপমান পেল সে। এই মুহূর্তে এসব কথা ভেবে ডলোরাস দুর্বল বোধ করল।

নিশব্দে চোখ বুজল সে। বিশেষ একটি শব্দের প্রতীক্ষায় সে নীরব হয়ে রইল। যে শব্দ তার কানে কানে বলে যাবে, আজ থেকে সে মৃত মরারের বিধবা স্ত্রী আর ফেরারির উপভোগ্যা।

নীচে থেকে আসা হঠাৎ গুলির শব্দে সে আঁৎকে উঠল। যেন তার বুকে এসে বিঁধল গুলি।

তারপর আরও দুটি গুলির শব্দ।

ডলোরাস আর স্থির থাকতে পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। অনেক বছর পর তার গাল বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ল।

সে কি মরারের জন্য কাঁদছে ?

না। মরারের জন্য তার কোন আক্ষেপ নেই। কাঁদছে সে নিজের জন্য।

সমাপ্ত